UNWTO
World Tourism Organization

Bangladesh
Tourism Board
National Tourism Organization

বিশ্ব পর্যটন দিবস

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

Tourism & Green Investments

পর্যটনে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ

Mujib's
Bangladesh

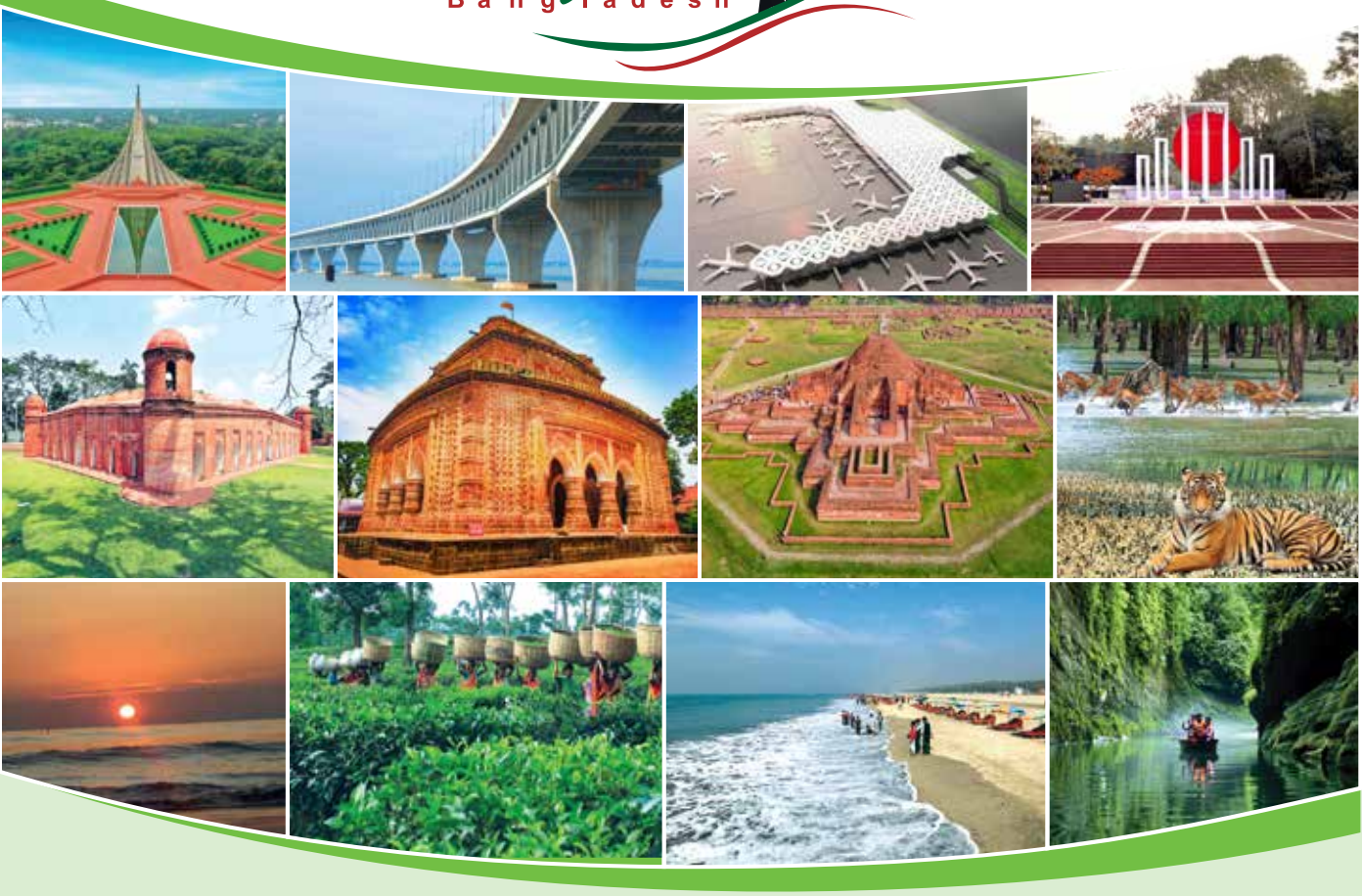

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

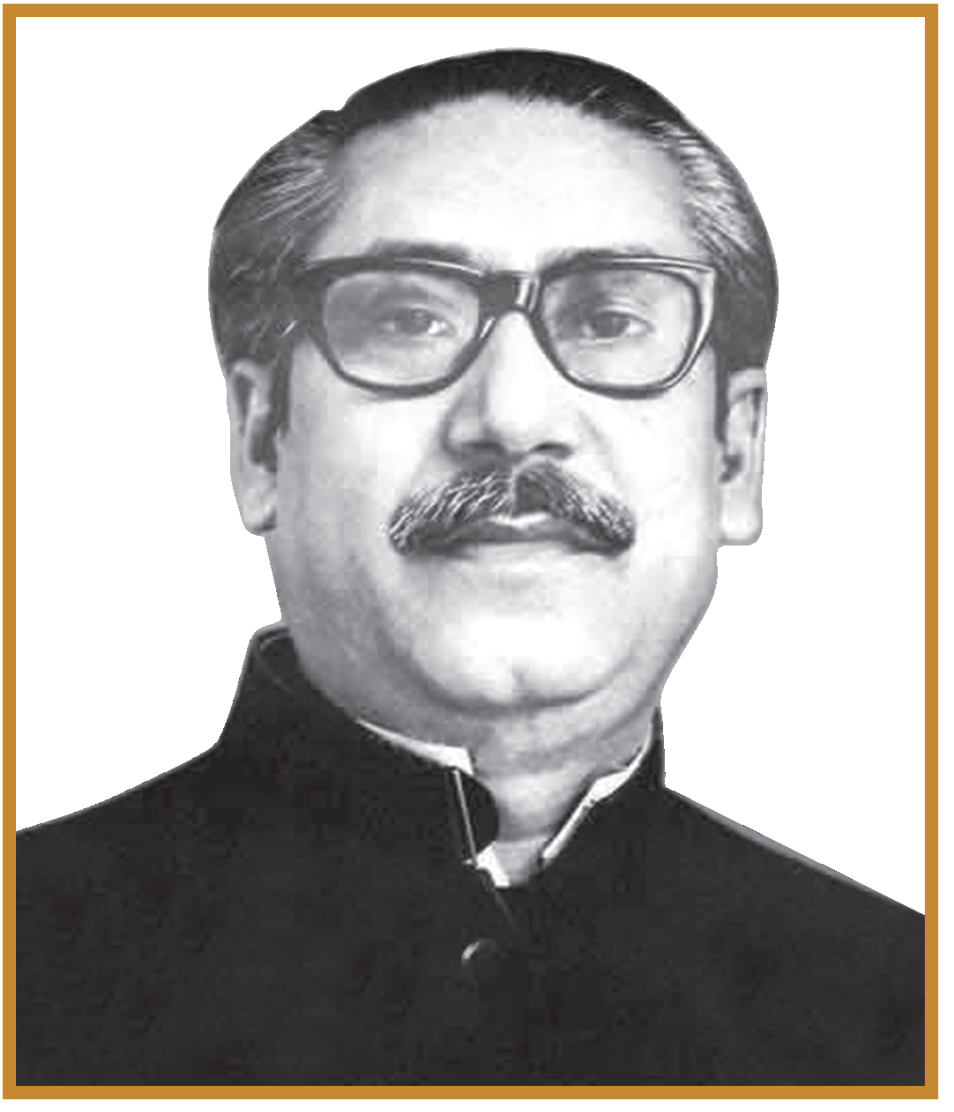

As long as Padma, Jamuna,
Gouri, Meghna flows on
Sheikh Mujibur Rahman
Your accomplishment will also live on.
- Annadashankar Roy

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।
-অন্নদাশঙ্কর রায়

UNWTO
World Tourism Organization

Bangladesh
Tourism Board
National Tourism Organization

বিশ্ব পর্যটন দিবস

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

Tourism & Green Investments

পর্যটনে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ

Mujib's
Bangladesh

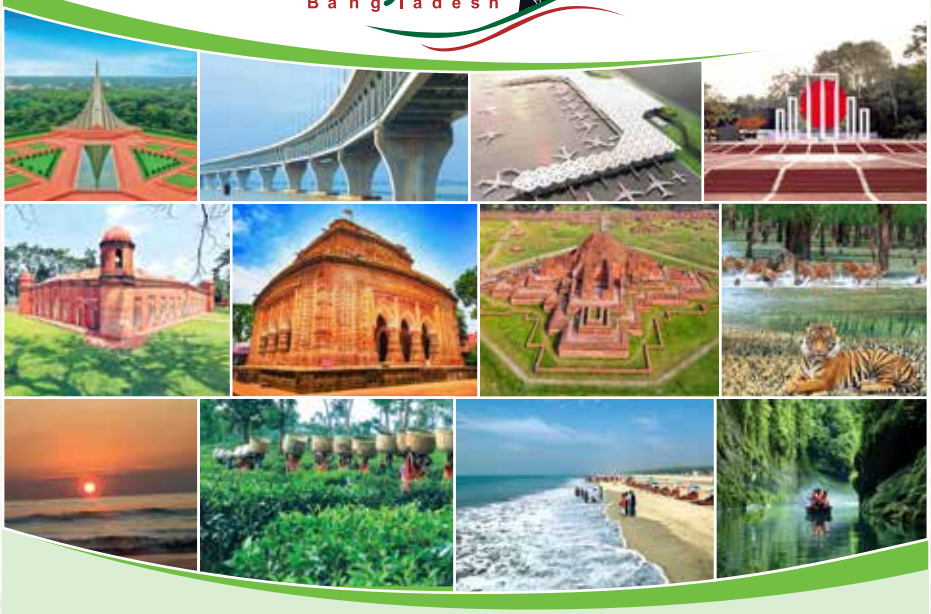

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৩

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা

আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

মনোজ কুমার রায়
অতিরিক্ত সচিব (পর্যটন), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

আহ্বায়ক

শাহ্ আবদুল আলীম খান
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

সদস্য

সনজীদা শরমিন
উপসচিব (পর্যটন-২), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

মোহাম্মাদ সাইফুল হাসান
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও সমন্বয়), (উপ সচিব), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

ইসরাত জাহান কেয়া
উপ-পরিচালক (বিপণন), (উপ সচিব), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

মহিবুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (বিপণন ও ব্রান্ডিং), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

মো: মাজহারুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

তাহারিন তৌহিদা
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

মোঃ নিজাম উদ্দিন
সহকারী পরিচালক (বোর্ড ও আইন), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

কাবিল মিঞা
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

সদস্য সচিব

বোরহান উদ্দিন
সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ১২ আশ্বিন ১৪৩০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

১২ আশ্বিন ১৪৩০
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'বিশ্ব পর্যটন দিবস- ২০২৩' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

পর্যটন খাত বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরিষেবা খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ খাতের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। কিন্তু করোনা মহামারি, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এবং ক্রমবর্ধমান গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন পর্যটন খাতকে ব্যাপকভাবে ঝুঁকিতে ফেলেছে। বৈশ্বিক ঝুঁকি ও সংকট থেকে এ খাতকে পুনরুদ্ধারে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ টেকসই ভবিষ্যত বিনির্মাণে অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রেক্ষিতে পর্যটন শিল্পে নিয়োজিত জনশক্তির জন্য প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, ধরিত্রীর জন্য টেকসই অবকাঠামো, সবুজ রূপান্তর এবং সমৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন উদ্ভাবন, উদ্যোগ ও প্রযুক্তিতে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগে উৎসাহিত করা অতীব জরুরি। এ প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্য 'Tourism and Green Investments' অর্থাৎ 'পর্যটনে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ' যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প খুবই সম্ভাবনাময় একটি খাত। এদেশের প্রতিটি অঞ্চলের রয়েছে আলাদা সৌন্দর্য ও অসংখ্য স্বতন্ত্র পর্যটন সমৃদ্ধ এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান। এসব অঞ্চলে পর্যটন শিল্প বিকাশ লাভ করলে বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে যা মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিতে পর্যটন সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানকে পরিকল্পিত উপায়ে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। আমি পরিবেশের ভারসাম্য ও দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে পর্যটন শিল্পে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি 'বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PRESIDENT
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
BANGABHABAN, DHAKA

12 Ashwin 1430
27 September 2023

Message

I welcome the initiative of Ministry of Civil Aviation and Tourism to observe the 'World Tourism Day-2023' in Bangladesh as elsewhere in the world.

The tourism industry is one of the largest service sectors in the world due to its multidimensionality and scope. This industry plays an important role in creating massive employment opportunities fostering economic development in many countries. Tourism sector is highly vulnerable to climate change and at the same time responsible for significant emissions of greenhouse gases. Overcoming the negative impact of Covid-19 pandemic, global tourism is getting momentum and bouncing back slowly but steadily to the pre-pandemic level. Investments in eco-friendly new innovations, initiatives, and technologies for sustainable infrastructure, education, skill and human resource development for the tourism industry can help us to build a better world. I think, this year's theme 'Tourism and Green Investment' is time worthy and appropriate in the current context.

Bangladesh with bounty of unique natural beauty holds great potential for the tourism industry. If we can properly utilize the prospect of our tourism industry, employment opportunities will be created and people's living standards will be improved. Thus it will contribute to the country's economy.

I urge upon all the stakeholders to come forward with a coordinated approach to develop a sustainable tourism industry.

I wish 'World Tourism Day-2023' a grand success.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.

Mohammad Shahabuddin

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ আশ্বিন ১৪৩০
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৩' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত এবারের প্রতিপাদ্য 'Tourism and Green Investments' যার ভাবার্থ 'পর্যটনে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ' বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্যটি যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ ভৌগলিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের সড়ক, রেল, বিমান ও নৌ যোগাযোগ রয়েছে। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পাহাড়-পর্বত, গহীণ অরণ্য, জীব-বৈচিত্র, সমুদ্র-সৈকত, নদ-নদী, বৈচিত্রময় আদিবাসী সংস্কৃতি, সমৃদ্ধ ও গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ, অতিথিপরায়ন মানুষ অর্থাৎ বিশ্বের যে কোন প্রান্তের যে কোন পর্যটককে আকৃষ্ট করার মত সকল উপকরণই বাংলাদেশে বিদ্যমান। পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে স্থানীয় জনসাধারণকে পর্যটন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে টেকসই পর্যটন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব ।

পর্যটনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পর্যটনকে গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার পর্যটন শিল্পের যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবন করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই শিল্পের প্রসারে কাজ করছে। এ লক্ষ্য অর্জনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমাদের সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১০ সালে জাতীয় পর্যটন উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছে-যাতে টেকসই পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে ইকো-ট্যুরিজম, কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম, দায়িত্বশীল পর্যটনকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পর্যটন শিল্পের কার্যকর উন্নয়ন দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি ।

পর্যটন শিল্পের জন্য শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ করে এই পৃথিবীর টেকসই অবকাঠামো এবং সবুজ রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করতে হবে। তাহলেই উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও উদ্যোক্তার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পে সত্যিকারের সমৃদ্ধি আসবে। টেকসই পর্যটন উন্নয়ন ধারণা অনুসরণে জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ, স্থানীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির পরিবর্তন না ঘটিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের উদ্যোক্তা এবং জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে বাংলাদেশের পর্যটনের বিকাশে সকলকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আমি 'বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৩' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

PRIME MINISTER
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

12 Ashwin 1430
27 September 2023

Message

I am happy to know that **'World Tourism Day 2023'** is being celebrated in the country in line with the announcement of World Tourism Organization (UNWTO). The theme of the day this year is **'Tourism and Green Investments'** which is appropriate in the present context.

Bangladesh has enormous potential to develop tourism because of its variety of tourism products. The country is well connected with other parts of the world by air, road, and sea. With the enormous resources like ecologically panoramic landscape with valleys, deep forests, sandy sea beaches, hills and mountains, lakes and rivers, flora and fauna, ancient and archaeological sites, the ethnic lifestyle of indigenous people, various religious and cultural festivals, and above all, the hospitable people, Bangladesh can attract any tourists from around the world. The tourism industry of the country can be effectively presented in the world arena by upholding the local culture, tradition, environment, and values.

Realizing the economic importance of tourism, Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, included tourism in the country's first five-year plan and established the 'Bangladesh Tourism Corporation' in 1972.

The Bangladesh Awami League government has been providing all kinds of support for the development of the tourism sector. The government has introduced various tourism-related components in the 8th Five-Year Plan. We have also declared in the National Tourism Policy 2010 that ecotourism, responsible tourism, and community-based tourism are given due importance. The Bangladesh Tourism Master Plan has been developed for the advancement of the country's tourism industry.

We are devising a coordinated development plan for flourishing tourism. Tourism will be an important component of building Smart Bangladesh.

I would like to call upon all stakeholders, including government and non- government organizations and entrepreneurs, to come forward for developing eco- friendly, sustainable tourism as a tool for the economic growth of our country. I would also like to urge potential investors from home and abroad to invest in the tourism sector.

I wish **'World Tourism Day 2023'** a grand success.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu
May Bangladesh Live Forever.

Sheikh Hasina

প্রতিমন্ত্রী
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা এর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস পালন করা হয়। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও দিবসটি যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য ও আড়ম্বরপূর্ণভাবে সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য **"Tourism and Green Investments"** যার ভাবার্থ **"পর্যটনে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ"** বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের "সোনার বাংলা" গড়ে তুলতে ও বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট রাষ্ট্রে পরিণত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আবহমান গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য এবং প্রতিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দায়িত্বশীল পর্যটন কার্যক্রম পরিচালনা করতে এবং এর অর্থনৈতিক সুফল যাতে স্থানীয় সকল জনগোষ্ঠী ভোগ করতে পারে সে লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পর্যটন পণ্যের উন্নয়ন, সৃজনশীল ও গতিশীল বিপণন এবং পর্যটন সেবার প্রচারের মাধ্যমে দেশের অফুরন্ত পর্যটন সম্ভাবনাকে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। পর্যটনের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য সরকার গুরুত্বের সাথে বেসরকারি খাত উন্নয়নবান্ধব কার্যক্রম ও নীতিমালা প্রণয়নে কাজ করছে।

বর্তমান সরকার বিনিয়োগবান্ধব টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "স্মার্ট বাংলাদেশ" ও "নিরাপদ ব- দ্বীপ" পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা এবছরের বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া, বর্তমান সরকার পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে- যা বাংলাদেশের সামগ্রিক পর্যটন বিকাশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ ইকো ট্যুরিজম উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন ও পর্যটন পণ্যের বহুমাত্রিকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অমিত পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত ও স্মার্ট দেশে পরিণত করতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে পর্যটন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে মর্মে আমার বিশ্বাস। আমি আরও আশা করি, সরকারের এসব পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে সরকারী-বেসরকারী সকল পর্যটন অংশীজন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন।

আমি **"বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২৩"** এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ মাহবুব আলী, এমপি)

State Minister
Ministry of Civil Aviation and Tourism
Government of the People's Republic of Bangladesh

Message

World Tourism Day is celebrated worldwide on 27th September every year. Like every year, this year also the day is being celebrated with great importance in Bangladesh through various programs. **"Tourism and Green Investments"**, the theme, set by the United Nations World Tourism Organization is well-timed.

Under the Dynamic leadership of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, present Awami League Government is working relentlessly for the development of the country inspired by the spirit of the great liberation war to build the 'Sonar Bangla', the dream of our Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and to turn Bangladesh into a developed, prosperous and smart nation by 2041. For promoting the huge potential of Bangladesh Tourism to all sections of tourists in home and abroad the government is working in a much planned way. Decisive steps have been taken by the government to manage responsible tourism activities through proper management while maintaining the culture, heritage and ecological balance of the traditional places so that the local people can enjoy its benefits. The endless tourism potential of the country is being highlighted to domestic and foreign tourists through the development of products, creative and dynamic marketing and promotion of tourism services. The government is also working with utmost importance to formulate private sector development friendly activities and policies to successfully manage the country's economic growth activities by harnessing the immense potential of tourism.

The government has adopted the "Smart Bangladesh" and "Safe Delta" plans to ensure investment-friendly sustainable development which is in line with the theme of this year's World Tourism Day. Apart from that, the current government has formulated a tourism master plan which will play an important role in the development of eco-tourism along with increasing investment in the overall tourism development of Bangladesh. I believe that tourism industry will play an important role in economic prosperity to make Bangladesh a developed and smart country by 2041 under the leadership of the Honorable Prime Minister by utilizing the immense tourism potential of Bangladesh through creativity, innovation and diversification of tourism products. I further hope that all public and private stakeholders of tourism will work diligently and sincerely for the proper implementation of these plans of the government and for the continuation of the trend of national development and progress through effective development of tourism.

I wish every success to **"World Tourism Day-2023"**.

Joy Bangla, Joy Bangabandhu
May Bangladesh Live Forever.

(Md. Mahbub Ali, MP)

সভাপতি
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পর্যটন খাতে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অভিযাত্রায় স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও **'বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৩'** পালিত হচ্ছে। এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'Tourism and Green Investments' অর্থাৎ পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগের মাধ্যমে পর্যটন উন্নয়ন, যা পরিবেশ সংরক্ষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধ ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

পর্যটন শিল্পের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত Sustainable Development Goals (SDGs) অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে চলেছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকার এজন্য পর্যটন খাতে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ আকর্ষণ ও বিকাশকে প্রাধান্য দিচ্ছে। পর্যটনখাতে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ বিকাশের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারায় সমাজের সকলেই তার নিজ নিজ জায়গা থেকে উন্নয়নের সুফল ভোগ করবে।

গ্রীন ইনভেস্টমেন্ট হলো বিনিয়োগ কার্যক্রম, যা পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রগুলোকে, যেমন পরিবেশ দূষণ হ্রাস, জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার হ্রাস, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, বিকল্প শক্তির উৎস তৈরি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা অন্য কোনো ধরনের পরিবেশ-সচেতন অনুশীলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এ বছরের বিশ্ব পর্যটন দিবসের যে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় প্রয়োজন। পর্যটন শিল্প তার প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল এবং সেই পরিবেশকে টিকিয়ে রাখা এবং উন্নত করার জন্য এর একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পরিবেশবান্ধব পর্যটন ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ আকর্ষণ ও বিকাশকে প্রাধান্য দিতে হবে। পর্যটন উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারের যৌথ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ হতে পারে বিশ্ব পর্যটকদের কাছে একটি আদর্শ পর্যটন গন্তব্য। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধির মহাসড়কে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে।

বিশ্ব পর্যটন দিবস, ২০২৩ সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

(র,আ,ম, উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, এমপি)

Chairman
Parliamentary Standing Committee
on Ministry of Civil Aviation and Tourism

Message

'World Tourism Day, 2023' is being observed in Bangladesh like other countries of the world with the aim of building a smart Bangladesh by accelerating the socio-economic development journey of the country through attracting environment-friendly investments in tourism sector. This year the theme of the day is **'Tourism and Green Investments'** which will play an effective role in environmental protection, prevention of global warming and achievement of sustainable development goals.

The government of Bangladesh is working on specific plans to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) announced by the United Nations by 2030. Out of the Least Developed Countries (LDC), Bangladesh is moving towards a middle income country. In this continuation of development, the government is working sincerely to make Bangladesh a developed country as well as a Smart Bangladesh. For this, the government is prioritizing the development of environment-friendly investment in tourism and other sectors. If growth is achieved through the development of environment-friendly investment in tourism sector, everyone in the society will get fair opportunity for development from their respective places.

Green investment is an investment activity that focuses on projects or areas committed to environmental conservation, such as reducing environmental pollution, reducing fossil fuels, conserving natural resources, developing alternative energy sources, cleaning and maintaining air and water, waste management, or any other environment related project. For proper implementation of the theme of this year's World Tourism Day, government and private initiatives need to be coordinated. As the tourism industry is dependent on its natural environment, a long- term plan must be adopted to sustain and improve that environment. Eco-friendly tourism management, investment attraction and development should be prioritized. Bangladesh can become an ideal tourist destination for the world tourists with the joint efforts of all the partners concerned with tourism development. Through the development of tourism industry, Bangladesh will move forward on the highway of prosperity and build a Smart Bangladesh.

I wish all the success of the World Tourism Day, 2023.

Joy Bangla, Joy Bangabandhu.

(R.A.M Obaidul Muktadir Chowdhury, MP)

সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে **"বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৩"** পালিত হচ্ছে। এ বছর বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে '**Tourism and Green Investments**' যার বাংলা ভাবার্থ '**পর্যটনে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ**'। ভবিষ্যত প্রজন্মের চাহিদার কথা বিবেচনা করে পরিবেশ ও প্রতিবেশ অক্ষুন্ন রেখে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বিনিয়োগ কার্যক্রম উৎসাহিতকরণের জন্য এই প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একই সাথে প্রতিপাদ্যটি সারা বিশ্বে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করে।

বৈচিত্র্যময় পর্যটন আকর্ষণ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। বছরব্যাপী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য মনোমুগ্ধকর পর্যাপ্ত পর্যটন সম্পদ বাংলাদেশে বিদ্যমান রয়েছে। সাগর, পাহাড়, জলাভূমি, বন-বনানী, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বছরব্যাপী বৈচিত্র্যময় উৎসব ও মেলা, মঙ্গল শোভাযাত্রা, শহুরে জীবন, ইকো-ট্যুরিজম, চা বাগান, বৈচিত্র্যময় জীবনধারাসহ বহুবিধ পর্যটন আকর্ষণ এখানে বিদ্যমান। প্রতিবছর এখানে দেশীয় পর্যটকের সাথে সাথে বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান হারে পর্যটক বৃদ্ধি পর্যটন শিল্প ও দেশীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। ক্রমবর্ধমান পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে আধুনিক ও বিশ্বমানের সেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর হাতে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের গোড়াপত্তন হয়। জাতির পিতা ১৯৭২ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন স্থাপন করেন। সেই চেতনায় পর্যটন শিল্প আজ উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বহুমাত্রায়, নতুন দিগন্তে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি এঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং তারই দিক নির্দেশনায় পর্যটন শিল্পে বহুমাত্রিক বিকাশের ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালে অনুমোদিত হয় "বাংলাদেশ পর্যটন মহাপরিকল্পনা-২০২৩"। পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করতে বিমান, সড়ক ও রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে যুগান্তকারী প্রকল্পসমূহ। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের কাজ সমাপ্তির পথে, কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণের কার্যক্রমও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন জেলার নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের লক্ষ্যে আধুনিক এক্সপ্রেসওয়ে, রেলযোগাযোগ, বিমানবহরে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বিমান, নতুন নতুন এয়ারলাইন্সের বাংলাদেশে ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা, ইত্যাদি কার্যক্রম বাংলাদেশের পর্যটনের অবারিত সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে।

টেকসই ও দায়িত্বশীল পর্যটন সারা বিশ্বব্যাপী পর্যটনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। পর্যটনে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ নিশ্চিতকল্পে বর্তমান সরকার নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসকল উদ্যোগ টেকসই পর্যটন নিশ্চিতের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনে ভূমিকা রাখবে। একইসাথে পর্যটন ভিশন ২০৪১ অর্জনের মাধ্যমে **স্মার্ট বাংলাদেশ** বিনির্মাণে অন্যতম চালিকা শক্তি হবে ।

বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৩ এর সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ মোকাম্মেল হোসেন)

Secretary
Ministry of Civil Aviation and Tourism
Government of the People's Republic of Bangladesh

Message

Bangladesh is celebrating **"World Tourism Day 2023"** with the participation of the tourism stakeholders in a very festive environment. The theme of the World Tourism Day 2023 is **'Tourism and Green Investment'**. This theme is very significant for encouraging investment in the development of tourism industry by keeping the environment, surroundings and needs of future generations intact. At the same time, the theme emphasizes the achievement of the global agenda of Sustainable Development Goals.

Bangladesh has become one of the most important tourist destinations in South Asia. Bangladesh is blessed with abundant and multidimensional tourism resources to attract domestic and international tourists. Various tourist attractions including sea, mountains, wetlands, forests, archaeological heritage, year-round diverse festivals and fairs, Mongal Shuvajatra, urban life, eco-tourism, tea garden, diverse lifestyles are available here. Every year the number of domestic and foreign tourists is increasing here. The increasing number of tourists in Bangladesh will play a positive role in the development of tourism industry and national economy as well. It is now needed to ensure modern and world-class services at various tourist attractions for the growing number of tourists.

The Greatest Bengali of all times, the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman introduced the tourism industry in Bangladesh by establishing the Bangladesh Parjatan Corporation in 1972. With spirit of our Father of the Nation, the tourism industry is moving firmly towards a new horizon through an open vision and diversified dimensions. Bangladesh Tourism Board was established under the dynamic leadership of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, MP and under her direction the "Bangladesh Tourism Master Plan-2023" was approved in 2023 as a continuation of multi-dimensional development in the tourism industry. Mega projects have been undertaken in air, road and rail connectivity to ensure seamless and comfortable travel in the tourism industry of Bangladesh. While the third Terminal of Hazrat Shahjalal International Airport is in final stage of completion, the runway expansion of Cox's Bazar Airport is progressing at a faster pace. Moreover, modern expressway, rail communication, aircraft with modern facilities in the fleet and interest to operate flights in Bangladesh by new airlines etc. have explored the unlimited possibilities of tourism through uninterrupted communication with various districts in Bangladesh.

Sustainable and responsible tourism is one of the most important aspects of tourism worldwide. The present government has taken various initiatives to ensure environment-friendly investment in tourism. These initiatives will contribute to achieving the global agenda of Sustainable Development Goals 2030 as well as ensuring sustainable tourism. I am confident that tourism will be one of the driving forces in achieving Vision 2041 and transform Bangladesh into **Smart Bangladesh.**

I wish all success for the World Tourism Day 2023.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu
Long live Bangladesh.

(Md. Mokammel Hossain)

চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও **'পর্যটনে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ'** প্রতিপাদ্যকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২৩ অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে পালন করছে। এ বছরের প্রতিপাদ্যে সকল মানুষ, ধরিত্রী এবং মানবজাতির কল্যাণের জন্য পর্যটন শিল্পে পর্যাপ্ত টেকসই বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা-কে তুলে ধরা হয়েছে। জাতিসংঘের ঘোষিত এবছরের প্রতিপাদ্য 'Global Goal SDG-২০৩০' কে চমৎকারভাবে প্রতিফলিত করছে। আমরা সবাই জানি যে, টেকসই পর্যটন উন্নয়ন যে কোন জাতির উন্নয়নকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। টেকসই পর্যটন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং আমাদের ধরিত্রীর সুরক্ষার একটি অন্যতম হাতিয়ার। বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (ইউ.এন.ডাব্লিউ.টি.ও) কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিপাদ্যকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশে টেকসই পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য আমাদের পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগের পাশাপাশি জলবায়ু-সহনশীল প্রকল্প গ্রহণ করা জরুরি।

আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে এস.ডি.জি অর্জন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্প ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) দেশের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে অনেকগুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উপকূলীয় অঞ্চলসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে টেকসই পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বাপক ইতোমধ্যে কক্সবাজার, কুয়াকাটা, মংলা, সিলেট এবং পার্বত্য জেলাসমূহে পর্যটন সুবিধাদি স্থাপন করেছে। এছাড়াও, পরিবেশবান্ধব ও দায়িত্বশীল পর্যটন বিকাশের জন্য হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপ, টাঙ্গুয়ার হাওর, বাগেরহাট এবং দেশের অন্যান্য পর্যটন সম্ভাবনময় এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করেছে।

বাংলাদেশে টেকসই পর্যটন উন্নয়নের জন্য দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। টেকসই পর্যটন উন্নয়নে আমরা তিনটি মৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছি যথাক্রমে পরিবেশ সুরক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্থানীয় মানুষের উপকার। এগুলোর মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি করা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পর্যটন শিল্পে শুধুমাত্র গতানুগতিক বিনিয়োগ কাম্য নয়। এখন সময় এসেছে পর্যটনে নব উদ্যোগ এবং উদ্ভাবনীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বহুমূখী উৎপাদনশীলতাকে সহায়তা করা। পরিবেশ এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণ নিশ্চিত করার বিষয়ে আমাদের আপোষ করার কোন সুযোগ নেই। আমাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে ধরিত্রীর সুরক্ষা সহ সকলের উপযুক্ত সুবিধাদি নিশ্চিত করা।

আমি বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২৩ এর সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ রাহাত আনোয়ার, গ্রেড-১ **)**

Chairman (Grade-1)
Bangladesh Parjatan Corporation
(Government Tourism Organization)

Message

Like elsewhere of the world, Bangladesh also observes the World Tourism Day-2023 underlining the theme 'Tourism and Green Investment' with much fervor and enthusiasm. This year the theme has highlighted the need of more investment in tourism industry for the betterment of people, planet and the prosperity of mankind. The concept of the theme also reflects the UN sponsored Agenda Global Goal – SDG to be achieved by 2030. We all know that sustainable tourism growth can leap forward the development of a nation in an effective and extensive way. Sustainable tourism is an effective instrument for employment generation, poverty reduction and ultimate sustainability of our mother Earth. Bangladesh appreciates the concept of the UNWTO theme that we can make overall development of the nation through green initiatives in tourism as well as undertaking climate-resilient projects.

It has already been proved that tourism industry of Bangladesh has immense potential to be complementary of Bangladesh's efforts to achieve the SDGs by 2030 and build Smart Bangladesh by 2041. Bangladesh has already initiated many programmes for sustainable tourism development in line with the SDGs. For employment generation and poverty reduction, Bangladesh Parjatan Corporation (BPC) is implementing various projects for environment-friendly and responsible tourism development in different parts of the country. For development of sustainable tourism in coastal and other areas of the country, BPC has already created many facilities in Cox's Bazar, Kuakata and Mongla, Sylhet and in the Hill-tracts region. In addition, to develop environment-friendly responsible tourism, BPC is implementing projects at Hatia & Nijhum Dwip, Tanguar Haor, Bagerhat and other tourism potential areas of the country.

We invite investment from home and abroad for the sustainable tourism development in the country. Our commitment is to make a balance amongst the three important issues – environmental benefit, economic benefit and community benefit. Now is the time for new and innovative solution, not mere traditional investment that promotes economic growth and productivity. There is no scope to compromise with the environment and local community benefit. Our motto is to ensure due benefit to all including protection of our mother planet.

I wish the World Tourism Day-2023 a great success for all of us of the world.

(Md. Rahat Anwar, Grade-1)

বিশ্ব পর্যটন দিবস

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

Tourism & Green Investments

পর্যটনে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ

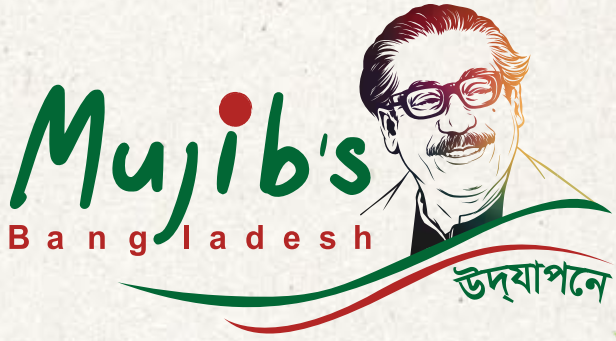

"ট্যুরিজম এন্ড গ্রীন ইনভেস্টমেন্টস" যার বাংলা প্রতিপাদ্য **"পর্যটনে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ"** নিয়ে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হতে যাচ্ছে বিশ্ব পর্যটন দিবস, ২০২৩। এ উপলক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে "মুজিব'স বাংলাদেশ" প্রচারণার অংশ হিসাবে চারদিনব্যাপী 'বাংলাদেশ ফ্যাস্টিভ্যাল'-এর আয়োজন করেছে। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সকাল ১১ টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ ফেস্টিভাল এর উদ্বোধন করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি।

বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। আগামি ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সকাল ০৭.৩০ টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে র‍্যালী শুরু হবে। র‍্যালিটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে শুরু হয়ে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে পুনরায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এসে শেষ হবে। র‍্যালীতে পর্যটন সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি স্টেকহোল্ডারগণ অংশগ্রহণ করবেন।

বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যালে এয়ারলাইন্স, হোটেল, রিসোর্ট, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, ট্যুরিস্ট-ভেসেল, ট্রাভেল এজেন্ট ও ট্যুর অপারেটর প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করবে, অংশগ্রহণ করবে বিভিন্ন জেলার পর্যটন পণ্য ও সেবা প্রদানকারীগণ। দেশব্যাপী

পর্যটনের বিভিন্ন অফারও অর্ন্তভুক্ত থাকবে এ উৎসবে। চারদিনব্যাপী আয়োজিত বাংলাদেশ ফেস্টিভালে ২০টি হোটেল রিসোর্ট, অঞ্চলভিত্তিক খাবারের স্টল ৭০ টি, ডিস্ট্রিক্ট ব্রান্ডিং এর আওতায় ২৯টি জেলা, ক্রাফট স্যুভিনিয়র ২৬টি, এয়ারলাইন্স ০২টি সহ বিনোদন পার্ক, ট্রাভেল এজেন্ট, ট্যুর অপারেটর, ট্যুর গাইড, বিদেশি দূতাবাসসহ ২০০ টির অধিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করছে। এ উৎসবে আয়োজন থাকবে বিভিন্ন দেশের খাবারসহ বাংলাদেশের অথেন্টিক ও ঐতিহ্যবাহী খাবারের। দেশি-বিদেশি ইউনিক ও অথেন্টিক খাবার সম্পর্কে জানার এবং উপভোগ করার সুযোগ থাকবে উৎসবে। দেশের ঐতিহ্যবাহী খাবারের মধ্যে থাকবে যশোরের জামতলার সাদেক গোল্লা, নরসিংদির নকশি পিঠা, নাটোরের কাঁচা গোল্লা, কুষ্টিয়ার কুলফি, পুরান ঢাকার হাজীর বিরিয়ানি, বাকরখানি, মুক্তাগাছার মণ্ডা, চট্টগ্রাম এর মেজবান, খুলনার চুইঝাল, বিসমিল্লাহ কাবাব, কুমিল্লার রসমালাইসহ ৬৪টি জেলা থেকে ৭০টির বেশি ঐতিহ্যবাহী ফুড স্টল। এ উৎসবে তাঁত, জামদানি তৈরীর প্রক্রিয়া দেখা যাবে। আমাদের ঐতিহ্য মসলিন পুনরুদ্ধার হওয়ার গল্প এবং মসলিন তৈরীর প্রক্রিয়া প্রদর্শন করা হবে। আমাদের সকলেরই মসলিন দেখার অপূর্ব সুযোগ তৈরি হবে উৎসবে।

দর্শনার্থীগণকে তাদের আকর্ষণীয় ট্যুর প্লান তৈরী করতে এ উৎসব সহায়তা করবে। দর্শনার্থীগণ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, পুরাকীর্তি, পর্যটন সম্পদ সম্পর্কে জানতে পারবেন। প্রতিটি জেলার পর্যটন আকর্ষণের ছবি দেখার সুযোগ পাবেন।

বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে পর্যটক ও পর্যটন কেন্দ্রের নিরাপত্তা, আবাসন, এভিয়েশন খাতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা এবং পর্যটনশিল্পে নারীর অংশগ্রহণ, প্রত্নপর্যটন, খাদ্যপর্যটন, পর্যটন ও এভিয়েশন সাংবাদিকতা, প্লাস্টিক ফ্রি সেন্টমার্টিন ইত্যাদি বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। চারদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে থাকবে গম্ভীরা, সিলেটের আঞ্চলিক গান, গাজী কালুর পাঠ, পথ নাট্য, বাউল গান, পুথি পাঠ, কাওয়ালী এবং বিশিষ্ট শিল্পীগণের গানের আয়োজন ইত্যাদি।

বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপনের জন্য আমরা প্রতিবছর নিয়মিতভাবে এ ধরনের আয়োজন করার পরিকল্পনা করছি। এই উৎসব হবে একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখান থেকে বাংলাদেশের সকল পর্যটন আকর্ষণ জানার সুযোগ তৈরী হবে। বাংলাদেশ ফ্যাস্টিভ্যাল বাংলাদেশের সকল ঐতিহ্যকে যেমন আপনার কাছে উপস্থাপন করবে, তেমনি অপরূপ এই বাংলার আনাচে–কানাচে ঘুরে বেড়ানোর সকল সুযোগ সুবিধা তুলে ধরবে।

সমৃদ্ধ বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার গল্পে বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে সাজানো হবে এ উৎসব। যাতে ভবিষ্যতে কাউকে বলতে না হয় "দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া"। চারদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ফুড ফ্যাস্টিভ্যাল, কারুশিল্প, পর্যটন সম্পদের প্রদর্শনীসহ সব আয়োজনে সকলকে অংশগ্রহণের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

উৎসব আয়োজনের সকল কৃতিত্ব আমাদের পর্যটন স্টেকহোল্ডারগণের। আমরা খুবই আনন্দিত যে, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সাথে যুক্ত সকলেই আমাদের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করছেন। এ উৎসব আয়োজনে আইএলও, স্পেলবাউন্ড, এয়ারলাইন্স, হোটেল, রিসোর্ট, এমিউজমেন্ট পার্ক, ট্রাভেল এজেন্ট, ট্যুর অপারেটর, খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আমাদের সহায়তা করছে। সকল সহায়তা প্রদানকারীকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে আমাদের টাইটেল স্পন্সর মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক। মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে আমরা ধন্যবাদ জানাই ।

এ উৎসবের মাধ্যমে আমাদের পর্যটন সেবা, পর্যটন পণ্য, ঐতিহ্যবাহী খাবার ব্র্যান্ডিং করা হবে। আমরা আশা করি বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল পর্যটন স্টেকহোল্ডারগণের মধ্যে উদ্দীপনা জাগাবে, কোভিড-১৯ পরবর্তী পর্যটন পুনরুদ্ধারের কাজকে গতিশীল করবে এবং পর্যটন শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সূচিপত্র

শিরোনাম	লেখক	পৃষ্ঠা নং
পর্যটনে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ	আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের	০১
স্মার্ট ট্যুরিজম: প্রেক্ষিত স্মার্ট বাংলাদেশ	হরিদাস ঠাকুর	০৫
পর্যটন শিল্প প্রেক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ	ডা. জান্নাতুল ফেরদৌসী	০৯
সফল থাই পর্যটনের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের পর্যটন খাতের কৌশল নির্ধারণ	মোঃ আব্দুল হাই	১৩
পর্যটনের তথ্য উপাত্তের সংকট	জাবেদ আহমেদ	১৫
পর্যটন উন্নয়নে করণীয়	সৈয়দ হাবিব আলী	১৮
পর্যটনে সবুজ বিনিয়োগ অনিবার্য	মোখলেছুর রহমান	২২
টুঙ্গিপাড়ার পুরাকীর্তি ও বঙ্গবন্ধুর পিতৃভূমি পরিপ্রেক্ষিত বিশ্বপ্রত্নপর্যটন সম্ভাবনা	ড. মো. আতাউর রহমান	২৬
বিনোদন পার্ক: বাংলাদেশের পর্যটন বিকাশে সম্ভাবনাময় একটি আকর্ষণ	মোহাম্মদ সাইফুল হাসান	৩৪
গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়ন	ওমর ফারুক	৩৯
গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নে শাহজাদপুরের পর্যটনশিল্পের অমিত সম্ভাবনা ও পদক্ষেপ	সাদিয়া আরেফিন	৪২
গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়ন	নুসরাত জাহান	৪৬
নিরাপত্তা-পরিচ্ছন্নে, সুফল আনে পর্যটনে	শরদিন্দু শেখর রায়	৪৯
টেকসই উন্নয়ন ও টেকসই পর্যটনের যোগসূত্র	সাজু সরদার	৫১
পঞ্চগড় জেলায় টেকসই পর্যটন বিকাশের সম্ভাব্যতা	উম্মে হালিমা শ্রাবনী	৫৪
কৃষি ও গ্রামীণ পর্যটনে সমৃদ্ধি ঘটছে উত্তরাঞ্চলে	এসকে দোয়েল	৫৮
গ্যাস্ট্রোনোমি ট্যুরিজম: সম্ভাবনা চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়	মো: বিল্লাল হোসেন	৬২
হালাল পর্যটন ও বিশ্বায়ন	বেনজির আহমেদ	৬৫
পর্যটন-সম্ভাবনা : ছোটো ছোটো উদ্যোগ বদলে দেবে চিত্র	আবু আফজাল সালেহ	৬৯
শরণখোলায় ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নে বিনিয়োগ সম্ভাবনা	মো: উসমান গনি	৭২
মৌসুমি ফলভিত্তিক কৃষি পর্যটন	জাকারিয়া জিহাদ	৭৬
শেরপুর জেলার গারো পাহাড়: পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনা	সুবেদা খাতুন	৮০
ফ্লোরাল ট্যুরিজম	মোঃ নাফিজ মন্ডল	৮৪
বাংলাদেশে কৃষি পর্যটন সম্ভাবনা	খোন্দকার মোঃ মেসবাহুল ইসলাম	৮৭
ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নে বিনিয়োগ সম্ভাবনা	সাব্বির আহমেদ আরমান	৯২

শিরোনাম	লেখক	পৃষ্ঠা নং
মুজিব'স বাংলাদেশ: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে পর্যটন	মো. বেলায়েত হোসেন	৯৪
পর্যটন নিরাপত্তা	মোছা. ইয়াছমিন খাতুন	৯৭
বাংলাদেশের পর্যটন ও পর্যটক আকর্ষণে ট্যুর গাইডিং	শিকদার নূরুল মোমেন	১০০
মুজিব'স বাংলাদেশ : সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে পর্যটন	আশুতোষ সাহা	১০৩
ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নে বিনিয়োগ সম্ভাবনা	বীরমুক্তিযোদ্ধা আলী আহম্মদ দেওয়ান	১০৬
সিলেটে পর্যটকদের আকর্ষণ	মীর লিয়াকত আলী	১০৮
কৃষিভিত্তিক পর্যটন প্রান্তিক পর্যায়ে বৃহৎ অর্থনীতির সহায়ক	মোহাম্মদ আবদুল্লাহ মজুমদার	১১১
এগ্রো ট্যুরিজম ও বাংলাদেশ	সামিয়া আফরোজ ইভা	১১৪
পর্যটন সংরক্ষণ ও উন্নয়নে ইকো-ট্যুরিজম এবং ট্যুর গাইডিংয়ের ভূমিকা	মো. সাইফুল্লার রাব্বী	১১৭
পর্যটন শিল্প ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন	ড. মোহাম্মদ আবু তাহের	১১৯
Rural Tourism including Community, Homestay, Farm, Islamic, Gastronomy, Sports, Shopping, River and Ecotourism: Partnerships among Various Government Agencies	Dr. Moslehuddin Chowdhury Khaled	১২৩
Endless opportunities to build a career in food and beverage services in the hospitality industry	Mohammad Badruddoza Talukder	১২৬
Agro-tourism a new dimension of tourism sector in Bangladesh	Kaiser uddin Ahammad	১২৮
Safety and Security of Tourism and Tourists Attraction	Sajnin Dewan Ria	১৩২
Tourism Transportation System in Bangladesh: Prospects and Challenges	Md.Mahamudun Noby Rupok	১৩৬
Mujib's Bangladesh: The Role of Tourism in Building a Prosperous Bangladesh	Zahid Hasan Akash	১৩৯

[*এ স্মরণিকায় প্রকাশিত লেখার মতামত লেখকের নিজস্ব]

পর্যটনে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ

আবু তাহের মোহাম্মদ জাবের

পর্যটন শিল্প

পর্যটন হচ্ছে এক ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। ভ্রমণ, বিনোদন, অবকাশযাপন, উৎসব, মেলা, আবাসন, খাবার, পর্যটন-পরিবহণ, পর্যটন-শিক্ষা, পর্যটন-প্রশিক্ষণ, পর্যটন-প্রযুক্তি, পর্যটন-প্রকাশনা, স্যুভেনির শপ ইত্যাদি পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত বাণিজ্যিক কার্যক্রম নিয়ে পর্যটনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়। জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২-এ পর্যটনশিল্প একটি বহুমাত্রিক রূপ লাভ করেছে। যেখানে পর্যটনশিল্পের ১২টি উপখাত নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে শতাধিক কর্মকাণ্ড, উদ্যোগ, সেবাকর্ম, ব্যবসা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২-এর ১৭টি অগ্রাধিকার শিল্পের মধ্যে পর্যটনশিল্পের অবস্থান তৃতীয় এবং ৩৪টি সেবাশিল্পের তালিকায় পর্যটনসেবার অবস্থান নবম।

জাতীয় শিল্পনীতিতে তালিকাভুক্ত পর্যটনশিল্পের ১২টি উপখাত

১. আবাসন : হোটেল, রিসোর্ট, সেনিটোরিয়াম অথবা নন হোটেল আবাসন যেমন হোমস্টে, ট্রি-হাউজ, তাঁবু, রুরাল বাংলো, নৌ-আবাস, বজরা বা অন্য কোনো আবাসন ব্যবস্থা।

২. খাবার : যে-কোনো দেশি-বিদেশি খাবার ও পানীয়, রেস্টুরেন্ট, ক্যাটারিং, কনফেকশনারি, টেকওয়ে এবং যে-কোনো খাদ্যদ্রব্য ও খাবারের প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

৩. যানবাহন : পর্যটনে ব্যবহার্য সড়ক, রেল, সমুদ্র, আকাশ ও মহাকাশ যানসহ যে-কোনো যান্ত্রিক-অযান্ত্রিক যানবাহন এবং নৌকা, পালকি, গরু, ঘোড়া ও মহিষের গাড়িসহ সকল চিরায়ত যানবাহন।

৪. পর্যটন আকর্ষণ ও বিনোদন : প্রত্নস্থল, জাদুঘর, সংগ্রহশালা, প্রদর্শনী কেন্দ্র, জার্মপ্লাজম সেন্টার, হস্তশিল্প কেন্দ্র, পর্যটন চলচ্চিত্র, ড্রামা থিয়েটার, টেলিফিল্ম, চারু ও কারুকলা, চিত্রকলা ডকুমেন্টারি, রেডিও বা টিভি প্রোগ্রাম ইত্যাদি এবং যে-কোনো পার্ক, উদ্যান, ইনডোর ও আউটডোর বিনোদন কেন্দ্র বা অন্য কোনো আকর্ষণ ও বিনোদন স্থল।

৫. পর্যটন কার্যক্রম : কৃষি পর্যটন, প্রত্ন পর্যটন, সাংস্কৃতিক পর্যটন, খাদ্য পর্যটন, জলাভূমি পর্যটন, শিক্ষা পর্যটন, স্বাস্থ্য পর্যটন, জীবনধারা পর্যটন, কমিউনিটিভিত্তিক পর্যটন, ইকো পর্যটন, দায়িত্বশীল পর্যটন ইত্যাদিসহ যে-কোনো ধরনের টেকসই পর্যটন কর্মকাণ্ড।

৬. পর্যটন মধ্যস্থতাকারী : ট্রাভেল এজেন্ট, ট্যুর অপারেটর, ট্যুর ব্রোকার ও ল্যান্ড অপারেটরসহ যে-কোনো পর্যটন মধ্যস্থতাকারী।

৭. পর্যটন শিক্ষা : যে-কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক পর্যটন শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ।

৮. পর্যটন মিডিয়া ও প্রকাশনা : পর্যটন টেলিভিশন চ্যানেল, রেডিও, কমিউনিটি রেডিও, প্রিন্টেড ও অনলাইন পত্রিকা, নিউজ পোর্টাল ও ইউটিউব চ্যানেলসহ যে-কোনো প্রিন্টেড ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া। পর্যটন বিষয়ক প্রিন্টেড বা ডিজিটাল বই, জার্নাল পিরিয়ডিক্যালস, বুলেটিন, ব্রুশিওর, মানচিত্র, ভৌগোলিক বা অন্য কোনো পর্যটন প্রকাশনা সামগ্রী।

৯. পর্যটন প্রযুক্তি : পর্যটনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ডিজিটাল, মেকানিক্যাল, ইলেট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিকস, বায়োলজিক্যাল ও জেনেটিক প্রযুক্তি, বায়োমিমিক্রি এবং পর্যটনে ব্যবহার্য টুলস ও ডিভাইসসমূহ।

১০. পর্যটন ইভেন্ট : সভা, সেমিনার, এক্সিভিশন, সিম্পোজিয়াম, পর্যটন মেলা ও উৎসব আয়োজনসহ পর্যটনের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-কোনো ইভেন্ট।

১১. পর্যটন মার্কেটপ্লেস : পর্যটন পণ্য ও সেবা মার্কেটিং ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সমবায়ভিত্তিক পর্যটন শপ ও মার্কেট, ডিজিটাল ওপেন ই-মার্কেট, ই-কমার্স, পর্যটন পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র ও স্যুভেনির শপসহ পর্যটনপণ্য ও সেবা বিক্রয়ের যে-কোনো মার্কেটপ্লেস।

১২. পর্যটনের বিবিধ কর্মকাণ্ড : পর্যটন গ্রাম, পর্যটন নগরী, পর্যটন কেন্দ্র, যোগকেন্দ্র, ব্যায়ামাগার, এলোপ্যাথিক বা চিরায়ত চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন, গাইডিং পর্যটন স্থাপনায় ইনটেরিয়র ডিজাইনিং, ল্যান্ডস্ক্যাপ ডিজাইনিং, প্লান্ট ডিজাইনিং এবং পর্যটনের যে-কোনো অবকাঠামো।

পর্যটনশিল্পে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ

পর্যটনশিল্পে বিনিয়োগের প্রধান ৪টি ক্ষেত্র হতে পারে। ১. অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ২. পর্যটন উদ্যোক্তা তৈরি, ৩. পর্যটন সেবা প্রদানকারীর দক্ষতা উন্নয়ন, ৪. পর্যটন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন এবং ৫. পর্যটনবান্ধব নাগরিক তৈরির জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

আমাদের দেশের পর্যটন আকর্ষণকে দেশি-বিদেশি পর্যটকের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নিম্নবর্ণিত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করা প্রয়োজন :

হোটেল, রিসোর্ট, সেনিটোরিয়াম, হোমস্টে, ট্রি-হাউজ, তাঁবু, রুরাল বাংলো, নৌ-আবাস, বজরা, রেস্টুরেন্ট, ক্যাটারিং, কনফেকশনারি, সড়কপথ, রেলওয়ে, সমুদ্রযান, আকাশযান, নৌকা, পালকি, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মহিষের গাড়ি, সংগ্রহশালা, প্রদর্শনী কেন্দ্র, হস্তশিল্প কেন্দ্র, ডকুমেন্টারি, টিভি প্রোগ্রাম, পার্ক, উদ্যান, ইনডোর ও আউটডোর বিনোদন কেন্দ্র, নদী ও সমুদ্রতীরে ল্যান্ডিং স্টেশন, জেটি নির্মাণ ইত্যাদি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মাবীজ, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বঙ্গবন্ধু টানেল, মেট্রোরেল, কক্সবাজার পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণ ইত্যাদির মাধ্যমে যে যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন করেছেন তা পর্যটন খাতের উন্নয়নে অবদান রাখছে। পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। ভবিষ্যতে পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি বিনিয়োগ অব্যাহত থাকবে। অবকাঠামো উন্নয়ন পরিবেশবান্ধব হওয়া আবশ্যক। আমাদের বৃক্ষরাজি ও প্রাণীকুল বিপন্ন না করে; আমাদের পাহাড়, বন, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি ধ্বংস না করে, পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষা করে, পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করতে হবে। নদী ও সমুদ্রে পর্যটন পরিবহণের জন্য এমন কোনো যান প্রস্তুত করা ও ব্যবহার করা যাবে না, যার ফলে পানি ও প্রাণী বিনষ্ট হতে পারে।

পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়ন ও নির্মাণের সময় বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে, যাতে প্রাণীকুল হারিয়ে না যায়, দ্বীপ ও অরণ্য সুরক্ষিত থাকে। ইকো-ফ্রেন্ডলি, পরিবেশবান্ধব উন্নয়নে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আবশ্যক। পরিবেশবান্ধব পর্যটন উন্নয়নে বেসরকারি বিনিয়োগকারীকে সরকারিভাবে প্রণোদনা বা স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা এবং ব্যাংক কর্তৃক সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান ব্যবস্থার সূচনা করা যেতে পারে।

পর্যটন উদ্যোক্তা তৈরি

আমাদের দেশে ৭টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ১০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ১৪টি কলেজে ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি বিষয় পড়ানো হয়। এসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি বিষয়ে প্রায় ১০০০ গ্রাজুয়েট তৈরি হয়। এরা সকলেই চাকুরি প্রার্থীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। পর্যটন শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। যাতে তারা স্ব-কর্মে নিয়োজিত হতে পারে, অনেক তরুণকে কর্মে নিয়োজিত করতে পারে। পর্যটন শিল্পের ১২টি উপখাতের আওতায় যে সকল বিষয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা হওয়ার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে সেগুলো হচ্ছে, হোমস্টে, খাদ্যদ্রব্য ও খাবারের প্রতিষ্ঠান, হস্তশিল্প কেন্দ্র, কমিউনিটি-ভিত্তিক পর্যটন, অনলাইন পত্রিকা, ইউটিউব চ্যানেল, ইভেন্ট আয়োজন, পর্যটন পণ্য ও সেবা মার্কেটিং ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সমবায়ভিত্তিক পর্যটন শপ, স্যুভেনির শপ ইত্যাদি। উদ্যোক্তা তৈরির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা জরুরি। পর্যটনশিল্পে ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্প উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানকালে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে সচেতন করা আবশ্যক, যাতে প্রতিবেশ ও পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে পর্যটন পণ্য উৎপাদন এবং ব্যবসা পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।

পর্যটন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন

সুন্দর-মনোরম পর্যটন আকর্ষণ পর্যটকের নিকট সুন্দরতমভাবে, আকর্ষণীয়ভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য, উপস্থাপন করার জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার করা জরুরি। পর্যটনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ডিজিটাল, মেকানিক্যাল, ইলেট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিকস, বায়োলজিক্যাল ও জেনেটিক প্রযুক্তি, বায়োমিমিক্রি এবং পর্যটনে ব্যবহার্য টুলস ও ডিভাইসসমূহ ব্যবহারের জন্য পর্যটন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য মেধাবী তরুণদের কাজে লাগানোর জন্য বিনিয়োগ করা আবশ্যক। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পর্যটন এলাকার ধারণক্ষমতা নির্ধারণ করা, ইকো-ট্যুরিজম এলাকায় পর্যটকের দায়িত্বশীলতা মনিটর করা, পর্যটন এলাকা প্লাস্টিকমুক্ত করা, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা যায়। প্রযুক্তিগত ডিভাইসের মাধ্যমে পর্যটন আকর্ষণের বিবরণ বিভিন্ন ভাষার পর্যটকের নিকট পৌঁছে দেয়া যায়। ইকো-ট্যুরিজম ও দায়িত্বশীল পর্যটন উন্নয়নের জন্য পর্যটন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়নে বিনিয়োগ করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা সময়ের দাবি।

পর্যটন সেবা প্রদানকারী মানবসম্পদ উন্নয়ন

আমাদের পর্যটন আকর্ষণ প্রধানত প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রত্নসম্পদ নির্ভর। কেবল পর্যটন সম্পদ থাকলেই পর্যটন বিকাশ হবে না। পর্যটন বিকাশের জন্য পর্যটন সম্পদের সঙ্গে পর্যটন এলাকায় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন খুবই জরুরি। হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, বিনোদন কেন্দ্র, রেস্টুরেন্ট, পরিবহন ইত্যাদি খাতে যারা সেবা প্রদান করেন তাদের সেবা মানসম্মত না হলে পর্যটক আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে না। হাসিমুখে দক্ষতার সঙ্গে সেবা প্রদান করা হলেই পর্যটকগণ আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। পর্যটকের অভিজ্ঞতা যদি আনন্দদায়ক হয় তাহলে তিনি বারবার সেখানে আসতে চাইবেন। অধিকন্তু তার আত্মীয়-পরিজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের পর্যটন আকর্ষণে বেড়াতে উৎসাহিত করবেন। অভিজ্ঞতা যদি আনন্দদায়ক না হয় তাহলে তিনি পুনরায় আসবেন না। কাউকে আসতে উৎসাহিত করবেন না। প্রতিটি পর্যটন সেবা কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করা আবশ্যক। এক জনের আচার-আচরণ মানসম্মত না হলে, ব্যবহার খারাপ হলে তা সমগ্র সেক্টরের ভাবমূর্তি খারাপ করে, দেশের নেতিবাচক ব্রান্ডিং হয়। পর্যটন সেবা কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য, পর্যটন ও হসপিটালিটি খাতে দক্ষ কর্মী নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য কক্সবাজার, কুয়াকাটা, শ্রীমঙ্গল, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ গুরুত্বপূর্ণ পযটন এলাকায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ করা জরুরি। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার সময় পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে, তবেই তা হবে পর্যটনে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ।

সচেতনতামূলক কার্যক্রম

পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য পর্যটন মনস্ক, পর্যটনবান্ধব নাগরিক খুবই জরুরি। পর্যটন মনস্ক, পর্যটনবান্ধব নাগরিক তৈরির জন্য জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এজন্য সেমিনার, কর্মশালা, আলোচনা সভা, ব্যক্তিগত মোটিভেশন ইত্যাদি করা যায়। সরকারি উদ্যোগ, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসমূহের উদ্যোগ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এবং পর্যটন কর্মীদের উদ্যোগ–সম্মিলিতভাবে এই জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায়। জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম, পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষা করে পর্যটন এবং অবশ্যই ইকো-ট্যুরিজমকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ইকো-ট্যুরিজম হচ্ছে প্রকৃতিভিত্তিক পর্যটন এলাকায় দায়িত্বশীল ভ্রমণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, স্থানীয় অধিবাসীদের কল্যাণ এবং অবশ্যই এর সঙ্গে যুক্ত সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ। এটি কেবল কোনো পর্যটন আকর্ষণ দেখা নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। এটা প্রকৃতির কোলে প্রবেশ করা এবং এর সৌন্দর্যে অবগাহন করা কিন্তু প্রকৃতিকে বিরক্ত ও বিনষ্ট না করা। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পারলে এবং সাধারণ মানুষকে পর্যটনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারলেই বাংলাদেশে পর্যটন বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। মানুষের উন্নয়নে বিনিয়োগ করাই হবে অর্থপূর্ণ বিনিয়োগ, পর্যটনে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ।

লেখক : প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

স্মার্ট ট্যুরিজম: প্রেক্ষিত স্মার্ট বাংলাদেশ

হরিদাস ঠাকুর

১.০০: স্মার্ট ট্যুরিজম দর্শন

'TOURISM- কে SMART' করতে পারলেই বাংলাদেশ হবে বিশ্বের অন্যতম একটি পর্যটন গন্তব্য (Tourism Destination). আমরা 'স্মার্ট ট্যুরিজম' বলতে কী বুঝবো? বর্তমানে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' একটি অত্যন্ত পরিচিত শব্দগুচ্ছ এবং এটি প্রত্যাশিত উন্নয়ন দর্শন হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে। তাই 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এ 'স্মার্ট ট্যুরিজম' নিয়ে এখনই ভাবনার রসদ আমাদের সামনে এসে উপস্থিত বলা যায়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন দর্শনের আলোকে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি উপাদান পাই। এগুলো হলো:

(ক) স্মার্ট জনগণ (Smart Citizen)
(খ) স্মার্ট সমাজ (Smart Society)
(গ) স্মার্ট অর্থনীতি (Smart Economy)
(ঘ) স্মার্ট সরকার (Smart Government)

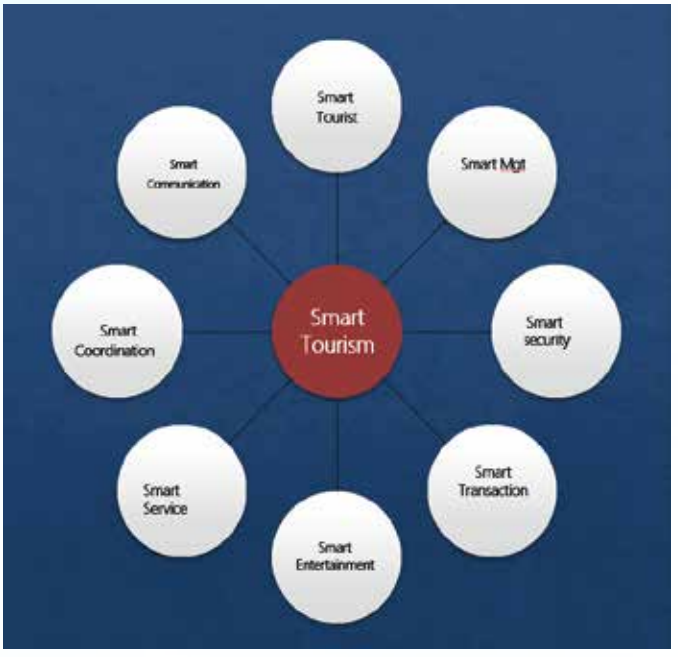

চিত্র: স্মার্ট ট্যুরিজমের উপাদান/নিয়ামকসমূহ

'স্মার্ট ট্যুরিজম' হচ্ছে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' কর্মযজ্ঞের একটি প্রায়োগিক উপাদান। 'স্মার্ট ট্যুরিজম' গড়ে তুলতে হলে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'–কর্মযজ্ঞের সঙ্গে একে সম্পৃক্ত করতে হবে। বলা যেতে পারে, স্মার্ট বাংলাদেশের মূল স্তম্ভ চারটির সঙ্গে ট্যুরিজমের উপাদানসমূহকে সমন্বয় করতে হবে। এর জন্য চারটি উপাদান–'স্মার্ট সিটিজেন' অর্থাৎ সকল নাগরিককে প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ করতে হবে, 'স্মার্ট ইকোনমি' অর্থাৎ সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রমে প্রযুক্তির প্রয়োগ করতে হবে, 'স্মার্ট গভর্নমেন্ট' অর্থাৎ প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ ও নাগরিকবান্ধব পর্যটন ব্যবস্থাপনা তথা নীতি সমন্বয় এবং 'স্মার্ট সোসাইটি' অর্থাৎ সামগ্রিক সামাজিক কাঠামোয় প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুফল নিশ্চিত করতে হবে। প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে 'স্মার্ট ট্যুরিজম' হবে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর একটি কার্যকর উত্তরণ পর্ব।

২.০০: স্মার্ট টুরিজমে প্রয়োজন স্মার্ট বাংলাদেশ দর্শনের প্রয়োগ

২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলার জন্য জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি সম্প্রসারণ করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সরকার। জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বাস্তবায়নে বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪টি মাইলস্টোন দিয়েছেন। এগুলো হলো: প্রথমত, ২০২১ সালের–রূপকল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ, দ্বিতীয়ত, ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, তৃতীয়ত, ২০৪১

সালে উন্নত বাংলাদেশ বা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং চতুর্থ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ সালের জন্য ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মযজ্ঞের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হলো:

(১) জনগণের মাথাপিছু আয় হবে কমপক্ষে ১২,৫০০ ডলার।
(২) দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৩ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনা।
(৩) বাংলাদেশকে উচ্চ আয়ের দেশে রূপান্তর।

[Two principal visions underpin the PP2041:

- Bangladesh will be a developed country by 2041, with per capita income of over USD 12,500 in today's prices, and fully in tune with the digital world.
- Poverty will become a thing of the past in Sonar Bangla.]

(Source: Making Vision 2041 a Reality PERSPECTIVE PLAN OF BANGLADESH 2021-2041, GED,page no- 5-6)

সার্বিকভাবে বলা যেতে পারে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' কর্মযজ্ঞ সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারসম্পন্ন এমন একটি বাংলাদেশকে পাবো যেখানে:

(১) জনগণের জীবনমান হবে উন্নত ও সমৃদ্ধ।
(২) দেশ হবে সকল ধরনের অপরাধমুক্ত।
(৩) দেশ হবে সকল ধরনের দুর্নীতিমুক্ত।
(৪) দেশে কোনো অপশাসন থাকবে না।
(৫) সঠিক লোক সঠিক জায়গায় অধিষ্ঠিত হবে।
(৬) কর্মক্ষম কোনো হাত বেকার থাকবে না।
(৭) দেশ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম হবে এবং
(৮) দেশে থাকবে একটি Knowledge Based Society.

উপরোক্ত ৮টি নিয়ামক স্মার্ট টুরিজমের একটি প্রকৃষ্ট বার্তাবরণ সৃষ্টি করবে যা আমাদের পর্যটন গন্তব্যকে বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে সমুজ্জ্বল করে তুলবে।

৩.০০: পর্যটনের দর্শন–দর্শনের পর্যটন

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগার থকেে মুক্তি পেয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন বাংলাদশে পা রেখেছিলেন, তখন তিনি বিদেশি সাংবাদিকদের নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন–Bangladesh is a wonderful country. We have fertile land and immense natural resources. বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে এত বেশি ভালোবাসতেন যে, তিনি বাংলাদেশকে সুইজারল্যান্ডের মতো করে সাজাতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই দেশ সাজানোর কর্মপরিকল্পনার মাঝে রয়েছে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন বীজ।

বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশ পর্যটন সম্ভাবনার এক অফুরন্ত রত্নদ্বীপ। আদর্শ পর্যটনের সকল উপাদান/নিয়ামকই বাংলাদেশে বিদ্যমান। এ রত্নদ্বীপের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে আমাদেরকে স্মার্ট বাংলাদেশের উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে।

পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নসাধন করতে হয়। আমাদের জন্য অত্যন্ত সুখবর যে, বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পর্যটন শিল্পকে সামগ্রিক উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ২০১৮ সালে বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'পর্যটন শিল্পের সর্বক্ষেত্রে ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এই শিল্পকে একটি অন্যতম অর্থনৈতিক খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।'

২০২১ সালের বিশ্ব পর্যটন দিবসের বাণীতেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ শিল্পের উন্নয়নে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করেন:

"পর্যটন শিল্প বর্তমান বিশ্বে শ্রমঘন এবং সর্ববৃহৎ শিল্প হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নসহ দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য পর্যটনের গুরুত্ব অবশ্যম্ভাবী।

কৃষ্টি-ঐতিহ্য আর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ। এখানে রয়েছে অসংখ্য নদী নালা, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় স্থান, পাহাড়, বন, জলপ্রপাত, চা বাগান এবং বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ সুন্দর বন। বিশ্বের বৃহত্তম অবারিত বালুকাময় সমুদ্র সৈকতটি বাংলাদেশের কক্সবাজারে অবস্থিত। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রয়েছে বিস্তীর্ণ হাওড়, চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড় এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবন পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান। সবুজে ঘেরা গ্রামীণ নয়নাভিরাম সৌন্দর্যও ছুটির দিনে পর্যটকদের বাড়তি আকর্ষণ হতে পারে।

বাংলাদেশে পর্যটনের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আবহমান গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দায়িত্বশীল পর্যটন কার্যক্রম পরিচালনা করতে এবং এর সুফল যাতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ভোগ করতে পারে সে লক্ষ্যে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে" সে লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই পর্যটন দর্শন ও নির্দেশনার আলোকে কর্মসম্পাদনে পর্যটন সেক্টর একটি অর্থনৈতিক খাত হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

৪.০০: তুলে ধরতে হবে বাংলাদেশকে

অনেক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের বাংলাদেশ অথচ সঠিক প্রচার-প্রচারণার অভাবে বিশ্বের অনেক পর্যটক এই সম্পর্কে জানেন না। 'বাংলাদেশের প্রকৃতির অপরূপ বৈচিত্র্য যদি সঠিকভাবে বিদেশিদের কাছে তুলে ধরা যায়, তবে বাংলাদেশ হয়ে উঠবে বিশ্বে পর্যটনের এক অনন্য তীর্থস্থান। পর্যটনের এই বিপুল সম্ভাবনা থেকে কীভাবে বাংলাদেশ লাভবান হবে, তা ঠিক করার এখনই উপযুক্ত সময়। আর এ জন্য পর্যটনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সব পক্ষকে নিয়ে একযোগে কাজ করতে হবে।' -কথাটি বলেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূঁইয়া। তিনি আরও বলেন, 'বর্তমানে বিশ্বের মোট পর্যটকের প্রায় ৫০ শতাংশ ভ্রমণ করে ইউরোপে। আর প্রায় ২৫ শতাংশ ঘুরতে আসে এশিয়ায়। কিন্তু বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান বলছে- ২০৫০ সাল নাগাদ এশিয়া হবে পর্যটকদের অন্যতম গন্তব্য। তখন পৃথিবীর প্রায় ৫০ শতাংশ পর্যটক ভ্রমণ করবে এশিয়া মহাদেশে। তাই তো আমাদের লক্ষ্য ও সব কর্মপরিকল্পনা ঠিক করা উচিত কীভাবে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করব ভবিষ্যতের জন্য। কারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ।' (বাংলাদেশ প্রতিদিন: ২২ নভেম্বর ২০২১)

পর্যটনশিল্প পৃথিবীর একক বৃহত্তম শিল্প হিসেবে স্বীকৃত। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে পর্যটন এখন অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার খাত। পর্যটন ১০৯টি শিল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। পর্যটন বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার। পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা অপরিসীম। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহাসিক স্থাপনার স্মার্ট ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে নিয়ে যেতে পারে অনন্য উচ্চতায়। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে:

(১) কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত হলো পৃথিবীর একমাত্র দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন সমুদ্রসৈকত যা আর পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ বালুকাময় সৈকতটিতে কাদার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমুদ্রসৈকতের চেয়ে কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর রয়েছে অপার সম্ভাবনা। কক্সবাজারকে ঘিরে গৃহীত মহাপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন পর্যটন শিল্পে বিপ্লব আনতে পারে। কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতের অপার সম্ভাবনাকেও কাজে লাগাতে হবে।

(২) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের আধারকে ইকো ট্যুরিজমের মাধ্যমে মেলে ধরা যেতে পারে।

(৩) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের তিনটি জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটনের মূল উপকরণ হলো পাহাড়ে ঘেরা সবুজ প্রকৃতি যা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্নভিন্ন রূপে পর্যটকদের কাছে ধরা দেয়। পাহাড়, নদী আর ঝরনা এ নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম। এখানে প্রকৃতি যেমন ভিন্ন, তেমনি ভিন্ন এই এলাকার মানুষের জীবনাচার। সব মিলিয়ে পর্যটনের এক অপার সম্ভাবনার নাম এই পার্বত্য চট্টগ্রাম। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে।

(৪) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে এই বনের জীববৈচিত্র্য এটিকে পৃথিবীর অন্য যে কোনো পর্যটন কেন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র রূপে উপস্থাপন করছে।

(৫) পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক পর্যটন সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

(৬) সিলেট অঞ্চলের চা বাগান, রাতারগুল এবং হাওর-বাঁওড়সহ অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করতে হবে।

(৭) বাঙালি জাতির সংস্কৃতিকে পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণে পরিণত করতে হবে।

(৮) উপজাতীয় সংস্কৃতি এবং বৈচিত্র্য পর্যটনের একটি অন্যতম গন্তব্য হতে পারে।

(৯) দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক অনেক পর্যটন গন্তব্য। (রামসাগর-দিনাজপুর/দুর্গাসাগর-বরিশাল/ময়াদ্বীপ-কুমিল্লা/উত্তরবঙ্গের আমাজান আশুরারবিল-দিনাজপুর/ বিদ্যাসুন্দরীর দীঘি–ভোলা/ খানজাহান আলীর মাজার ও দীঘি ইত্যাদি)। গ্রামীণ পরিমণ্ডলের এসব পর্যটন গন্তব্যকে যথাযথভাবে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতে হবে।

(১০) নৌপর্যটনের পরিধি ও ব্যবস্থাপনা পর্যটনের পালকে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে।

৫.০০: এবারের সংগ্রাম হোক পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন সংগ্রাম

পর্যটন একটি সমন্বিত শিল্প। এ শিল্পকে অর্থনীতির সম্পদ ব্যবস্থাপনাগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। আমরা জানি, অর্থনীতির ভাষায় মূলধন পাঁচ প্রকার: (১) অর্থনৈতিক মূলধন (Economic Capital); (২) মানবীয় মূলধন (Human Capital); (৩) সামাজিক মূলধন (Social Capital); (৪) প্রাকৃতিক মূলধন (Natural Capital) এবং (৫) ভৌত মূলধন (Physical Capital). পর্যটন শিল্প অর্থনীতির এ পাঁচ প্রকার মূলধনকেই গতিশীল করে–টেকসই করে যদি সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়। এ পাঁচটি মূলধনকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে পর্যটন শিল্পের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প গতিশীল হয়ে তার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও পর্যটন শিল্প শক্তিশালী নিয়ামক হিসেবে আবির্ভূত হতে পারবে। এক্ষেত্রে কতিপয় কর্মসম্পাদন করতে হবে যা নিম্নরূপ:

(১) বিচ্ছিন্ন নয়, সমন্বিতভাবে পর্যটন কর্মপরিকল্পনা ও রোডম্যাপ বাস্তবায়ন করতে হবে।

(২) পর্যটন ব্যবস্থাপনাকে স্মার্ট বাংলাদেশের দর্শনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে। এ অনুযায়ী প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, ট্যুরিস্ট পুলিশ, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

(৪) পর্যটন ক্ষেত্রে কোনো সিন্ডিকেট নয়, আদর্শ অবকাঠামো ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

(৫) পর্যটন কার্যক্রমের বিভিন্ন উপাদান ও বিষয়াদি কঠোরভাবে সেবামূলক মানসিকতায় মনিটরিং করতে হবে।

(৬) অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে পর্যটকবান্ধব ও ব্যয়সাশ্রয়ী করতে হবে।

(৭) পর্যটকদের পর্যটন মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কোনো এক সময় নয়, সারা বছর যাতে পর্যটকরা পর্যটন কেন্দ্রে ঘুরতে যান, সে লক্ষ্যে প্রচার ও প্রচারণা চালাতে হবে।

(৮) পর্যটন কেন্দ্রের নিরাপত্তা, বিনোদন কেন্দ্র ও সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এ 'স্মার্ট ট্যুরিজম' একটি সময়ের দাবি। এ দাবি পরিপূরণ করাই সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা।

লেখক : উপসচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

পর্যটন শিল্প প্রেক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ

ডা. জান্নাতুল ফেরদৌসী

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প এ দেশের দর্শনীয় স্থান এবং উন্নত বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। আমাদের অভীষ্ট এবং অহংকার হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ-১৯৭১-এর চেতনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার অসাধারণ মনমাতানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদ।

বাংলাদেশের জন্য স্রষ্টা দান করেছেন তার অপার সৌন্দর্যের নিয়ামত। আমরা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা মেধা, প্রজ্ঞা, মননশীলতার যথাযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে সোনার বাংলাকে ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরি করে আজ জনগণকে উপহার দিয়েছেন স্মার্ট বাংলাদেশ। একটু পেছনের দিকে গেলে দেখা যাবে ২০০৮ সালে ইন্টারনেট এত বেশি দামি ছিল যে, জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য অবস্থানে ছিল না। স্বল্প সংখ্যক বা সীমিত কিছু মানুষ তা ব্যবহারের সুযোগ পেতো। কিন্তু আজ সমস্ত বাংলাদেশ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত ও সমৃদ্ধ। ফলে বাংলাদেশে পর্যটনের শিল্পের অপার সম্ভাবনার নান্দনিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। তরুণ প্রজন্ম আজ পর্যটন শিল্পের উন্নয়নসাধন করে স্বনির্ভর হচ্ছে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে মানুষের উন্নয়ন, দেশের উন্নয়ন এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার প্রত্যয় রয়েছে যা অত্যন্ত সম্ভাবনাময়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশে প্রত্যেকটি সেক্টরকে সুদক্ষ পর্যবেক্ষণ, সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করে উত্তরোত্তর উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এই সমস্ত অর্জন সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পর্যটন শিল্পের দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন বলে। অতএব পর্যটন শিল্পের যে সম্ভাবনা আমাদের দেশে আছে, তা আমাদের যথার্থভাবে কাজে লাগাতে হবে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন করে শ্রেষ্ঠ অর্থনীতির উন্নয়নসাধন করা সম্ভব এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য পর্যটন শিল্পের বিকল্প বলেও কিছু নেই। কেননা ডিজিটাল বাংলাদেশে তরুণদের কাজে লাগানো হচ্ছে। 'তরুণরা গড়ছে দেশ। ফ্রিল্যান্সাররা গড়ছে দেশ। পর্যটনের উন্নয়নের নেই শেষ। এইতো সোনার বাংলা–ডিজিটাল বাংলাদেশ। হাঁটছে স্মার্ট বাংলাদেশের পথে'।

পর্যটনের অপার সম্ভাবনার দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ পর্যটন সেক্টর হতে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। বাংলার সবুজে শ্যামলে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য বিরাজমান। এই অপরূপ প্রকৃতিরই আমাদের দেশের পর্যটন কাব্য রচনা করেছে। কবিতার ভাষায় আমরা বলতে পারি:

এইতো আমার সোনার বাংলা
এই তো আমার বাংলাদেশ
এই দেশেতে জন্ম নিয়ে
ফুল ফসলে আছিতো বেশ।
এই তো আমার বাংলাদেশ।
এই দেশেরই রূপকার–এই দেশেরই অহংকার
তার তুলনা হয় না জানি শ্রেষ্ঠ বাঙালি তাকেই মানি
তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রাণ
তার দানের নেইতো শেষ।
এই দেশেতে জন্ম নিয়ে

ফুল ফসলে আছিতো বেশ।
এই তো আমার বাংলাদেশ।
বিশ্ববাসী অবাক চোখে দেখছে দেশের উন্নয়ন
পর্যটনের উন্নয়নে দেশের সৌন্দর্য বিপণনে
এগিয়ে যাবে স্মার্ট বাংলাদেশ।
এই দেশেতে জন্ম নিয়ে
ফুল ফসলে আছিতো বেশ।
এই তো আমার বাংলাদেশ।

চিত্র-১: বঙ্গবন্ধু মিশে আছেন বাংলার মা-মাটি, মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে। এ প্রকৃতির সৌন্দর্যই পর্যটন মূলধন
(উৎস: ময়মনসিংহ জেলার সমবায়ী কৃষক আব্দুল কাদেরের নিজ হাতে সৃষ্ট বঙ্গবন্ধুর সবুজ প্রকৃতি)

স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট নাগরিকবৃন্দ নান্দনিক কর্মপরিকল্পনা করে যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সৃষ্টি করতে পারে নন্দিত পর্যটন শিল্প। একটি দেশকে তখনই স্মার্ট দেশ বলা যায় যখন সেখানে থাকে স্মার্ট সরকার, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা ও স্মার্ট নাগরিক। আর এই সবই এখন সৃষ্টি হয়েছে আমার সোনার বাংলায়–বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলায়–বাঙালিদের বাংলাদেশে। অতএব আমার সোনার বাংলা এখন আর শুধু সোনার বাংলাই নয়, ডিজিটাল বাংলাদেশই নয়–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট পরিকল্পনায় পর্যটনের ভূমিকা অপরিসীম। পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিপণন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের আশীর্বাদ।

বিশ্বের উন্নত দেশের নাগরিকদের বিনোদন প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত হবে বৈদেশিক মুদ্রা যা পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে অধিক সম্ভাবনাময়। হেনরি কিসিংজার বলেছিলেন–বাংলাদেশ একটি তলাবিহীন ঝুড়ি। যে দৈন্যদশার অবস্থাকে তিনি উপস্থাপন করেছিলেন তা আজ মিথ্যা প্রমাণিত।

এ অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশকে নিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার স্থান আমাদের হয়েছে। প্রকৃতি প্রেমিক পরিবেশকে হৃদয়ে ধারণকারী জননেত্রী শেখ হাসিনা দুঃসাহসী উন্নয়ন ধারাকে অব্যাহত রেখে বাংলাদেশকে তার পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

বাঙালিরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে অর্জন করেছে লাল সবুজের দেশ-বাঙালির বাংলাদেশ। দেশকে নিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন–'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। আমরা বাংলাদেশকে ভালোবাসি কারণ আমাদের দেশের আছে অপার সম্ভাবনা, প্রকৃতির দান–তাইতো এদেশে আছে আমাদের প্রকৃতি মা

আমাদের জন্য। প্রকৃতি মায়ের দানে আমরা সমৃদ্ধ। সেই অপার সম্ভাবনাময় প্রকৃতি বা অতি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আমাদের অধিকার–আমাদের প্রাপ্য। এই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে একটি মডেল দেশে রূপান্তর করেছেন বর্তমান সরকার।

স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা ও স্মার্ট সরকার আজ আর স্বপ্ন নয়-বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে। আজ আমরা স্মার্টলি সবকিছু করতে পারি কেননা, আমরা প্রযুক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে শিখেছি। প্রকৃতিকে কাজে লাগাতে শিখেছি। প্রকৃতির সম্পদকে শিল্পে রূপ দিতে শিখেছি। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিলেন–থাকবো না আর বদ্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগতটাকে আপন হাতের মুঠোয় পুরে–এই তাৎপর্যময় কথার বাস্তব রূপ আমাদের চোখের সামনে। আমাদের হাতের মুঠোয় পুরো পৃথিবী। ইন্টারনেটের কল্যাণে মুহূর্তের মধ্যেই সমস্ত পৃথিবীর তথ্য উপাত্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সবকিছু আমাদের কাছে আসে। আমাদের মৌলিক অধিকারের মধ্যে বিনোদন বা ট্যুরিজম বা রিক্রিয়েশন যা-ই বলি না কেন তার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। কেননা সারা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর ধনী ব্যক্তিরা ট্যুরিজমের মাধ্যমে বিনোদন, রিক্রিয়েশন, মানসিক উন্নয়নসাধনের জন্য অর্থনীতির একটা বিশেষ অংশ ব্যয় করে বিভিন্ন দর্শনীয়, আকর্ষণীয় স্থান ভ্রমণ করেন। বুদ্ধিদীপ্ত উন্নয়নের সূচক পর্যটন শিল্প। স্বপ্নের চেয়েও আরও বড় সমৃদ্ধ এই বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে শুধু নিজের সুখ খোঁজেননি। খুঁজেছেন কীভাবে এই দেশকে শীর্ষস্থানীয় দেশে রূপান্তরিত করা যায়। তাইতো তিনি ২০২১ সালের রূপকল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ, ২০২৩ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন–২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ বা স্মার্ট বাংলাদেশ। স্মার্ট পর্যটনের মাধ্যমে স্মার্টলি উন্নয়ন সম্ভব। স্মার্ট বাংলাদেশে মানুষের মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ ডলার। দরিদ্র মানুষের সংখ্যা থাকবে না বললেই চলে, ৩ শতাংশের নীচে নেমে যাবে। বাংলাদেশকে উন্নত আয়ের দেশে রূপান্তরিত করা হবে। আর এই সমস্ত বাস্তবায়নের জন্য পর্যটন শিল্পের বিকাশের কোনো বিকল্প নেই।

পর্যটন শিল্প, পর্যটক এবং দর্শনীয় স্থানের যথার্থ পরিচর্যা করা অত্যাবশ্যক, বাধ্যতামূলক অপরিহার্য কাজ। কেননা, পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন করার মতো অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে এই বাংলায়। এই বাংলায় যেসকল সৌন্দর্যের অপরূপ রূপের সমাহার আছে, তা বিশ্ব পর্যটকদের মনকে আনন্দ, প্রফুল্লতায় ভরে দেবে। পর্যটন মানচিত্রে বাংলাদেশ জ্বলজ্বল হয়ে জ্বলবে। এই দেশেই আছে পর্যটন সম্ভাবনার অফুরন্ত সৌন্দর্যের রত্নভান্ডার। বঙ্গবন্ধু পর্যটন শিল্পকে ধারণ করেছিলেন বলেই তিনি নিজের দেশকে সুইজারল্যান্ডের মতো করে সাজানোর ইচ্ছা করেছিলেন। আদর্শ পর্যটনের সকল নিয়ামক, সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমা তিনি বাংলাদেশকে দান করেছেন। বাংলাদেশে আছে হাওর-বাঁওড়-নদ-নদী-খাল-বিল-দ্বীপপুঞ্জ-পাহাড়-ঝরনা-প্রকৃতির-অতি প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় রূপলাবণ্যের সমাহার। এই সমস্ত বৈচিত্র্য বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে পারলেই বাংলাদেশ হবে বিশ্বের অনন্য পর্যটননন্দিত শিল্প উন্নত গন্তব্য। অপরূপ সৌন্দর্যের বিস্ময়কর বাংলাদেশ তখন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে হয়ে উঠবে পর্যটন শিল্পে উন্নত বাংলাদেশ।

বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত ও গবেষকদের মতামত প্রমাণ করে যে, সেই দিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন আমরাই হবো পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ দেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে ভীষণভাবে সচেতন বিধায় আমরা লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবো। আমাদের মেধা, আমাদের চিন্তাচেতনা প্রয়োগ করেই আমরাই হবো সেরা। আমাদের আছে প্রত্যয়–আমাদের আছে সম্ভাবনা–আমাদের আছে প্রাকৃতিক সম্পদ। আমাদের প্রকৃতি মা আমাদের দিকেই সদয় দৃষ্টি রেখেছেন সব সময়। তাইতো আমাদের আছে কক্সবাজারের মতো সুন্দর সমুদ্র সৈকত–যার নান্দনিক প্রকৃত সৌন্দর্য অন্য কোনো দেশে আছে কি না সন্দেহ। আমাদের আছে সেই সমুদ্র সৈকত যেখানে সূর্যের উদয় ও অস্ত উপভোগ করা যায়। আমাদের আছে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ চলন বিল, বিস্তীর্ণ লীলাভূমি, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের আধার। আছে পাহাড় পর্বত ঝরনা–যা প্রকৃতির সঙ্গে নান্দনিকতার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে রূপময়ী হয়ে উঠে। পাহাড়-ফুল পাখি-লতা-পাতা-বন বনানী

সুন্দরবনের নাম শুনলেই অনুমান করা যায় কী অপরূপ রূপ সৌন্দর্য সেথায়। পদ্মা সেতুর সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা পাড়ে গড়ে উঠেছে সেতুকেন্দ্রিক পর্যটন সম্ভাবনা।

চিত্র-২: রূপসী বাংলাদেশের ঋতুভিত্তিক অপরূপ সৌন্দর্য। একই স্থানের তিন ঋতুতে তিনটি অসাধারণ দৃশ্য (অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ)

জাতির বৈশিষ্ট্য হলো শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হলেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অতএব আমাদের কোথায়ও কোনো ভয় নেই। রক্ত দিয়ে জয় করেছি এই দেশ–রক্তের ফোয়ারা থেকেই জন্ম এই সোনালি সূর্যের বাংলাদেশ। এই বাংলাই আমাদের অহংকার–এই বাংলাই আমাদের অর্জন। এই বাংলায় ট্যুরিজমই হবে ঐতিহ্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। এই হোক আমাদের নিত্য দিনের সাধনা–এই হোক আমাদের কামনা বাসনা।

আমাদের দেশ বারো আওলিয়ার দেশ। আমাদের দেশে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রকৃতির অপার দান। প্রকৃতির সম্পদ,পর্যটন গন্তব্য রামসাগর, দুর্গাসাগর, বিদ্যাসুন্দরের দিঘি, খানজাহান আলীর মাজার, দিঘি যেখানে কুমির লালন–পালন করা হয়। দর্শনার্থীদের কথায় কুমির সাড়া দেয়। পর্যটকদের দেওয়া খাবার নিয়ে কুমিররা পর্যটকদের আনন্দ দেয়। আরও আছে সিলেটের জাগ্রত মাজার। কুমিল্লাসহ দেশের নানান জায়গায় পর্যটন শিল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা পর্যটকদের মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেবে।

পর্যটন শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ হবে এক অনন্য দেশ। অতএব এ শিল্পের উন্নয়ন চাইলে সবার আগে পর্যটন শিল্পের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। মনে রাখতে হবে 'আমাদের দেশ আমাদের অহংকার–চেতনায়–সম্পদে–প্রকৃতির অপার দানে'। এ অপরিসীম সম্পদ ও সৌন্দর্যকে যথাযথ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা করতে পারলেই বাংলাদেশ হবে স্মার্ট পর্যটনের দেশ–পর্যটনের একটি নতুন গন্তব্য।

লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক, সমাজচিন্তক ও উন্নয়নকর্মী

সফল থাই পর্যটনের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের পর্যটন খাতের কৌশল নির্ধারণ

মোঃ আব্দুল হাই

যে কোনো দেশের জন্য পর্যটন খাত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি কার্যকর উপায়। প্রতিটি দেশের প্রেক্ষিত বিবেচনায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উৎসও বিভিন্ন রকম। আমাদের বাংলাদেশের জন্য মূলত: বৈদেশিক 'রেমিটেন্স' যা আমাদের প্রবাসী শ্রমিকরা প্রেরণ করে এবং 'রপ্তানি আয়'– এই দুই খাত বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের উৎস। পর্যটন সমৃদ্ধ দেশসমূহ তাদের পর্যটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে বিশাল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। আমাদের পুবের নিকট প্রতিবেশী থাইল্যান্ড পর্যটন শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে তাদের এ অর্জন প্রশংসার দাবিদার। এমনকি সাম্প্রতিক কোভিড সংকট মোকাবেলার পর, দেশটির অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়েছে পর্যটন শিল্পের আয়ের মাধ্যমে।

উল্লেখ্য, থাই অর্থনীতিতে জিডিপির ২০% অবদান আসে পর্যটন খাত হতে। বাংলাদেশও পর্যটনশিল্পে একটি সম্ভাবনাময় দেশ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে 'পর্যটন খাত' শক্তিশালী হলে, বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের আরো একটি শক্তিশালী খাত যুক্ত হবে। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে পর্যটন খাতে জিডিপিতে বর্তমান ৩% অবদানকে পর্যটন-বান্ধব দেশের মতো ১০% উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। সে আলোকে বাংলাদেশের জিডিপিতে পর্যটন খাতের অবদান বৃদ্ধিকল্পে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশের বিদেশস্থ দূতাবাসসমূহ এবং অন্যান্য অংশীজনের একত্রে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কোভিড অতিমারি চলাকালে থাই অর্থনীতির প্রায় ৩% সংকোচন হলেও বর্তমানে তা থেকে উত্তরণ সম্ভব হয়েছে মূলত: থাই পর্যটন খাতে বিদেশি পর্যটক আগমনের ফলে। থাই ক্রীড়া ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুসারে ২০২৩ সালের ৩০শে জুলাই পর্যন্ত সাত মাসে থাইল্যান্ডে আগত পর্যটকের সংখ্যা ১৫.৩২ মিলিয়ন। ২০২২ সালে এ সংখ্যা ছিল ১১.৫ মিলিয়ন। কোভিড অতিমারি পূর্ব ২০১৯ সালে পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৩৯.৮ মিলিয়ন।

এছাড়া, বর্তমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ 'বৈদেশিক মুদ্রা' সংকটে পড়লেও লক্ষ্য করার বিষয় হলো এই যে, থাই অর্থনীতিতে পর্যটন খাতের শক্তিশালী অবদানের কারণে যুদ্ধের ক্ষতিকর প্রভাব এড়াতে সক্ষম হয়েছে।

থাইল্যান্ডে মূলত: অক্টোবর-জানুয়ারি মূল পর্যটন মৌসুম, যখন ইউরোপের পর্যটক থাইল্যান্ডের সমুদ্র সৈকত যথা ফুকেট, কোহ সামুই (দ্বীপ) প্রভৃতি গন্তব্যে উষ্ণ আবহাওয়া উপভোগ করতে আসে। ঐ সময়ে ইউরোপে থাকে শীতকাল। থাইল্যান্ডের উত্তরে চিয়াংমাই-এর পাহাড়ি এলাকায় চীনের নিকটবর্তী ইউনান প্রদেশের পর্যটকেরা আগমন করেন। বিবাহ অনুষ্ঠান বা বিভিন্ন কর্পোরেট অফিসের অবকাশকালীন ছুটি কাটাতে হুয়া হিনসহ প্রভৃতি এলাকায় ধনাঢ্য ভারতীয় পর্যটক আগমন করেন। মালয় মুসলিম অধ্যুষিত দক্ষিণ থাইল্যান্ডে মধ্যপ্রাচ্যের পর্যটক আগমন করে থাকেন। থাইল্যান্ডের পার্শ্ববর্তী মালয়েশিয়া হতেও মালয় অধ্যুষিত Southern Thailand Province যথা ইয়ালা, পাতানি প্রভৃতি প্রদেশে নৌকাযোগে এবং বাসযোগে প্রতিবেশী পর্যটক আগমন করেন। সেই আলোকে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের গৌহাটি, শিলচর প্রভৃতি এলাকার পর্যটকদের সহজে সিলেটে আগমনের সুযোগ রাখা যেতে পারে। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে। রংপুরের অপরদিকে লোয়ার আসাম, ভুটান প্রভৃতি এলাকার পর্যটক সহজে ভিসা সংগ্রহ করতে সক্ষম হলে তারাও রংপুর রাজশাহী-দিনাজপুর এলাকায় আম-কাঁঠাল ফলের মৌসুমে আসতে পারে।

রংপুর, দিনাজপুর এলাকার পুরোনো মন্দির ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও সংস্কৃতি, যেমন গান-নাচ তাদের আকর্ষণ করতে পারে।

সরাসরি বিমান যোগাযোগ অন্যতম প্রভাবক বা Catalyst হিসেবে পর্যটক আগমনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। থাইল্যান্ডের ব্যাংকক ছাড়াও উত্তরে চিয়াংমাই ও দক্ষিণে ফুকেটে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে যেখানে ইউরোপ, চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, ভারত, মধ্যপ্রাচ্য, তুর্কি প্রভৃতি গন্তব্য হতে বিমানযোগে সরাসরি পর্যটক আগমনের সুযোগ রয়েছে । আমাদের বীচনগরী কক্সবাজার, চা-বাগান সমৃদ্ধ সিলেট, বৌদ্ধ পুরা স্থাপত্যের কেন্দ্র নওগাঁও পাহাড়পুর প্রভৃতির সঙ্গে সরাসরি বিমানযোগে পর্যটক আগমনের ব্যবস্থা রাখা অত্যাবশ্যক।

ট্যুরিস্ট-বান্ধব ভিসা নীতি, ট্যুরিস্ট এলাকায় ভিসা নবায়নের সুযোগ রেখে ইমগ্রেশন অফিস, তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, পর্যটন খাতের প্রয়োজনীয় লোকবল যথা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, ট্যুরিস্ট অঞ্চল বা জেলা ভিত্তিক হোটেলস এ্যাসোসিয়েশন, ট্যুর অপারেটরস এ্যাসোসিয়েশন, ক্যাটারিং এ্যাসোসিয়েশন, বিভিন্ন মানবসম্পদ তৈরির সংগঠন গড়ে তোলাসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে। থাইল্যান্ডের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে এ ধরনের সংগঠন রয়েছে এবং উক্ত প্রদেশের গভর্নরের দপ্তর তাদের কার্যক্রম সমন্বয় করে থাকে। আমাদের ক্ষেত্রে ট্যুরিস্ট স্পটভিত্তিক জেলা প্রশাসকের কার্যালয় স্থানীয় পর্যটন অফিসের সহায়তায় পর্যটকদের চাহিদা নিরূপণ ও তাদের দেখভালের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এক্ষেত্রে, প্রতি তিন মাস অন্তর অঞ্চল ভিত্তিক পর্যটকের পরিসংখ্যান প্রকাশ করা যেতে পারে যা আমাদের পর্যটনবান্ধব কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিমাপে সহায়ক হবে।

বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক রন্ধন প্রণালি ও পরিবেশনা, ট্যুর গাইড পরিষেবা ইত্যাদি গড়ে তোলার দিকে নির্দিষ্টভাবে আমাদের নজর দেওয়া যেতে পারে। আজকাল ফুড ব্লগ বা ট্রাভেল ব্লক অনলাইনে দেখা যায়। এ সকল প্লাটফর্ম পর্যটন খাত বিকাশে সহায়ক হতে পারে। সংগঠিত ট্যুর অপারেটর গঠিত হলে তাদের মাধ্যমে পর্যটক ব্যবস্থাপনায় আমাদের পর্যটন খাতে প্রবৃদ্ধি আসতে পারে। নিবন্ধিত ট্যুর অপারেটরের নিমন্ত্রণের ভিত্তিতে দূতাবাস হতে ভিসা প্রদানের ব্যবস্থা করা হলে পর্যটক আগমন বৃদ্ধি পাবে। সেক্ষেত্রে পর্যটকদের ভ্রমণ স্বাচ্ছন্দ্যময় হতে পারে।

মেডিকেল ট্যুরিজমও আমাদের পর্যটক আকর্ষণের উপায় হতে পারে। আমাদের শিশু পরিচর্যা, মাতৃস্বাস্থ্য ও প্রজনন, অর্থোপেডিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভালো মানের চিকিৎসক রয়েছে। আমার দুবাই কর্মকালে এ ধরনের আরব ও আফ্রিকান ভিসা প্রার্থীদের ভিসা প্রদানের অভিজ্ঞতা রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের গৌহাটি, শিলচর, মনিপুর প্রভৃতি এলাকার মানুষের ভালো চিকিৎসা পাবার সুযোগ তৈরি করতে পারে আমাদের সিলেট, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চল।

থাইল্যান্ড মূলত: পাঁচটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে পর্যটন খাতের বিকাশে সমর্থ হয়েছে। তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী পর্যটন, হাইকিং, ট্রেকিং এবং ডাইভিংয়ের মতো আকর্ষণসমৃদ্ধ গন্তব্য, উষ্ণ আতিথেয়তা, উন্নত অবকাঠামো ও নিরাপত্তা। প্রকাশিতব্য পর্যটন কৌশলপত্র প্রণয়নে থাই অভিজ্ঞতার সহায়তা বিশেষ অবদান রাখতে পারে। মূলত: পর্যটন খাত বিকাশের ক্ষেত্রে বহুমুখী প্রজ্ঞা ও কৌশলের সমন্বয় একান্ত অপরিহার্য। পর্যটন খাত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে সেবা খাতের প্রসার ও কর্মসংস্থানে ব্যাপক অবদান রাখবে। গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের যোগাযোগ অবকাঠামোয় যে উন্নতি ঘটেছে তার সুফল পেতে পর্যটন খাতে বিনিয়োগের এখনই সময়।

লেখক : থাইল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত

পর্যটনের তথ্য উপাত্তের সংকট

জাবেদ আহমেদ

যে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে তথ্য-উপাত্তের অপরিহার্যতার বিষয়টি অনস্বীকার্য। এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময় নিয়ে এবং কতকগুলো নিয়ম মেনে রচনা করা হয় পরিকল্পনা দলিল। এ দলিল বাস্তবায়নের জন্য আবার সাজানো হয় কর্মপরিকল্পনা। কর্মপরিকল্পনার সুষ্ঠু ও সময়োচিত বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিশ্চিত হয় উন্নয়ন কর্মকান্ড। উপকৃত হয় সমাজ। ঘুরতে থাকে অর্থনীতির চাকা। তবে তথ্য-উপাত্ত হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়নের কাঁচামাল। এ কাঁচামালের জোগান যদি সঠিকভাবে নিশ্চিত করা যায় তবেই সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব।

অতি সম্প্রতি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শেষ করেছে। IPE Global Ltd. নামক একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মহাপরিকল্পনাটি প্রণয়নের কাজে যুক্ত ছিল। দেশি-বিদেশি একাধিক পর্যটন বিশেষজ্ঞ কাজটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কোভিড-১৯-এর কারণে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়। ১৮ মাসের কাজ শেষ করতে প্রায় ৪ বছর সময় লেগে যায়।

মহাপরিকল্পনা প্রণয়নকালে সবচেয়ে বড় বাঁধা ছিল প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের অপর্যাপ্ততা। আমাদের দেশে পর্যটন খাতের তথ্য-উপাত্ত আহরণ এবং সংরক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ব্যবস্থা এখনও গড়ে উঠেনি। বিবিএস বা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় একটি ট্যুরিজম স্যাটেলাইট একাউন্ট তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে সেটিও কোভিড কালে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোভিডকালে পর্যটনের গতি/প্রকৃতি স্বাভাবিক ছিল না বরং আর্ন্তজাতিক পর্যটন একরকম থমকে গিয়েছিল। দেশি পর্যটনও থমকেই ছিল। এ রকম পরিস্থিতিতে পর্যটনের হিসাব নিকাশ ট্যুরিজম স্যাটেলাইট একাউন্ট যেভাবে প্রদর্শিত হয়েছে তার উপরেও খুব ভরসা রাখা যায় না। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কেউই পর্যটন বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণে সমৃদ্ধ নয়। এরকম পরিস্থিতিতে পর্যটন সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তের হাহাকার চোখে পড়ার মত। তারপরেও মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য তথ্য-উপাত্ত তো লাগবেই। পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মী/গবেষকগণ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য কয়েকটি জানা পদ্ধতি ব্যবহার করেন যেমন, Secondary Source অর্থাৎ ইতোপূর্বে সম্পাদিত গবেষণা কর্ম থেকে তথ্য আহরণ। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ অর্থাৎ সরাসরি জরিপ কার্যের মাধ্যমে উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত আহরণ এবং Focus Group আলোচনার মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ। এছাড়া Tourist Police দপ্তরে রক্ষিত পর্যটক গমনাগমনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। Tourist Police তাদের দায়িত্বের মধ্যে থাকা পর্যটন কেন্দ্রের দৈনন্দিন পর্যটকের তথ্য সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ করে থাকে। অবশ্যই এই তথ্য মাথা গণনা করে নয়। অনুমানের ভিত্তিতে এ সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। যেটিকে মোটামুটি সঠিক বলে ধরে নেওয়া যায়। পর্যটক গমনাগমনের হিসাব নিকাশ সবচেয়ে ভালভাবে পাওয়া গেছে দেশের জাদুঘরগুলো থেকে এবং থিম পার্কগুলো থেকে। কারণ এ প্রতিষ্ঠানগুলোর টিকেট বিক্রয়ের হিসাব কষলেই পর্যটকের সংখ্যা বের করা যায় সহজেই। আন্তর্জাতিক পর্যটক আগমণের তথ্য এসবি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ)-এর নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এসবি এ তথ্য যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে থাকে দীর্ঘদিন থেকে। এ উৎস ছাড়া হোটেল, মোটেল ও রিসোর্ট থেকেও এ তথ্য সংগ্রহ করা যায় তবে তা কষ্টসাধ্য।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কোভিড উত্তরকালে দেশের পর্যটন শিল্পে কোভিডের অভিঘাত সম্পর্কিত ক্ষয়ক্ষতি

নিরূপণের জন্য বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-কর্তৃক একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ইতিহাসে এটিই সম্ভবত প্রথম গবেষণা পত্র। এ গবেষণার ভিত্তিতে পর্যটন খাতে কোভিডের প্রভাব নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নকালে এ গবেষণা কর্মটি থেকেও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক সন্নিবেশ করা হয়েছে। তথ্য-উপাত্তের হাহাকার সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় কোভিড পরবর্তী সময়ে। যেসব সময় বিভিন্ন দেশ তাদের পর্যটন খাতে কতটা ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার বিস্তারিত পরিসংখ্যান প্রস্তুত করেছে। সে সময় বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির কোনো পরিসংখ্যান তৈরির ক্ষেত্রে বিআইডিএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের গবেষণা পত্রটিই ছিল প্রথম উদ্যোগ। বিআইডিএস কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণাপত্রে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের কোভিডের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। বিআইডিএস এ গবেষণাকর্মটি যথেষ্ট পেশাদারিত্বের সাথেই করেছে বলে মনে হয়। এ তথ্য উপাত্তগুলো ভবিষ্যতে যে কোনো গবেষণাকর্মে কাজে লাগানো যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

পর্যটন পরিকল্পনায় কি কি তথ্যের প্রয়োজন সেটি একটু জেনে নেওয়া যাক। মোটা দাগে বলা যায় একটি দেশের বছরভিত্তিক অভ্যন্তরীণ পর্যটকের সংখ্যা, বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা, দেশের অভ্যন্তরে হোটেল-মোটেলের সঠিক পরিসংখ্যান। পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগের পরিসংখ্যান, এ শিল্পে প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত জনবলের সংখ্যা। মোট দেশে উৎপাদন বা জিডিপিতে পর্যটন খাতের অবদান। ট্যুর অপারেটর বা ট্যুর গাইডে সঠিক পরিসংখ্যান ইত্যাদিসহ খুঁটিনাটি আরও অনেক তথ্যের প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে এসকল তথ্য সংরক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা খুবই জরুরী।

পৃথিবীতে পর্যটন হচ্ছে সবচেয়ে বড় শিল্প এবং সবচেয়ে অধিক সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান এ শিল্পের মাধ্যমে ২য়। WTTC বা (World Travel and Tourism Council) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পর্যটন শিল্পে তথ্য উপাত্তের অভাব ছিল। WTTC প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই বিশ্ব সংস্থাটি পর্যটন শিল্পের সমন্বিত তথ্য উপাত্ত প্রকাশ করায় বিশ্ব পরিমন্ডলে পর্যটন সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তের খুব একটা অভাব দেখা যায় না। WTTC তাদের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে,

- ২০২২ সালে বিশ্ব জিডিপিতে পর্যটন শিল্পের অবদান হচ্ছে ৭.৬% যা কিনা ২০২১ সালের তুলনায় ২২% বেশি এবং ২০১৯ সালের তুলনায় ২৩% কম।
- পর্যটন শিল্পে ২০২২ সালে ২২ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি হয়েছে যা ২০২১ সালের তুলনায় ৭.৯% বেশি এবং ২০১৯ সালের তুলনায় ১১.৪% কম।
- ২০২২ সালে অভ্যন্তরীণ পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে ২০.৪% যা ২০১৯-এর তুলনায় মাত্র ১৪.১% কম।
- ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক পর্যটনের সংখ্যা বেড়েছে ৮১.৯% যা এখন ২০১৯ সালের তুলনায় ৪০.৪ % কম।

এ জাতীয় তথ্য উপাত্ত পর্যটন পরিকল্পনা প্রণয়নে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সংস্থাটি তার সদস্য রাষ্ট্রসমূহের পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত তৈরি এবং সংরক্ষণ করে থাকে। আমাদের ট্যুরিজম মাস্টারপ্লান প্রস্তুতকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে WTTC-এর তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও আরও একটি সংস্থা PATA (Pacific Asia Travel Association) নামে পরিচিত। সেটিও পর্যটন সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত নিয়ে কাজ করে থাকে। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থাটি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যা বিশ্বে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে Catalyst হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ WTTC এবং PATA দুটো সংস্থারই সদস্য। প্রতি বছর নির্দিষ্ট হারে চাঁদা প্রদান করতে হয় বাংলাদেশকে। PATA তাদের সদস্য রাষ্ট্রের পর্যটন সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত তৈরি ও সংরক্ষণ করে থাকে। গবেষকগণ এ উৎস থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারেন। পর্যটন সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত তৈরি ও সংরক্ষণে বিশ্ব সংস্থার পাশাপাশি সদস্য রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজেদের মতো করে প্রয়োজনীয়

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

আমাদের প্রতিবেশী ভারত কিংবা নেপালও পর্যটন তথ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরি করতে পেরেছে। মালদ্বীপ বা শ্রীলঙ্কা বা ভুটান এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পর্যটন সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণে বাংলাদেশ তবে এ বিষয়টিকে অবশ্যই আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় আছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একমাত্র সংস্থা যা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য যে সকল তথ্য উপাত্তের প্রয়োজন তা নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে। প্রতিবছর তা প্রকাশও করে থাকে। আমাদের দেশে বিবিএস-এর তথ্যকেই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। পর্যটন সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তের জন্য আমাদেরকে বিবিএস-এর উপরেই নির্ভর করতে হবে। বিবিএস'কে উপলব্ধি করতে হবে বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের অযুত সম্ভাবনা রয়েছে। এ খাতের উন্নয়ন করা গেলে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যাবে। খুব সহজেই অর্জন করা যাবে বৈদেশিক মুদ্রা। দেশের অর্থনীতিকে বদলে ফেলতে পারে এ দেশের পর্যটন খাত-কাজেই বিবিএস'কে পর্যটন খাতের তথ্য ব্যবস্থাপনার উপরে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের দপ্তরে পর্যটনের জন্য বিশেষ শাখা খুলে বছর জুড়ে পর্যটন সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। বাংলাদেশের তথ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা এ প্রতিষ্ঠানটিকে অধিকতর শক্তিশালী করা গেলে পর্যটন খাতের জন্য উপাত্তের বিদ্যমান খরা কাটতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

পর্যটন জগতে বাংলাদেশকে এখনো Hidden Gem বা Unexplored Destination হিসেবেই দেখা হয়। এ দেশের পর্যটন সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তের একটি Authentic Source সৃষ্টি করা গেলে খাতটির উন্নয়নের সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। সঠিক তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে পর্যটন শিল্পের বেসরকারি বিনিয়োগকারীগণ এদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হবে। বেসরকারি পুঁজি এ শিল্পে বিনিয়োগ না করা গেলে আমরা বাংলাদেশের পর্যটনকে ঘিরে যে স্বপ্ন দেখি তা বাস্তবায়ন করা যাবে না।

লেখক : সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

পর্যটন উন্নয়নে করণীয়

সৈয়দ হাবিব আলী

পর্যটন উন্নয়নে সরকারি খাতের ভূমিকা

বাংলাদেশ সরকার দেশের পর্যটনের উন্নয়ন ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পর্যটনকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের একটি সম্ভাব্য চালক হিসেবে দেখা হয়। পর্যটন উন্নয়নে সরকারের ভূমিকার মধ্যে রয়েছে:

১. নীতি প্রণয়ন: সরকার পর্যটন খাতের উন্নয়নের জন্য নীতি ও কৌশল প্রণয়ন করে। এই নীতিগুলি সবসময় টেকসই পর্যটনের প্রচার, অবকাঠামোর উন্নতি এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে।

২. অবকাঠামো উন্নয়ন: সরকার অবকাঠামো প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করে যেমন বিমানবন্দর, রাস্তা সহজীকরণ, পরিবহন নেটওয়ার্ক ও আবাসনের সুবিধা। পর্যটকদের জন্য সামগ্রিক ভ্রমণের ব্যবস্থা সুবিধা সম্বলিত অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৩. প্রচার ও বিপণন: সরকার দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় পর্যটকদের কাছে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক এবং প্রাকৃতিক আকর্ষণ প্রদর্শনের জন্য প্রচারমূলক প্রচারণা চালায়। এই প্রচারাভিযানের মধ্যে ভ্রমণ মেলায় অংশগ্রহণ করা, রোডশোর আয়োজন করা এবং ডিজিটাল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মের উপকারিতা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

৪. নিয়ন্ত্রণ এবং লাইসেন্সিং: সরকার পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন খাতের জন্য প্রবিধান এবং লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট করে, যার মধ্যে আবাসন ব্যবস্থা, ট্রাভেল এজেন্সি এবং ট্যুর অপারেটর, গাইড ইত্যাদি রয়েছে। এই ব্যবস্থা পর্যটকদের জন্য মান নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

৫. বিনিয়োগের সুবিধা প্রদান: সরকার প্রণোদনা প্রদান, অংশীদারিত্বের সুবিধা প্রদান এবং একটি অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করে পর্যটন শিল্পে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে।

৬. সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ: সরকার পর্যটনের মূল্য ধারণ করে এমন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য স্থান এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য কাজ করে। এর মধ্যে পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা, টেকসই পর্যটন অনুশীলন নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে জড়িত করা উল্লেখযোগ্য।

৭. পর্যটন প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি: সরকার পর্যটন খাতে কর্মরত ব্যক্তিদের যেমন গাইড, আতিথেয়তা কর্মী এবং কারিগরদের দক্ষতা উন্নত করার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রদান করতে পারে। এটি পর্যটকদেরকে প্রদত্ত পরিষেবার মান উন্নত করতে সহায়তা করে।

৮. পর্যটন গবেষণা এবং তথ্য সংগ্রহ: সরকার পর্যটন শিল্প প্রবণতা, দর্শনার্থী জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক প্রভাব নিরীক্ষণের জন্য পর্যটন-সম্পর্কিত ডেটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে। এই তথ্য নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণে সাহায্য করে।

৯. ইকোট্যুরিজম এবং টেকসই উন্নয়ন: সরকার নেতিবাচক পরিবেশগত এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবগুলি হ্রাস করার জন্য ইকোট্যুরিজম এবং টেকসই পর্যটন অনুশীলনের প্রচারের দিকে মনোনিবেশ করতে পারে। যেখানে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সুযোগ সুবিধাগুলি সর্বাধিক অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

১০. ভিসা এবং অভিবাসন নীতি: সরকারের ভিসা এবং অভিবাসন নীতিগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে পর্যটনকে প্রভাবিত করতে পারে। সুবিন্যস্ত ভিসা প্রক্রিয়া এবং অনুকূল অভিবাসন নীতি দেশের জন্য অধিক পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করতে পারে।

পর্যটন উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা

যে কোনো দেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও প্রবৃদ্ধিতে বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেসরকারি খাতের উদ্যোগগুলি বিনিয়োগ, উদ্ভাবন, দক্ষতা এবং বাজার ব্যবস্থাকে উন্নত করে যা সরকারের প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যা সাধারণত পর্যটন উন্নয়নে বেসরকারি খাত পালন করে:

১. বিনিয়োগ: বেসরকারি কোম্পানিগুলো আবাসনখাত, খাদ্য ও পানীয়, পরিবহন এবং বিনোদনমূলক সুবিধা সহ পর্যটন খাতের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে। তাদের আর্থিক অবদান পর্যটনশিল্পের অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রসারিত করতে সাহায্য করে।

২. পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়ন: বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ প্রায়ই আধুনিক এবং উচ্চ-মানের পর্যটন অবকাঠামো যেমন বিলাসবহুল হোটেল, পরিবেশ-বান্ধব রিসোর্ট, অত্যাধুনিক পরিবহন পরিষেবা, আকাশ ভ্রমণ, সমুদ্র ভ্রমণ এবং বিনোদন সুবিধাগুলির বিকাশে সহায়তা করে।

৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টি: পর্যটন শিল্প কর্মসংস্থানের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। বেসরকারি উদ্যোগগুলি আতিথেয়তা, পরিবহন, খাদ্য ও পানীয় এবং বিনোদনসহ বিস্তৃত খাতে কর্মসংস্থান তৈরি করে, যার ফলে স্থানীয় অর্থনীতি মজবুত ও সাফল্যমণ্ডিত হয়।

৪. উদ্ভাবন এবং গুণমান: বেসরকারি সংস্থাগুলি পর্যটকদের কাছে উচ্চ-মানের পরিষেবা এবং অভিজ্ঞতা প্রদানের দিকে মনোনিবেশ করে। তারা প্রায়ই নতুন উদ্ভাবন প্রবর্তন করে যা সামগ্রিক পর্যটন অভিজ্ঞতা বাড়াতে সাহায্য করে, যেমন অনন্য থাকার ব্যবস্থা, দুঃসাহসিক কার্যকলাপ, শিহরণমূলক পর্যটন এবং ব্যতিক্রমী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৫. প্রচার ও বিপণন: ব্যক্তিগত ব্যবসায় পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রচারমূলক কার্যক্রমে এবং বিপণনে নিযুক্ত হয়। তারা গন্তব্য এবং তাদের আকর্ষণীয় মূল্য সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ডিজিটাল মার্কেটিং, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অংশীদারিত্বসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে।

৬. অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যকরণ: ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলি বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা এবং ক্রিয়াকলাপ প্রবর্তন করে যা বিভিন্ন মানসিকতার পর্যটকদের চাহিদা পূরণ করে। এর মধ্যে রোমাঞ্চকর পর্যটন, সাংস্কৃতিক পর্যটন, স্বাস্থ চর্চা, রন্ধনসম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

৭. উদ্যোক্তা: পর্যটন শিল্প উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ প্রদান করে, যা ব্যক্তিদের তাদের নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে এবং পরিচালনা করতে দেয়, যেমন বুটিক হোটেল, স্থানীয় অপারেটর এবং কারুশিল্পের দোকান ইত্যাদি।

৮. প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন: বেসরকারি খাত প্রায়ই গ্রাহক পরিষেবা উন্নত করতে এবং সামগ্রিক অতিথিদের আকর্ষণ বাড়াতে তার কর্মীবাহিনীর জন্য প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রদান করে।

৯. সম্প্রদায়ের নিযুক্তি: ব্যক্তিগত ব্যবসাগুলি পারস্পরিকভাবে উপকারী অংশীদারিত্ব তৈরি করতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করে। এর মধ্যে স্থানীয় পণ্য প্রাপ্তি, স্থানীয় কর্মীদের নিয়োগ এবং সম্প্রদায় উন্নয়ন প্রকল্পে অবদান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

১০. প্রতিযোগিতা এবং বাজারের বৃদ্ধি: ব্যক্তিগত ব্যবসার মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা উদ্ভাবন এবং পরিষেবার মানের ক্রমাগত উন্নতি চালায়, যা পর্যটক এবং সামগ্রিক শিল্প উভয়কেই উপকৃত করে।

১১. টেকসই উদ্যোগ: অনেক ব্যক্তিগত ব্যবসা টেকসই পর্যটনের গুরুত্বকে ক্রমবর্ধমানভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

তারা পরিবেশ বান্ধব অনুশীলন বাস্তবায়ন করে, সংরক্ষণ প্রচেষ্টায় অবদান রাখে এবং দায়িত্বশীল পর্যটন উন্নয়নে সহায়তা করে।

১২. বৈদেশিক মুদ্রা আয়: সফল বেসরকারি খাতের উদ্যোগগুলি আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকৃষ্ট করে, যার ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের পর্যটন উন্নয়নে সম্ভাব্য বাধাগুলি কী?

বাংলাদেশে পর্যটন উন্নয়নে বেশ কিছু বাধা রয়েছে। এসব বাধা পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে:

১. অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ: অপর্যাপ্ত পরিবহন নেটওয়ার্ক, দুর্বলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা রাস্তা, প্রত্যন্ত অঞ্চলে সীমিত সংযোগ, এবং অপর্যাপ্ত পর্যটন আবাসন ভ্রমণকারীদের দেশের নির্দিষ্ট অঞ্চলে যেতে নিরুৎসাহিত করতে পারে।

২. বিনিয়োগের অভাব: পর্যটন অবকাঠামো এবং পরিষেবাগুলিতে সীমিত বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের ফলে উচ্চ-মানের আবাসন, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং পর্যটনের বিভিন্ন আকর্ষণের অভাব হতে পারে।

৩. নিরাপত্তা উদ্বেগ: নিরাপত্তা বিষয়ক ধারণা, বাস্তব এবং অতিরঞ্জিত উভয়ই, পর্যটকদের নির্দিষ্ট এলাকা পরিদর্শন থেকে বিরত রাখতে পারে, বিশেষ করে যদি রাজনৈতিক অস্থিরতা, নাগরিক অস্থিরতা বা অপরাধের তথ্য প্রচারিত হয়।

৪. সীমিত প্রচার এবং বিপণন: অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে অপর্যাপ্ত প্রচার এবং বিপণন প্রচেষ্টা বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনা এবং যে আকর্ষণগুলির আকর্ষণীয় মূল্য ছাড় করে সে সম্পর্কে সচেতনতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

৫. সাংস্কৃতিক এবং ভাষার বাধা: ভাষার বাধা এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য বিদেশি পর্যটকদের জন্য পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করা কঠিন করে তুলতে পারে।

৬. পরিবেশগত অবনতি: দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশগত অবনতি প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক আকর্ষণের দূষণ গন্তব্যের সামগ্রিক অবদানের উপর নেতিবাচক প্রভাব তৈরী করে।

৭. দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব: পর্যটন শিল্পে যারা কাজ করছেন, যেমন গাইড এবং আতিথেয়তা কর্মীদের জন্য অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন সর্বোপরি করা না হলে পরিষেবার গুণমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৮. টেকসই পর্যটনের জন্য অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো: টেকসই পর্যটন অবকাঠামো এবং অনুশীলনের অভাব প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষতি করতে পারে, যার ফলে দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

৯. পর্যটনের ঋতুগত প্রকৃতি: বাংলাদেশের পর্যটন খাত এলাকাভিত্তিক মৌসুমী। কিছু গন্তব্য বছরের নির্দিষ্ট সময়ে পর্যটকদের প্রচুর আগমনের সম্মুখীন হয় এবং অন্যান্য সময়কালে অপরিবর্তিত থাকে।

১০. সীমিত আকাশ পরিবহন: প্রধান পর্যটন বাজার থেকে সীমিত সরাসরি আন্তর্জাতিক আকাশ পরিবহন বাংলাদেশে ভ্রমণকে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের জন্য আরও কষ্টকর এবং সময়সাপেক্ষ করে তুলতে পারে।

১১. স্বাস্থ্য এবং পয়ঃনিষ্কাশন উদ্বেগ: স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কিত সমস্যা, বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্তি এবং সঠিক পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাসহ, পর্যটকদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

১২. গন্তব্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অভাব: ব্যাপক গন্তব্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অনুপস্থিতির ফলে এলোমেলো উন্নয়ন, যানজট এবং পর্যটন স্থানগুলির অপর্যাপ্ত সংরক্ষণ হতে পারে।

১৩. নেতিবাচক গণমাধ্যম প্রচার: রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়গুলির নেতিবাচক গণমাধ্যম প্রচার ভ্রমণের

গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশের নিরাপত্তা এবং আকর্ষণীয়তা সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি করতে পারে।

১৪. পর্যটন বীমা: পর্যটকদের প্রমাণের নিরাপত্তার জন্য সহজ ও নিশ্চিন্তে ভ্রমণ বীমার অভাব পর্যটকদেরকে অনুউৎসাহিত করে।

এটা লক্ষণীয় যে এই বাধাগুলি অপ্রতিরোধ্য নয়। একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন অনেক দেশ সরকার, বেসরকারি খাত এবং অন্যান্য খাতসংশ্লিষ্টদের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে, পরিকাঠামো, পরিষেবা, বিপণন এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো উন্নত করার লক্ষ্যযুক্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সফলভাবে তাদের মোকাবেলা করেছে।

পরিশেষে লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা পর্যটন উন্নয়নের জন্য উপকারী হলেও, একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং টেকসই পদ্ধতি নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারি খাত এবং সরকারের মধ্যে সহযোগিতা প্রায়শই প্রয়োজন হয়। বৃহত্তর জাতীয় পর্যটন লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি বিধি, নীতি এবং অবকাঠামোগত সহায়তা ব্যক্তিগত ব্যবসার উন্নতির জন্য একটি সক্ষম পরিবেশ তৈরি করতে পারে যা সামগ্রিক পর্যটন ব্যবসাকে নিশ্চিত করে।

লেখক : চেয়ারম্যান, ট্যুরিজম ডেভেলপার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টিডাব)

পর্যটনে সবুজ বিনিয়োগ অনিবার্য

মোখলেছুর রহমান

প্রসঙ্গকথা

জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা পর্যটনের পুনরুদ্ধার এবং ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগকে অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করছে যা মানুষ, পৃথিবী ও সমৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপনকে সামনে রেখে এই সংস্থা বলছে যে, এখন শুধু প্রথাগত বিনিয়োগ নয় যা অর্থনৈতিক প্রচার ও তথাকথিত প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতাকে এগিয়ে নিবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, সরকার, বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকারীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি নতুন পর্যটন বিনিয়োগ কৌশল উদ্ভাবনের তাগিদ দিয়েছে এই সংস্থা। বিশেষত পর্যটন শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ এই পৃথিবীর টেকসই অবকাঠামো ও সবুজ রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করবে বলে তাদের বিশ্বাস। তাহলেই উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও উদ্যোক্তার মাধ্যমে সত্যিকারের সমৃদ্ধি আসবে। সংস্থাটি টেকসই পর্যটনের জন্য টেকসই বিনিয়োগ প্রয়োজনকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। কারণ মহামারিতে আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত পতন ঘটায় এই খাতের সকল স্তরে সংকট বিরাজমান। সেই সাথে পর্যটনের জলবায়ু কর্ম প্রচেষ্টাও ব্যাহত হচ্ছে।

পর্যটন এখন অনেক জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণের উপাদান ও মর্যাদার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রচুর বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এই খাতে। তবে স্থানভিত্তিক চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে পর্যটনের মাধ্যমে উন্নয়নকে এখনো সুনির্দিষ্টকরণ সম্ভব হয়নি। সমাজ ও সংস্কৃতিতে পর্যটনের অবিচ্ছেদ্য অবস্থান ক্রমেই নিবিড় থেকে নিবিড়তর হচ্ছে। জনবল চাহিদা নিরূপণ, জনবল তৈরি ও নিয়োগ পরিকল্পনা ইত্যাদিতে অনেক বেশি মনযোগী হতে হবে।

চিরায়ত বিনিয়োগের উপসর্গ

চিরায়ত বিনিয়োগের অর্থ হলো কেবল উৎপাদন ও মুনাফার উদ্দেশ্যে যে কোনো ধরনের পণ্য ও সেবা উৎপাদনে বিনিয়োগ। এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, উৎপাদন বাড়ে, মুনাফা বাড়ে এমনকি জিডিপিতেও অবদান রাখে। তবে জীবনধারা, মানবিক মূল্যবোধ ও পরিবেশ ইত্যাদিকে তেমন একটা বিবেচনায় নেওয়া হয় না। এমনকি উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের স্বার্থ ও চাহিদার খুব একটা গুরুত্ব পায় না। বিশ্বায়নের ধারণা থেকে কর্পোরেট মতবাদে গড়ে উঠে এইসব উৎপাদন, সেবা কিংবা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানাদি। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ যেমন খাদ্য, পোশাক, আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির সরবরাহ ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয় এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। গত পঞ্চাশ বছরে এই চিত্র এখন আমাদের কাছে বহুভাবে প্রমাণিত।

গত শতকের শেষ দশক থেকে এদেশে পর্যটন খাতের দৃশ্যমান যাত্রা শুরু করে। অন্য সকল খাতের মতো পর্যটনও কর্পোরেট সংস্কৃতির হাত ধরে জন্ম নিয়েছে। তাই পর্যটনে অন্যখাতের মতো চিরায়ত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ হচ্ছে। ফলে পর্যটনে উলম্ব উন্নয়ন হচ্ছে, অনুভূমিক নয়। তাত্ত্বিকভাবে বলা হলেও বাস্তবে এইখাতের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংশ্লিষ্টতা কম, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধানকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

পর্যটনে বিশ্বায়নের ধারণা প্রবর্তন করতে হবে। এই ধারণা মতে, পর্যটন বাণিজ্যে কেবল উৎপাদন ও সর্বোচ্চ মুনাফা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথ সৃষ্টি করতে হবে। এইখাতে একমাত্র আর্থিক উন্নয়ন ধারণাকে পরিহার করে মানুষের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ, যৌথ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কেবল মুদ্রা দ্বারা নির্ণীত উন্নয়ন পর্যটনের জন্য মোটেও কাম্য নয়। কারণ সকল উন্নয়ন মানুষের জীবনধারাকে সহজতর, আনন্দময় ও টেকসই করার

প্রয়াসেই করা হয়ে থাকে। তথাকথিত বিনিয়োগ আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবয়বকে ভেঙে দিচ্ছে। সার্বিক সক্ষমতা ও ইচ্ছার অভাব মানুষের মধ্যে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে।

উন্নয়নের আধুনিক ধারণা

একটি স্থানে কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেই তাকে প্রকৃত উন্নয়ন বলা যাবে না। স্থানীয় মানুষের জৈবিক, মানসিক ও আত্মিক চাহিদা পূরণের জন্য পণ্য ও সেবা উৎপাদন করতে হবে। উৎপাদন ও উন্নয়নের বিনিময়ে কোনোভাবেই বসবাস ও সামাজিক ক্ষেত্রে বাধা, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করা যাবে না। যন্ত্রের যন্ত্রণা ও মুনাফার আধিপত্য কোনোভাবেই কাম্য হতে পারবে না। চাহিদা বিবেচনা করে প্রাকৃতিক মূলধনসমূহের টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন করতে হবে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক মূলধনের যথেষ্ট পরিমাণে যত্ন করতে হবে। স্থানীয় মানুষের সর্বোচ্চ পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। উৎপাদিত পণ্য ও সেবা স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের পর অতিরিক্তটুকু অন্যত্র বিক্রয় করতে হবে। স্থানীয় চাহিদা পূরণের পর অতিরিক্ত পণ্য বিক্রয়ের অর্থ দিয়ে চাহিদাপণ্য আমদানি করতে হবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে ব্যষ্টিক অর্থনীতির বুনিয়াদ তৈরি হবে। স্থানীয় ও সমবায়ভিত্তিক গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নের এই নতুন ধারণাকে সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করতে পারে। অন্যথায় ব্যালেন্স অব ট্রেড ও ব্যালেন্স অব পেমেন্ট উভয় ক্ষেত্রেই ভারসাম্য নষ্ট হবে, যা মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়বে।

মানবিক ও স্থিতিস্থাপক বিনিয়োগ

মানবিক এবং স্থিতিস্থাপক বিনিয়োগ হলো এমনভাবে বিনিয়োগ করা, যা জনগোষ্ঠীর চাহিদা নির্ণয় ও পূরণের মাধ্যমে উপকার সৃষ্টি করে এবং মানবিক প্রেক্ষাপটে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে। এই ধরনের বিনিয়োগ যন্ত্রণা বিবর্জিত, নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও মর্যাদাকর জীবনধারা গড়ে তুলতে এবং মানবিক উন্নয়ন উপহার দিতে পারে। মানবিক বিনিয়োগ ব্যক্তিগত গণপ্রচেষ্টাসমূহকে স্থানীয় মানুষের জন্য পুনরুদ্ধারে সহযোগিতা করে। অধিকন্তু সংঘর্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বাস্তুচ্যুতিকে মোকাবেলা করে। উল্লেখ্য যে, সমবায়ভিত্তিক গ্রামীণ পর্যটন এইজাতীয় বিনিয়োগের একটি বড় অধিক্ষেত্র হতে পারে। প্রতিটি বিনিয়োগে মানুষের চাহিদা নিরূপণ ও তাদের মৌলিক নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিত করবে। পর্যটন তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ না হওয়ার আশঙ্কাকে মোকাবেলা করতে পারে।

পর্যটনে সবুজ বিনিয়োগক্ষেত্র

ক. পর্যটনে বাস্তুতন্ত্র পরিষেবা: প্রকৃতি মানুষের জন্য অপরিহার্য সকল সম্পদ সরবরাহ করছে। মানুষের দায়িত্ব হলো এইসব সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা উৎপাদন করা। তাই বাস্তুতন্ত্র পরিষেবার মাধ্যমে পরিবেশের উপাদানগুলিকে ব্যবহার মানুষ ও অন্য উদ্ভিদ-প্রাণিকুলের জন্য ইতিবাচক সুবিধা সৃষ্টি। বাস্তুতন্ত্র পরিষেবা হলো প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বাস্তুগত উপাদান দ্বারা মানুষের জন্য তৈরি সুবিধাসমূহ। সুস্থ বাস্তুতন্ত্র একটি সকল জীবের বসবাসের জন্য সুস্থ অবস্থা তৈরি করে। ফলে বিশুদ্ধ বাতাস, চরম আবহাওয়া প্রশমন ও মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা প্রদান করে। প্রতিটি বাস্তুতন্ত্র পরিষেবা পর্যটনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাই পর্যটনের নীতি প্রণয়নে বিধান, নিয়ন্ত্রণ, সমর্থন ও সাংস্কৃতিক পরিষেবাকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে বিনিয়োগ ক্ষেত্র নির্ধারণ করতে হবে।

খ. নন-হোটেল পর্যটন আবাসন: পর্যটন পৃথিবীময় একটি দ্রুত সম্প্রসারণশীল কর্মকাণ্ড। ফলে হোটেলের সংখ্যা বাড়ছে। সারা পৃথিবীতে হোটেলগুলি থেকে কমবেশি ১% কার্বন গ্যাস নির্গত হয়। তাই এখন সময় এসেছে হোটেল বহির্ভূত পর্যটন আবাসন ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়ার। এই ধরনের আবাসন ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে হোম স্টে, গ্রামীণ বাংলো, বহু ধরনের তাঁবু ইত্যাদি। কমিউনিটিভিত্তিক পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নন-হোটেল আবাসনে অধিক পরিমাণে সবুজ বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এই বিনিয়োগ পর্যটন সম্প্রসারণ ও পরিবেশ রক্ষা উভয় ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

গ. পর্যটন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: বাংলাদেশের প্রতিটি গন্তব্যে পর্যটন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রচুর বর্জ্য উৎপাদিত হয়। এর অধিকাংশ বর্জ্যই কঠিন ও তরল এবং সামান্য বায়বীয়। জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থার মতে, পর্যটন মোট উৎপাদিত কার্বনের মাত্র ৮% নিঃসরণ করে। পর্যটন মেডিক্যাল ও শিল্প বর্জ্যের মতো অধিক বিষাক্ত বর্জ্য উৎপাদন করে না। উল্লেখ্য যে, পর্যটনের বর্জ্য উৎপাদন ও অব্যবস্থাপনা নিয়ে সর্বত্রই ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। এমনকি পর্যটন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে অনেক পর্যটন গন্তব্য বিনষ্টের পথে। এই অবস্থা বিবেচনা করে পর্যটন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কারিগরি প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ অত্যন্ত জরুরি। পর্যটনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ হতে পারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সবুজ বিনিয়োগ।

ঘ. পর্যটন শিক্ষা: এমন অনেক গুণী মানুষ আছেন যারা জ্ঞান ও বোধ দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছেন। নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের বাইরে থেকে জীবনের অর্জনগুলি নিশ্চিত করছেন। এরা উৎপাদন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, হস্তশিল্প, গান, নাচ, গল্পবলা ইত্যাদি নানাবিধ জীবনমুখী কর্মকাণ্ডের প্রয়োগ ও দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের সক্ষমতা দিয়ে নিজেদের অবস্থান নির্ণয় করতে পেরেছেন। পর্যটন শিক্ষা সম্প্রসারণে এই জাতীয় শিক্ষক প্রয়োজন। আনুষ্ঠানিক পর্যটন শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক পর্যটন শিক্ষার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পর্যটন শিক্ষা ও উচ্চতর দক্ষতা সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার বিনিয়োগ উপখাত হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত। পর্যটনের সঙ্গে একটি গন্তব্যের প্রায় সকল মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকার জন্য পর্যটনের কোনো না কোনো বিষয়ের উপর এদের সকলের পর্যটন শিক্ষণ বা প্রশিক্ষণ থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশেষত পর্যটনের নানান স্তরে ছোটখাটো ও হালকা কাজ করার জন্য মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদেরকে এই শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত করা যায়। পর্যটন শিক্ষা ও উচ্চতর দক্ষতা সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার বিনিয়োগ উপখাত হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত। কিন্তু বিনিয়োগের অভাবে পর্যটন শিক্ষায় যুবকদের প্রবেশ সীমিত হয়ে যাচ্ছে এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। বৈশ্বিক পর্যটনকর্মী সৃজনের লক্ষ্যে ২০৩০ পর্যন্ত লক্ষ্য স্থির করা জরুরি। কারণ এই সময়ে পৃথিবীর বহুদেশে লক্ষ লক্ষ আতিথেয়তা স্নাতকের প্রয়োজন হবে। ফলে বিনিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে। পর্যটনের নানাবিধ প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী, উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

ঙ. ঐতিহ্য কৃষি পর্যটন: ঐতিহ্য কৃষি পর্যটনের মাধ্যমে পর্যটকরা গ্রামীণ কৃষির ঐতিহ্য দর্শন, সংরক্ষণ ও উক্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবনধারা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। এই জাতীয় পর্যটন গ্রামীণ সংস্কৃতির গুরুত্ব ও স্থায়িত্বকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারে। ভ্রমণকারীরা জীবনের নতুন গল্প ও প্রশান্তির সবুজ বার্তাবরণ আবিষ্কার করবেন। এরা প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানীয়দের সঙ্গে মিশে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে এবং কৃষি ঐতিহ্যকে ধারণ করবে। বাংলাদেশের ভাসমান সবজি চাষ ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী চাষপদ্ধতির স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ্ব ঐতিহ্যের এই স্বীকৃতি দেওয়ার প্রক্রিয়ায় ইউনেস্কো, জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক তহবিল (জিইএফ) যুক্ত ছিল। একই সঙ্গে বাংলাদেশের ফুল চাষ, প্রচলিত পদ্ধতিতে ধান চাষ, পাহাড়ে জুমচাষ এবং একসঙ্গে ধান ও মাছ চাষের পদ্ধতি বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী চাষপদ্ধতির সম্ভাব্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে এই ক্ষেত্রটি বিশেষ সবুজ বিনিয়োগের দাবিদার।

চ. যুবা নারী ও পুরুষ স্টার্ট আপ: পর্যটনে নানাবিধ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমৃদ্ধি সাধনের জন্য বিনিয়োগ নীতি গ্রহণ করা উচিত। উদ্ভাবন ও ডিজিটালাইজেশনে বিনিয়োগে বহুগুণিতক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এই ধরনের বিনিয়োগ বড় আকারের বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক উন্নয়নকে শক্তিশালী করবে এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে উদ্দীপ্ত করবে। এই ক্ষেত্রে যুবা নারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। নারীদের অগ্রাধিকার প্রদানের ফলে বিনিয়োগ নীতি উদ্যোক্তা পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থার মতে, বৈশ্বিক পর্যটনের বর্তমানে ৫৪% নারী পর্যটনে নিয়োজিত রয়েছেন। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যা ও সক্ষমতা উভয়ই বাড়ছে। ফলে বিশ্বব্যাপী নারীদের দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে। পর্যটনের নানাবিধ স্টার্ট আপ স্থাপনে বিশেষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য সরকারি পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি অন্যান্য গ্রীন এঞ্জেল

ইনভেস্টার প্রতিষ্ঠানসমূহ এই ধরনের বিনিয়োগে ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসা দরকার। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় পর্যটনের স্টার্ট-আপগুলিতে বিনিয়োগকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে এবং পর্যটন প্রযুক্তি ও ইকোসিস্টেমের স্থিতিস্থাপকতা বিবেচনা করে কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করা দরকারি।

পর্যটনে বিনিয়োগ কৌশল উদ্ভাবন

পর্যটনকে অধিকতর সক্ষমতা প্রদানের লক্ষ্যে খাত নির্ধারণ করে সবুজ বিনিয়োগ প্রয়োজন, যা জনগণের জন্য নানাবিধ সুযোগ সৃষ্টি হবে, স্থিতিস্থাপক অর্থনীতি গড়ে উঠবে এবং সকল উন্নয়ন সম্ভাবনা বাস্তবতা লাভ করবে। জলবায়ু সংক্রান্ত কর্মপ্রচেষ্টা এবং এই পৃথিবীর স্থায়িত্ব নিশ্চিতকল্পে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমৃদ্ধি, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি অব্যাহত রাখতে হবে। পর্যটনে কৌশলগত বিনিয়োগ একটি প্রধান বিষয়। এই বিনিয়োগ উন্নয়নের পথে সেতু নির্মাণ করে। পর্যটন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী জব ফ্যাক্টরি হিসেবে পরিগণিত। ২০১৯ সালে সেক্টরটি বিশ্বব্যাপী প্রতি ১০জনের মধ্যে ১জনকে নিয়োগ করেছে এবং নারী ও যুবকদের জন্য উচ্চ স্তরের সুযোগসহ নানাবিধ কর্মসৃজন করেছে।

পর্যটনের বিনিয়োগ কৌশলকে নিম্নরূপে পরিশীলিত করা যায়

ক. সরকারকে আন্তর্জাতিক ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে প্রসারিত করার মাধ্যমে মানবপুঁজি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রবিধান এবং প্রণোদনা সৃষ্টি করতে হবে।

খ. পর্যটনের উদীয়মান বিনিয়োগের চাহিদা পূরণে বেসরকারি খাত কর্তৃক শিক্ষা উন্নয়নে গৃহিতব্য পদক্ষেপগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে।

গ. পর্যটন সবুজায়নে বর্ধিত বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বিনিয়োগকারীদের অনুপ্রাণিত করার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. জলবায়ু প্রযুক্তি উদ্ভাবন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে ব্যবসায়িক মডেল ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য নতুন জলবায়ু সংকট মোকাবেলার পন্থা নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ. উদ্ভাবনকে সমর্থন করার জন্য আর্থিক বিনিয়োগ ব্যবস্থা, উপকরণ ও প্রযুক্তি এবং উদ্যোক্তা গড়ে তুলতে হবে।

চ. পর্যটন ব্যবসাকে সহজভাবে পরিচালনার নীতি গ্রহণ করে বিনিয়োগ নীতি আরও সহজ করতে হবে। এতে উদীয়মান ও জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্ভাবনী আর্থিক প্রক্রিয়া এবং সমাধানগুলিকে আলিঙ্গন করা সম্ভব হবে।

ছ. অর্থায়নের লিঙ্গ ব্যবধান হ্রাস করার উদ্দেশ্যে গার্হস্থ্য ও বাণিজ্যিক উভয় ক্ষেত্রেই নারীদের মূলধন বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করতে হবে। ফলে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আন্তর্জাতিক বাজার উন্মুক্ত হবে।

উপসংহার

এই গ্রহে পর্যটনের সবুজ রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগের বিকল্প নাই। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ উত্তম পরিষেবা প্রদান করতে পারে। যেমন বিশ্বব্যাপী মোট কার্বন নির্গমণের ১% হয় হোটেল থেকে এবং পর্যটন খাত ক্রমবর্ধমান এনার্জি ও পানি ভোক্তাদের অন্যতম। তাই জলবায়ু প্রযুক্তি ও পর্যটনের স্টার্ট-আপগুলির জন্য তহবিল যোগান সত্যিকারের রূপান্তরের সূচনা করতে পারে। কেবল প্রয়োজনের জন্য নয়, বরং পর্যটনের ক্রিয়াকলাপে টেকসই ব্যবস্থাকে সমন্বিত করে এই সকল বিনিয়োগ পর্যটনকে চালকের আসনে বসাতে পারে। সঠিক বিনিয়োগ ব্যয় দক্ষতা, শহর পরিচালনা নীতি, অভ্যন্তরীণ স্থায়িত্ব, ব্র্যান্ড ইমেজ ও অতিথি সন্তুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে পর্যটন অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করবে।

সবশেষে বলা যায় যে, পর্যটনের নানারূপ অধিক্ষেত্র যেমন প্রাকৃতিক মূলধনের ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পর্যটন শিক্ষা, স্টার্ট-আপ ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অগ্রাধিকার বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পর্যটন বিনিয়োগ সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে। বিনিয়োগে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস করার উদ্দেশ্যে নারী জনগোষ্ঠীকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে হবে। আগামী দিনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিরসনে এই কৌশল সমধিক উপযোগিতা সৃষ্টি করবে।

লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ ট্যুরিজম ফাউন্ডেশন

টুঙ্গিপাড়ার পুরাকীর্তি ও বঙ্গবন্ধুর পিতৃভূমি পরিপ্রেক্ষিত বিশ্বপ্রত্নপর্যটন সম্ভাবনা

ড. মো. আতাউর রহমান

ভূমিকা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ও বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাড়িপোতা স্থান ও চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ২৩০ কিলোমিটার দূরে বর্তমানের গোপালগঞ্জ জেলায় তথা ঐতিহাসিক কোটালিপাড়া তথা টুঙ্গিপাড়ায়[১]-যেখানে ষষ্ঠ শতকের বঙ্গের রাজধানীও ছিল। তাই এই গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ার নিকটস্থ টুঙ্গিপাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য যেমন প্রাচীন, ঠিক তেমনই বিস্ময়কর ও গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে আজ থেকে একশ তিন বছর আগে ১৭ই মার্চ বাংলার দক্ষিণ প্রান্তে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ার নিভৃত পল্লিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শেখ মুজিব ওরফে খোকা বাবু। যিনি পরবর্তীতে বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনিই বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই 'বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষ'কে উপলক্ষ করেই বক্ষমান এই প্রবন্ধটি সকলের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস রাখছি।

এখানে ত্রি-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান। যথা; ১. প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক চন্দ্রবর্মণকোর্ট শহরটি ঘাঘর নদীর তীরে গড়ে ওঠেছিল। চন্দ্রবর্মণকোর্ট-এর রাজবংশ ছিল বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। পণ্ডিতদের ধারণা এই বর্মণকোট দুর্গটি ৬ষ্ঠ শতকের রাজধানী[২] দুর্গ হলেও এটি নির্মিত হয়েছিল আরও আগে, সম্রাট অশোকের (খ্রি.পূ. ২৭৩ অব্দ) সময়। [৩] ২. এ জেলার পূর্ব সীমানার খাটরা গ্রামের অধিবাসী হিন্দু ধর্মালম্বীরাই এ অঞ্চলে প্রথমে বসতি স্থাপন করে। রাজা বল্লাল সেনের আমলে এবং ৩. প্রথম দিকের বাংলায় আগত বিখ্যাত মুসলিম সুফি দরবেশ হযরত শাহজালাল (র.) (১১৯৫-১৩৪৭ খ্রি:)[৪] ; তাঁর সমসাময়িক কালের শেখ বোরহান উদ্দিন (র.) ও হযরত মামুদ শাহ-এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে আসেন বলে লোকভাষ্য ও অন্যান্য সূত্রে জানা যায়। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে মোগল আমলে নির্মিত নান্দনিক শৈলীর স্থাপত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক কিছু নিদর্শনের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এখন পর্যন্তও টিকে আছে ঐতিহাসিক টুঙ্গিপাড়ায়।

স্মরণীয় যে, টুঙ্গিপাড়ার এই সুফি শেখ বংশের ঐতিহাসিক এই পুরাকীর্তির অঙ্গনেই ১৭ই মার্চ ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।[৫]

দুঃখজনক হলেও সত্য আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশের কতজন নাগরিক জানেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি

---

[১] বঙ্গবন্ধুর পৈতৃক বাড়িটি গোপালগঞ্জ জেলা শহর থেকে প্রায় ২০কিলোমিটার দূরে ঐতিহাসিক টুঙ্গিপাড়ায় গ্রামের পূর্ব পাশে বয়ে যাওয়া বাঘাইর নদীর পাড়ে অবস্থিত।

[২] আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৪,পৃ-৪৫৪।

[৩] রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, গোপালগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ঢাকা:গতিধারা, ২০০৯,পৃ-৭০।

[৪] দেওয়াল নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহ জালাল (র:) দলিল ও ভাষ্য, ইফাবা, প্রথমপ্রকাশ, ১৯৯৯,পৃ-৩৬২ ও ৫৪২।

[৫] চেতনায় বঙ্গবন্ধু, ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০২১,পৃ-০১।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওরফে খোকা বাবুর পৈত্রিক বসতবাড়ির প্রাচীন স্থাপত্য সম্পর্কে!

আরও কষ্টের বিষয় সচেতন ও শিক্ষিত বাঙালি সন্তান বা নাগরিক মাত্রই উক্ত বিষয়ে জানা প্রাসঙ্গিক হওয়া সত্ত্বেও বিগত যাপিত সময়ধরে এই অমূল্য স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি সম্পর্কে হাজারো ব্যস্ততায় জানার সময় করে উঠতে পারেনি। এমনকি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণও যাঁরা টুঙ্গিপাড়ায় একাধিকবার বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধ ও জাদুঘর পরিদর্শন করলেও তাঁরা হয়তো জানেনেই না সমাধির মাত্র শত ফুট দক্ষিণেই রয়েছে বঙ্গবন্ধুর নাড়িপোঁতা স্থানের প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তি!

তাই তাঁর মতো এমন মহৎপ্রাণ মহান বাঙালির অহংকার ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ভালোবাসা, নিজস্ব তাড়না ও ভাবনা থেকেই আমার এই প্রবন্ধের অবতারণা– যার পরিচিতি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

উল্লেখ্য যে, প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে দল-মত, নির্বিশেষে সাধারণ সচেতন নাগরিক হিসেবে অন্তত, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ব পুরুষদের সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তাঁদের আবাসস্থলটি যেটি ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়[৬] এবং তখন থেকেই প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এর সুরক্ষা ও দেখভালে নিয়োজিত আছে; যা পরিদর্শন করে নিজেরাও গর্বিত হবে এবং সেই সঙ্গে বাঙালি জাতির অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধির কথা দেশে-বিদেশে তথা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, তাতে বিশ্ব প্রত্নপর্যটন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

১. টুঙ্গিপাড়ার ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রশাসনিক সংক্ষিপ্ত পরিচিতি [৭]

টুঙ্গিপাড়া উপজেলা বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক উপজেলা– যা ১টি পৌরসভা এবং ৫টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। এটি ঢাকা বিভাগের অধীনে এবং গোপালগঞ্জ জেলার প্রায় ২০কিলোমিটার সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত।

এর পূর্বে কোটালীপাড়া উপজেলা, পশ্চিম ও উত্তরে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা এবং দক্ষিণে চিতলমারী ও বাগেরহাট জেলা অবস্থিত। এই উপজেলার উপর দিয়ে মধুমতি নদী ও বাইগার নদী প্রবাহিত হয়েছে।

[৬] পিতৃগৃহ, সংকলক, মো.আমিরুজ্জামান, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা : ২০২০,পৃ-১০।
[৭] বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩,পৃ-২৩০।

২. ভৌগোলিকভাবে স্থানাঙ্ক ও অন্যান্য : [৮]

২২°৫৩' ৪৯" উত্তর অক্ষাংশে ৮৯°৫২'৫৪" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে টুঙ্গিপাড়া উপজেলার অবস্থান।
আয়তন: ১২৭.২৫ বর্গকিমি (৪৯.১৩ বর্গমাইল)
জনসংখ্যা: ৯৯,৭০৫ জন।
সাক্ষরতার হার: ৫৩%

নামকরণ:[৯] কথিত আছে পারস্য এলাকা থেকে আগত কতিপয় মুসলিম সাধক অত্র এলাকার প্লাবিত অঞ্চলে টং বেঁধে বসবাস করতে থাকেন এবং কালক্রমে ঐ টং থেকেই এই এলাকার নামকরণ করা হয় টুঙ্গিপাড়া।[১০] বর্তমানে কালের বিবর্তনে বড়-বড় দালান-কোঠার মাঝে হারিয়ে যেতে বসেছে এ সকল ঐতিহ্য। তবে উপজেলার বিলাঞ্চল ও নীচু এলাকা সাধারণ মানুষ এখনো এ ধরনের টং বেঁধে ঘর বানিয়ে বসবাস করে থাকে।

৩. বঙ্গবন্ধুর পিতৃভূমি তথা পূর্ব পুরুষদের প্রাচীন আবাসস্থল

ভৌগোলিকভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ব পুরুষদের বসতভিটা তথা আলোচিত পুরাকীর্তিটি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাটগাতি ইউনিয়নের ঐতিহাসিক টুঙ্গিপাড়া গ্রামটি ২২°৫৪'২২.৪৭" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৫৩'৪৬.৭৪" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

ইতিহাস

বঙ্গবন্ধু, টুঙ্গিপাড়া ও তাঁর পূর্ব পুরুষদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে কমপক্ষে ৫০টি রেফারেন্স বই ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ স্ট্যাডি করে আমার ভাবনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ লেখাটি পাঠক, গবেষক ও প্রত্নপর্যটকদের উদ্দেশে তুলে ধরলাম। শেখ মুজিব আমার পিতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর লেখায় বলেন, বাইগার নদীর তীর ঘেঁষে ছবির মতো সাজানো একটি গ্রাম। সেই গ্রামটির নাম টুঙ্গিপাড়া। বাইগর নদী এঁকেবেঁকে গিয়ে মিশেছে মধুমতী নদীতে। এই মধুমতী নদীর অসংখ্য শাখানদীর একটি বাইগার নদী। নদীর দুই পাশে তাল, তমাল, হিজল গাছের সবুজ সমারোহ। ভাটিয়ালি গানের সুর ভেসে আসে হালধরা মাঝির কণ্ঠ থেকে। পাখির গান আর নদীর কলকল ধ্বনি এক অপূর্ব মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলে। প্রায় ২০০ বছর আগে মধুমতী নদী এই গ্রাম ঘেঁষে বয়ে যেত। এই নদীর তীর ঘেঁষেই গড়ে উঠেছিল জনবসতি। প্রকৃতির অঘোম নিয়মে ধীরে ধীরে নদীটি দূরে সরে যায়। চর জেগে গড়ে ওঠে আরো অনেক গ্রাম। সেই ২০০ বছর আগে ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়েই আমাদের পূর্বপুরুষরা এসে এই নদীবিধৌত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত ছোট্ট গ্রামটিতে তাঁদের বসতি গড়ে তোলে ; এবং তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে। অনাবাদি জমিজমা চাষবাস শুরু করেন এবং গ্রামের বসবাসকারী কৃষকদের নিয়ে একটা আত্মনির্ভরশীল গ্রাম হিসেবেই এ গ্রামটিকে বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রামরূপে গড়ে তোলেন। যাতায়াত ব্যবস্থা প্রথমে নৌকাই ছিল একমাত্র ভরসা। পরে গোপালগঞ্জ থানা স্টিমারঘাট হিসেবে গড়ে ওঠে। আমাদের পূর্বপুরুষরা টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জমিজমা ক্রয় করে বসতির জন্য কলকাতা থেকে কারিগর ও মিস্ত্রি এনে দালানবাড়ি তৈরি করেন, যা সমাপ্ত হয় ১৮৫৪ সালে। এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই দালানের ধ্বংসাবশেষ।

---

[৮] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা : ২০১১।
[৯] বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা, ১০.১.২০২২।
[১০] গোপালগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পূর্বঔক, পৃষ্ঠা-

সংস্কার পূর্ববর্তী বঙ্গবন্ধুর পিতৃনিবাস, টুঙ্গিপাড়া

সংস্কার পরবর্তী বঙ্গবন্ধুর পিতৃনিবাস, টুঙ্গিপাড়া

১৯৭১ সালে যে দুটি দালানে বসতি ছিল, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আগুন দিয়ে সে দুটিই জ্বালিয়ে দেয়। এ দালানকোঠায় বসবাস শুরু হওয়ার পর ধীরে ধীরে বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে,আর আশেপাশে বসতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এ দালানেরই উত্তর-পূর্ব কোণে টিনের চৌচালা ঘর তোলেন আমার দাদার বাবা শেখ আবদুল হামিদ। আমার দাদা শেখ লুৎফর রহমান এ বাড়িতেই সংসার গড়ে তোলেন। এখানেই জন্ম নেন আমার বাবা, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। আমার বাবার নানা শেখ আবদুল মজিদ আমার বাবার আকিকার সময় নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমার দাদির দুই কন্যা সন্তানের পর প্রথম পুত্র সন্তান আমার বাবা। আর তাই আমার দাদির বাবা তাঁর সব সম্পত্তি দাদিকে দান করেন এবং নাম রাখার সময় বলে যান,'মা সায়রা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম, যে নাম জগৎজোড়া খ্যাত হবে।'[১১]

সত্যিই আজ তাঁর জন্মের ১০০ বছর পরেও গোটা পৃথিবী 'শেখ মুজিবুর রহমান' পরবর্তী সময়ে জাতির দেওয়া সম্মান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে এক নামে চিনে সারাবিশ্ব।

৪. বঙ্গবন্ধু, টুঙ্গিপাড়া ও তাঁর পূর্বপুরুষ ও তাঁদের নির্মিত প্রাচীন বাড়ি :

বঙ্গবন্ধু, টুঙ্গিপাড়া ও তাঁর পূর্ব পুরুষ ও তাঁদের নির্মিত প্রাচীন বাড়ি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার ভাবনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সঠিক তথ্য–সমৃদ্ধ আরও একটি লেখা–যেটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ও *কারাগারের রোজনামচা*-তে লিখছেন; পাঠক, গবেষক ও প্রত্নপর্যটকদের উদ্দেশ্যে সেটির কিছু অংশ তুলে ধরলাম।

এখানে প্রথমেই বঙ্গবন্ধুর জেল জীবনের ঐতিহাসিক ডাইরি নিয়ে লেখা *কারাগারের রোজনামচা*-য় উল্লেখ-'১৭ই মার্চ ১৯৬৭। শুক্রবার আজ আমার ৪৭তম জন্মবার্ষিকী। এই দিনে ১৯২০ সালে পূর্ব বাংলার এক ছোট্ট পল্লীতে জন্মগ্রহণ করি।'[১২]

এরপর বঙ্গবন্ধুর জীবনের উপরে তাঁর নিজের লেখা ঐতিহাসিক দলিল *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-তে উল্লেখ-'আমার জন্ম হয় এই টুঙ্গিপাড়া শেখ বংশে। শেখ বোরহানউদ্দিন নামে এক ধার্মিক পুরুষ এই বংশের গোড়াপত্তন করেছেন বহুদিন পূর্বে। শেখ বংশের যে একদিন সুদিন ছিল তার প্রমাণস্বরূপ মোগল আমলের ছোট ছোট ইটের দ্বারা তৈরি চকমিলান দালানগুলি আজও আমাদের বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি করে আছে। বাড়ির চার ভিটায় চারটা দালান। বাড়ির ভিতরে প্রবেশের একটা মাত্র দরজা, যা আমরাও ছোট সময় দেখেছি বিরাট একটা কাঠের কপাট দিয়ে বন্ধ করা যেত। একটা দালানে আমার এক দাদা থাকতেন। এক দালানে আমার এক মামা আজও কোনোমতে দিন কাটাচ্ছেন। আর একটা দালান ভেঙে পড়েছে, যেখানে সর্পকুল দয়া করে আশ্রয় নিয়েছে। এই সকল দালান চুনকাম করার ক্ষমতা আজ তাদের অনেকেরই নাই। এই বংশের অনেকেই এখন এ বাড়ির চারপাশে টিনের ঘরে

[১১] চেতনায় বঙ্গবন্ধু, পূর্বোক্ত, পৃ-০১।

[১২] শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১ম প্রকাশ, ২০১৭, পৃ-২০৯।

বাস করেন। আমি এই টিনের ঘরের এক ঘরেই জন্ম গ্রহণ করি। শেখ বংশ কেমন করে বিরাট সম্পদের মালিক থেকে আস্তে আস্তে ধ্বংসের দিকে গিয়েছিল তার কিছু কিছু ঘটনা বাড়ির মুরুব্বিদের কাছ থেকে এবং আমাদের দেশের চারণ কবিদের গান থেকে আমি জেনেছি। এর অধিকাংশ যে সত্য ঘটনা এ সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নাই। শেখ বংশের সব গেছে, শুধু তারা পুরাতন স্মৃতি ও পুরানো ইতিহাস বলে গর্ব করে থাকে।

শেখ বোরহানউদ্দিন কোথা থেকে কিভাবে এই মধুমতীর তীরে এসে বসবাস করেছিলেন কেউই তা বলতে পারে না। আমাদের বাড়ির দালানগুলির বয়স দুইশত বৎসরেরও বেশি হবে।

শেখ বোরহানউদ্দিনের পরে তিন চার পুরুষের কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে শেখ বোরহানউদ্দিনের ছেলের ছেলে অথবা দু'এক পুরুষ পরে দুই ভাইয়ের ইতিহাস পাওয়া যায়।

এঁদের সম্বন্ধে অনেক গল্প আজও শোনা যায়। এক ভাইয়ের নাম শেখ কুদতরউল্লাহ, আর এক ভাইয়ের নাম শেখ একরামউল্লাহ। আমরা যারা আছি তারা এই দুই ভাইয়ের বংশধর। এই দুই ভাইয়ের সময়েও শেখ বংশ যথেষ্ট অর্থ ও সম্পদের অধিকারী ছিল। জমিদারির সাথে সাথে তাদের বিরাট ব্যবসাও ছিল।

শেখ কুদরতউল্লাহ ছিলেন সংসারী ও ব্যবসায়ী; আর শেখ একরামউল্লাহ ছিলেন দেশের সরদার, আচার-বিচার তিনিই করতেন।'[১৩]

আর সে প্রেক্ষিতেই টুঙ্গিপাড়ার ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি : বঙ্গবন্ধুর পিতৃভূমিতে-যা দক্ষিণ বঙ্গের তথা বাংলার অন্যতম মুসলিম শিল্প নিদর্শন অংশ হিসেবে বিবেচিত।

৫. বঙ্গবন্ধুর পিতৃগৃহ তথা তাঁর পূর্বপুরুষদের নির্মিত প্রাচীন স্থাপত্যিক কাঠামো

সংস্কার পূর্ববর্তী বঙ্গবন্ধুর পিতৃনিবাসের মধ্যাংশ, টুঙ্গিপাড়া

মোগল আমলের প্রায় ৩০০ বছর আগের জাফরি বা সরু ইট, চুন-সুরকিতে নির্মিত এই পুরাতন ভবনটি। 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পূর্ব পুরুষদের আবাসস্থলে অবস্থিত কাচারি ভবনটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং পূর্ব দুয়ারী। ভবনটির পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৯.৮৭ মিটার এবং প্রস্থে ৩.৮১মিটার। ভবনের প্রতিটি দেয়াল ০.৬১ মিটার।

ইমারতের মধ্যস্থানে একটি প্যাসেজ বিদ্যমান।...ইমারতের ছাদ কড়িবর্গার উপর নির্মিত। পুরাকীর্তির অবস্থান ও গঠনশৈলী দেখে ধারনা করা হয় যে, স্থাপনাটি বঙ্গবন্ধুর পূর্ব পুরুষগণ কাচারি বা বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহার করতেন'।[১৪] উল্লেখ্য যে, বহুদিন পরিত্যক্ত থাকার পর অনেকটা ধ্বংসের মুখে চলে যায়; ২০১০ সালে সংরক্ষিত হওয়ার পর থেকে দেশি-বিদেশি প্রত্নতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ, সংরক্ষণবিদ, স্থাপত্যবিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রকৌশলী, রসায়নবিদ ইত্যাদি বিশেষজ্ঞ টিমের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও

[১৩] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২,পৃ-৩।
[১৪] পিতৃগৃহ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০।

বিচার-বিশ্লেষণ করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর গত দুই বছর ধরে প্রত্ননিদর্শনটি পূর্বের আদলে (as it is) সংস্কার-সংক্ষণের ব্যবস্থা করে।

এ-ই বৈঠকখানার পিছনে কোর্টইয়ার্ড উভয় পাশে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা আরও দুটি সমসাময়িক কালের মোগল স্থাপত্যিক কাঠামো লক্ষ করা যায়, সেগুলোর অবস্থান ও গঠনশৈলী দেখে মনে হয়, এগুলোতে তারা বসবাস করতেন।

এককথায় বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, কারাগারের রোজনামচা ও *আমার দেখা নয়াচীন* - এই গ্রন্থত্রয়ে নিজের পূর্বপুরুষদের ও তাঁদের রেখে যাওয়া প্রাচীন কীর্তির নিদর্শনের বর্ণনার পাশাপাশি, নিজ দেশের ও ভিন দেশের (লালবাগসহ অন্যান্য মোগলদুর্গ) ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ভিনদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, জাদুঘর, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য ('সপ্তম আশ্চর্যের একটি দেওয়াল। চীনের দেড় হাজার মাইলের ঐতিহাসিক প্রাচীর। দুই হাজার বছরের বেশিদিন হবে নির্মাণ হয়েছে।')[১৫] ইত্যাদি ইতিহাস-ঐতিহ্য সমৃদ্ধ অনন্যসাধারণ নিদর্শনগুলো নিয়ে যে অসাধারণ ও অনবদ্য ইতিহাস লিখেছেন বা বর্ণনা করেছেন তা বাঙালির তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যা বাঙালি জাতির ইতিহাসের অংশও বটে। আর তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে পারলে একদিকে এর জন্যে বিরাট গর্ব অনুভব করবে এবং অন্যদিকে একটি সংস্কৃতি বান্ধব সমাজ তথা বাংলাদেশ বিনির্মাণে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সুতরাং চলমান সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর জন্মস্থানকে ঘিরে দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মানের 'বিশ্বগ্রাম উন্নয়ন পর্যটন' গড়ে তোলা যেতে পারে এই ঐতিহাসিক টুঙ্গিপাড়ার এসকল পুরাকীর্তি সংবলিত স্থানকে।

৬. বঙ্গবন্ধুর পিতৃগৃহ সংরক্ষণের ইতিহাস

গোপালগঞ্জ জেলার ঐতিহাসিক টুঙ্গিপাড়া উপজেলাস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পূর্ব পুরুষদের আবাসস্থলটি বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা এমপি ও বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা সম্মানীত শেখ রেহানা ২০০৯ সালে ২য় মেয়াদে সরকার গঠনের পর পরই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকটে হস্তান্তর করেন, ফলে তা ১৯৬৮ সালের পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আইন বলে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়। [১৬]

[১৫] শেখ মুজিবুর রহমান, *আমার দেখা নয়াচীন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০২০,পৃ-১২২।

[১৬] ড. মো. আতাউর রহমান, *প্রত্নতাত্ত্বিক গাইড : ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি প্রেস, ২০১৭, পৃ-৯০।

৭. বঙ্গবন্ধুর পিতৃভূমিতে তাঁর নির্মিত সমসাময়িক ও আধুনিক স্থাপত্যিক কাঠামো

বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* -তে যে বসত ঘরের বর্ণনা করেছেন সেখানেই পরবর্তী সময়ে বর্তমানে টিকে থাকা দ্বিতল ভবনটি নির্মাণ করেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাকি জীবনে টুঙ্গিপাড়ায় আসলে এই ভবনেই থাকতেন। [১৭]

যেখানে রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ব্যবহারের বেশ কিছু আসবাবপত্র, তৈজসপত্র, দুর্লভ ছবি ইত্যাদি নিদর্শন সংবলিত স্মৃতি সংগ্রহশালা। সেগুলো দেখলে আপনার মনটা অবচেতন ভাবেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অতীত স্মৃতি ভেসে উঠবে এবং চিরন্তন মনের গহিনে কষ্ট অনুভব করবেন এ ভেবে যে,'এমন মহৎপ্রাণ সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ব্যক্তিত্বকে কীভাবে হত্যা করতে পারলো'

সংস্কার পরবর্তী বঙ্গবন্ধু পরিবারের বসতঘরে শেখ পরিবারের বিশ্বস্ত সহচর সদ্য প্রয়াত বৈকুণ্ঠ বাবুর সঙ্গে লেখক।

৮. টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি কমপ্লেক্স

টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থল বা কমপ্লেক্সটি জেলার শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণীয় স্থান। বঙ্গবন্ধুর সমাধির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে আধুনিক স্থাপত্যরীতির বর্গাকার নান্দনিক শৈলীর একটি সমাধিসৌধ। ১৯৯৯ সালের ১৭ই মার্চ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মেদ এটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং এই কমপ্লেক্স নির্মাণে মোট ব্যয় হয় ১৭কোটি ১১লাখ ৮৮হাজার টাকা। তৎপরবর্তীকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের ১০ই জানুয়ারি শুভ উদ্বোধন করেন।

আধুনিক স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত এই মাজার কমপ্লেক্সে রয়েছে সুবিশাল আঙ্গিনা, মূল সৌধ, মসজিদ, লাইব্রেরি, প্রদর্শনী কেন্দ্র, ৪০০আসনের উন্মুক্ত মঞ্চ, স্যুভেনির কর্ণার, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর-এর গণপূর্ত শাখা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে এ কমপ্লেক্সটি বাস্তবায়ন করে। অতঃপর এটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রত্নতত্ত্ব

[১৭] বৈশ্বয়িক করোনা মহামারিতে সদ্য প্রয়াত শ্রী বৈকুণ্ঠ বাবু মুখে শুনেছি যিনি দীর্ঘদিন বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন।

অধিদপ্তরের কাছ থেকে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কাছে ন্যস্ত করা হয় এবং এটি জাতীয় পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এ মাজার কমপ্লেক্সে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কবর, তাঁর পিতা ও মাতা যথাক্রমে শেখ লুৎফর রহমান ও সাহেরা খাতুনের কবর রয়েছে।' [১৮]

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের জন্ম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে বিশ্বের কাছে স্মরণীয় করে রাখার নিমিত্ত ও তাঁকে জানার জন্য টুঙ্গিপাড়ার সমাধি কমপ্লেক্সে একটি পাঠাগার গড়া হয়েছে।

এই পাঠাগার বা লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সম্পর্কিত ১০ ক্যাটাগরিতে প্রায় ৮ হাজার বই রয়েছে। বইগুলোর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা বইয়ের সংখ্যাই বেশি। এছাড়াও সমাধি কমপ্লেক্স এলাকায় খেলার মাঠ, স্মৃতিবিজড়িত হিজল তলা, জমিদার বাড়ি, পুকুর, প্রিয় বালিশা আমগাছ ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে। যার অপার সৌন্দর্য যে কাউকে আকর্ষিত ও বিমোহিত করে। আর তাই তো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবি অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন,

"যতকাল রবে পদ্মা মেঘনা, গৌরী যমুনা বহমান, ততকাল রবে কীর্তি তোমার, শেখ মুজিবুর রহমান।[১৯]
বঙ্গবন্ধুর সমাধি কমপ্লেক্সের লাইব্রেরি ও জাদুঘরটিও অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংবলিত।"

উপসংহার

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলা বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলের বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে মধুমতি, বাইগর ও ঘাঘর নদী বিধৌত একটি উপজেলা। এই ঐতিহ্যবাহী টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় টিকে থাকা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনাদি–যা বাংলার প্রাচীন সভ্যতার প্রধানবাহক হিসেবে বিবেচিত কিছু প্রাচীন বসতবাড়ি, দুর্গ, মন্দির, মঠ, মসজিদ ইত্যাদি নিদর্শনগুলোর মধ্যে শিল্পকলার নান্দনিক শৈলীতে আকর্ষণীয় কয়েকটি হেরিটেজ স্থাপত্যের মধ্যে বক্ষমান প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর পিতৃভূমিতে তাঁর পূর্ব পুরুষদের আবাসস্থলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোসহ বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর সমাধি সৌধসহ অন্যান্য নান্দনিক স্থাপত্য ইত্যাদি বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো। যা প্রত্নতাত্ত্বিক ভাষ্যে অকাট্য প্রামাণিক দলিল হিসেবে বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং যার ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিহাস-ঐতিহ্যের আকর তথ্য দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

এককথায় বর্তমানের সংস্কৃতি বান্ধব সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ায় সারাবিশ্বে সহজেই ছড়িয়ে পড়ছে এ সকল খবর, ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঠাঁই করে নিয়েছে বাংলা, বাঙালি ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ। যা শুধু বাংলায় নয়; বিশ্ব প্রত্নপর্যটন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং এতে একই সঙ্গে স্থানীয় শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং সেই সঙ্গে সরকারের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

[১৮] রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, *গোপালগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯, পৃ-৭৯।
[১৯] রফিকুল ইসলাম ও অনন্যা সম্পাদিত, *মুজিব শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট,২০২১, পৃ-৩২।

লেখক : উপ-পরিচালক কাম কীপার, জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিনোদন পার্ক
বাংলাদেশের পর্যটন বিকাশে সম্ভাবনাময় একটি আকর্ষণ

মোহাম্মদ সাইফুল হাসান

প্রাত্যহিক জীবনের যান্ত্রিকতা, কর্মস্থলের একঘেয়েমি পরিশ্রম, চারদেয়ালের গণ্ডিতে শিশুদের বেড়ে উঠা, শারীরিক ও মানসিক বিষাদ, হতাশা, প্রতিহিংসা ইত্যাদির মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে করতে সবাই একটু দম ছেড়ে বাঁচতে চায়। শিশু, বৃদ্ধ, কিশোর সব বয়সি মানুষেরই চিত্তবিনোদন প্রয়োজন। একসময় ছুটিতে সবাই ছুটে যেত তার আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে। উপভোগ করতো পারিবারিক নানা উৎসব ও অনুষ্ঠান। অবস্থাপন্নদের মধ্যে শিকার ও নৌবিহারে যাওয়ার প্রথা ছিল। আবার যারা সংস্কৃতিবান তারা গান-বাজনা, কবিগানের আসর, নাচ, নাটক-যাত্রাপালা মঞ্চায়ন ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনার আসরে সময় অতিবাহিত করতো। সময়ের পরিক্রমায় বর্তমানে বিনোদনের ধরন পাল্টেছে। এখন সবাই ঘুরে বেড়ায় তার প্রিয় পর্যটন আকর্ষণগুলোতে। কিন্তু সব পর্যটন আকর্ষণ কি তার বিনোদনের সকল চাহিদা মিটাতে পারে? শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশ, খেলাধুলা, সাঁতার, বৃদ্ধদের জন্য একটু খোলামেলা জায়গা, পরিবারের অন্যান্যদের জন্য একটু আয়েশি খাবার, ভিন্ন পরিবেশে অবকাশ যাপন ও আনন্দ উপভোগের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে সুযোগ করে দিচ্ছে বিনোদন। বিনোদন পার্কগুলো পর্যটন শিল্পের তারকা খেলোয়াড় এবং পর্যটনের চাহিদা তৈরিতে বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং বর্তমানে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে ভ্রমণের প্রধান প্রেরণা এবং পর্যটন পণ্যের মূল উপাদান হিসেবে বিবেচিত। পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ, জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সফলতা অর্জনে ভূমিকা রাখবে এই বিনোদন পার্ক।

বিনোদন পার্ক কী?

অ্যামিউজমেন্ট পার্ক এমন একটি পার্ক, যেখানে সব বয়সী পর্যটক বা ভিজিটরদের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয় ও সাজানো হয় বিনোদনের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে। সাধারণ পার্কের সঙ্গে বিনোদন পার্কের পার্থক্য হচ্ছে এটি একটি থিম, বিষয়বস্তু বা কাল্পনিক চরিত্রের উপর ভিত্তি করে উন্মুক্ত পরিবেশে বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়। থিমকে কেন্দ্র করে এর স্থাপনা করা হয় এবং রাইডগুলো সাজানো হয়। তাই পার্কগুলো থিম পার্ক হিসেবেও পরিচিত। এখানে মেকানিক্যাল রাইড, বিনোদন পার্ক, ওয়াটার পার্ক, থিম পার্ক, পারিবারিক বিনোদন কেন্দ্র, জাদুঘর, বিজ্ঞান কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক আকর্ষণ, আর্কেড, ক্যাসিনো, স্পোর্টস বেটিং, হোটেল, রিসোর্ট, কটেজ, রেস্টুরেন্ট, রিফ্রেশমেন্ট, মেলা, প্রদর্শনী, বিক্রয়কেন্দ্র, পিকনিক কর্নার, খেলার মাঠ ইত্যাদির সুবিধা থাকে। তাছাড়াও বাম্পার কার, স্কাই ট্রেন, রোলার কোস্টার, মিউজিক্যাল ফাউন্টেইন, জায়ান্ট টুল, প্যারাট্রুপার, মিনি ট্রেন, সুইমিং বোর্ড, ডেঞ্জার হোল্ডার রাইড, নাইনডি মুভিসহ বিভিন্ন ধরনের ভিডিও গেমস, জলরাশির নৃত্য, হাই-ডেফিনিশন (HD) মিউজিক এবং লাইট শো এবং নাট্য নাটকের সঙ্গে নিমগ্ন সিনেমাটিক অভিজ্ঞতাও অফার করে থাকে যা শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ই একইভাবে উপভোগ করতে পারে।

বিনোদন পার্কের বৈশ্বিক ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক প্রভাব

বিনোদন পার্ক হলো কার্নিভাল এবং মেলার একটি আধুনিক রূপ যা ১৮ শতকের শেষের দিকে ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৯৫ সালে বিনোদন পার্কের গোড়াপত্তন হয়। ১৯৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা

অঙ্গরাজ্যে 'সান্তা ক্লজ ল্যান্ড' নামে বিশ্বের প্রথম থিম পার্ক তৈরি করা হয়। এই পার্ক তৈরির ৯ বছর পর ১৯৫৫ সালে অভিনেতা ওয়াল্ট ডিজনিল্যান্ডের তত্ত্বাবধানে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় তৈরি করা হয় ডিজনিল্যান্ড পার্ক। অভিনেতার নামানুসারে এই পার্কের নামকরণ করা হয়। বিভিন্ন থিমের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এই পার্ক। জানা যায় সারা বিশ্ব থেকে ৬৫ কোটি দর্শক এসেছে এই পার্কে। শুধু শিশুদের (১১ বছরের নিচে) কথা চিন্তা করে ১৯৬৮ সালে ডেনমার্কে বানানো হয়েছে 'লেগোল্যান্ড' পার্ক। এটিও বেশ জনপ্রিয়তা পায়। এর শাখা ইউরোপ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যেও দেখা যায়। 'ডিজনিল্যান্ড' ছাড়াও বিশ্বের বিখ্যাত থিম পার্কের মধ্যে রয়েছে 'সিওয়ার্ল্ড অরল্যান্ডো', 'ইউনিভার্সাল স্টুডিও হলিউড'। এই থিম পার্কগুলো এতটাই জনপ্রিয়তা পেয়েছে যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এসবের শাখাও রয়েছে, যেমন: 'হংকং ডিজনিল্যান্ড', 'ইউনিভার্সাল স্টুডিও সিঙ্গাপুর' ইত্যাদি। বর্তমানে থিম পার্ক এবং বিনোদন পার্ক বাজারে নিম্নবর্ণিত অঞ্চল ও দেশ নেতৃত্ব দিচ্ছে:

- উত্তর আমেরিকা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকো)
- ইউরোপ (জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, রাশিয়া এবং তুরস্ক ইত্যাদি)
- এশিয়া-প্যাসিফিক (চীন, জাপান, কোরিয়া, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া এবং ভিয়েতনাম)
- দক্ষিণ আমেরিকা (ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া ইত্যাদি)
- মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকা (সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিশর, নাইজেরিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা)

বিনোদন পার্কের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রভাব

১৯৯৭ সালে শীর্ষ ৫০টি উত্তর আমেরিকার বিনোদন পার্কে ভিজিটরের সংখ্যা ১৬০ মিলিয়নে পৌঁছেছিল, যেখানে ৪০০টি মার্কিন এবং কানাডিয়ান পার্কে মোট ভিজিটর ছিল ২৮০ মিলিয়নেরও বেশি (ও'ব্রায়েন ১৯৯৭)। ডিজনির বিক্রয় ১৯৮৪ সালের ১.৪৬ বিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৮৯ সালে ৪.৫৯ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছিল। ১৯৯২ সালে ৭০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ডিজনির রাজস্ব আয় ৮ ৭.৫ বিলিয়নে পৌঁছে গিয়েছিল। Global Strategic Business Report-২০২৩ অনুসারে বিনোদন এবং থিম পার্কের জন্য বিশ্বব্যাপী বাজার ২০২২ সালে ৫৪.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে যা ২০৩০ সালে ৮২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছানোর অনুমান করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিনোদন এবং থিম পার্কের বাজার ২০২২ সালে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অপরদিকে চীন ২০৩০ সাল নাগাদ ৮.৮% যৌগ বার্ষিক বৃদ্ধির হার বজায় রেখে ১৮.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছানোর পূর্বাভাস দিয়েছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভৌগোলিক বাজারগুলির মধ্যে রয়েছে জাপান এবং কানাডা, প্রতিটি ২০২২-২০৩০ সময়কালে যথাক্রমে ২.৬% এবং ৪.৩% বৃদ্ধির পূর্বাভাস করা হয়েছে। ইউরোপের মধ্যে জার্মানিতে আনুমানিক ৩.৪% বার্ষিক বৃদ্ধি পাবে। অস্ট্রেলিয়া, ভারত এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলির নেতৃত্বে এশিয়া-প্যাসিফিকের বাজার ২০৩০ সাল নাগাদ ১৮.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে আয় করার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে বিনোদন পার্ক বিকাশের ইতিহাস

১৯৭৯ সালে শিশুদের বিনোদনের জন্য ঢাকার শাহবাগে ১৫ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত শিশু পার্কটি ছিল প্রথম সরকারি মালিকানাধীন বিনোদন পার্ক। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শিশুমেলা পার্ক। ওয়ান্ডারল্যান্ড গ্রুপের মালিকানাধীন ওয়ান্ডারল্যান্ড পার্ক, ঢাকা ছিল বেসরকারি খাতের প্রথম বিনোদন পার্ক। বাংলাদেশে বিনোদন বা থিম পার্কের আধুনিক যুগের সূচনা হয় ২০০২ সালে ফ্যান্টাসি কিংডম থিম পার্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যা বাংলাদেশে থিম বা বিনোদন পার্কের ধারণাকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নন্দন পার্ক। চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে বিনোদন পার্কের সংখ্যা তিন শতাধিক-এ পৌঁছেছে। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য বিনোদন পার্কের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো:

বাংলাদেশের পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশে বিনোদন পার্কের ভূমিকা

বিনোদন পার্কের সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ এমিউজমেন্ট পার্ক এন্ড এট্রাকশন (বাপা)–এর তথ্য অনুযায়ী সারা বাংলাদেশে মোট ৩০০টির বেশি বিনোদন পার্ক রয়েছে। তার মধ্যে মাত্র একশতাধিক বিনোদন পার্ক বাপা'র সদস্যভুক্ত। বর্তমানে বিনোদন পার্কে প্রত্যক্ষভাবে মোট কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৬ লক্ষ যা ২০৩০ সালে এর সংখ্যা দাঁড়াবে ১০ লক্ষের বেশি। এসব পার্কগুলো ভ্যাট ও ট্যাক্স প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। বাংলাদেশে গত দুই দশকে এ খাতে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। বর্তমানে এ উপখাতের বার্ষিক টার্নওভার ৫০০০.০০ কোটি টাকা। বাপা সদস্যভুক্ত বিনোদন/থিম পার্কে ভিজিটর/পর্যটকের সংখ্যা বার্ষিক ৬ কোটি, যার মধ্যে বিদেশি পর্যটক রয়েছে প্রায় ৫০,০০০ জন। এই সেক্টরে প্রচুর নতুন নতুন উদ্যোক্তা বিনিয়োগ করছে বিধায় বিনোদন পার্ক শিল্প দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাপা'র তথ্য অনুযায়ী এসোসিয়েশনভুক্ত (একশতাধিক) এমিউজমেন্ট পার্কে গত ৮ বছরে (২০১৫-২০২২) প্রায় ৩১ কোটির বেশি দেশি-বিদেশি পর্যটক গমন করেছে, যার মধ্যে বিদেশি পর্যটক ছিল ২.৮৮ লক্ষেরও বেশি। সে হিসেবে দেশের সকল বিনোদন পার্কের পর্যটক গমনের সংখ্যা বহুগুণ বেশি। বছরভিত্তিক ভিজিটর/পর্যটক আগমনের তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো"

ক্রমিক নং	সাল	বার্ষিক ভিজিটর/ পর্যটক	বিদেশী পর্যটক
১	২০১৫	৪০,৭০৫,১৭৮	৩৬,২৩০
২	২০১৬	৪৪,০১০,০২৩	৪০,০৪৩
৩	২০১৭	৪৮,৫৮৯,৮৮৩	৪৩,৪৭৪
৪	২০১৮	৫২,৪৪২,৯৬৭	৪৭,৭৭২
৫	২০১৯	৫৭,৮১০,৩৮২	৫২,০৩২
৬	২০২০	১৪,৯৩৮,১০২	১৫,৯৭৩
৭	২০২১	৮,৩১২,৮২০	১৮,৫৩৯
৮	২০২২	৪১,৬৮৮,৬৯৮	৩৪,১৪৮
মোট ভিজিটর (৮ বছর)		৩০৮,৪৯৮,০৫৩	২৮৮,২১১

উৎস: বাপা (সদস্যভুক্ত পার্ক–এর তথ্য)

বাংলাদেশের বিনোদন পার্ককে পর্যটন আকর্ষণ/পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি

বিনোদন পার্ক বিশ্বব্যাপী অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে প্রথম থেকেই বিবেচিত হয়ে আসছে। কিন্তু বাংলাদেশে এর ইতিহাস স্বল্প দিনের। বাংলাদেশে ১৯৭৯ সালে এর অগ্রযাত্রা শুরু হলেও বিনোদন পার্ক একটি পর্যটন আকর্ষণ বা পণ্য হিসেবে পরিচিতি লাভ অনেক দেরিতে। ২০১৯ সালে করোনা মহামারি যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, তখন বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিশ্বের সকল পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান। ৮ই মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়। ২৬শে মার্চ থেকে দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণাসহ এবং বন্ধ করে দেওয়া হয় সমস্ত পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান, হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, বিনোদন কেন্দ্র, আকাশ, সড়ক, রেল ও নৌ-পথ। ফলে অন্য প্রতিষ্ঠানের মতো বিনোদন পার্কগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বিনোদন পার্কের এসোসিয়েশন বাপা'র তথ্য মোতাবেক ২০২০-২০২১ সালে করোনা মহামারির লকডাউন সময়কালে এই সেক্টরের মোট ১০ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে সকল সেক্টর খুলে দিলেও পর্যটন আকর্ষণসহ বিনোদন পার্কগুলো বন্ধ রাখা হয়। বাপা'র পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ শুরু করে। বিনোদন পার্কগুলো খুলে দেওয়ার বিষয়ে বাপা কর্তৃক প্রেরিত চিঠি বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) সুপারিশসহ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ মোতাবেক বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ২০২০ সালে পর্যটন

শিল্পের জন্য একটি অনুসরণীয় নির্দেশিকা (এসওপি) প্রস্তুত করে। এসওপি প্রস্তুতিতে অন্যান্য অংশীজনের পাশাপাশি বাপা'র সহায়তা নেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে এসওপি অনুসরণ করে পর্যটন শিল্প খুলে দেওয়ার সুপারিশের ভিত্তিতে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ ক্যাবিনেট ডিভিশন শর্ত সাপেক্ষে তা খুলে দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করে। তখন থেকেই বিনোদন পার্কের অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডসহ পর্যটনের উপখাত চিহ্নিতকরণে নিমিত্ত গঠিত কমিটির সুপারিশের আলোকে জাতীয় শিল্প নীতিমালা ২০২২-এর ১২ টি পর্যটন উপখাতের মধ্যে 'পর্যটন আকর্ষণ ও বিনোদন' ক্যাটাগরিতে 'বিনোদন পার্ক'কে পর্যটনশিল্পের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "পর্যটন মহাপরিকল্পনায়" বিনোদন পার্কের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য নানা পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয়েছে।

পর্যটনের বিকাশে বিনোদন পার্কের ভূমিকা

- বিনোদন পার্ক পর্যটন আকর্ষণগুলোতে অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিনিয়োগ, জিডিপি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দেশের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ পর্যটন আকর্ষণগুলোর টেকসই উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখে।
- বিনোদন পার্ক এবং এর আকর্ষণগুলি একটি পর্যটন গন্তব্যের চিত্র উন্নত ও দেশি-বিদেশি পর্যটক আগমনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে এবং স্থানীয় অধিবাসীর অর্থনৈতিক সুবিধা, শিক্ষা ও বিনোদনের সুযোগ প্রদান করতে পারে।
- বিদেশি পর্যটকদের দেশীয় সংস্কৃতির বিনিময়কে উৎসাহিত করতে পারে।
- পর্যটকদের শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে।
- আমাদের শহর ও আশেপাশের এলাকাগুলিকে বসবাস ও কাজের জন্য আরও আকর্ষণীয় করে তোলে এবং নরগরায়নে সহায়তা করে।
- এডভেঞ্চার ট্যুরিজম, ইকো-ট্যুরিজম, থিম বেজড প্রত্নতাত্ত্বিক ট্যুরিজম, মাইস ট্যুরিজম, ক্রীড়া পর্যটন, বিনোদন পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশ করে থাকে।
- দেশে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ শিল্পের বিকাশে সহায়তা করে। শিল্প ও কারুশিল্প স্যুভেনির এবং স্মারক হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে বিনোদন পার্ক উন্নয়নের সুপারিশ

- জাতীয় শিল্প নীতি ২০২২ অনুসারে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সেবা শিল্প হিসেবে পর্যটনের অন্যতম উপখাত বিনোদন পার্কের সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।
- বিনোদন পার্ক এবং থিম পার্কগুলিকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বিনোদন পার্কের জন্য বিভিন্ন রাইড এবং অন্যান্য সরঞ্জাম আমদানিতে শুল্ক সুবিধা প্রদান করা।
- কার্যকরী মূলধন নিরবচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান।
- বিনোদন পার্ক এবং থিম পার্কে বিদ্যমান ঋণের সুদের ছাড় অথবা রিসিডিউল করা।
- পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকল বিনোদন/থিম পার্ক এলাকায় ট্যুরিস্ট পুলিশ মোতায়েন।
- এই খাতে বিনিয়োগের জন্য সব ধরনের সহায়তা বৃদ্ধি করে নতুন বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা প্রদান করা। যেমন অবকাঠামো উন্নয়ন, সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন, ইউটিলিটি সার্ভিস, সরকারি এবং অব্যবহৃত জমির ইজারা প্রদান।
- স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে বিনোদন/থিম পার্কের ব্যান্ডিং করা।

- বাংলাদেশে নৈতিক/সামাজিক ব্যবসায়িক চর্চা নিশ্চিত করতে বিনোদন/থিম পার্ক মনিটর করা।
- এই শিল্পের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য বিনোদন/থিম পার্ক সম্পর্কিত সার্টিফিকেশন কোর্স, ডিপেণ্ঢামা কোর্স, শর্ট কোর্স, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা ইত্যাদি চালু করা।
- বিনোদন/থিম পার্ক কর্তৃপক্ষকে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য তথ্যের সহজলভ্যতা এবং সরকারি অফিসগুলোতে সেবা প্রাপ্তির জন্য সহজ অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা।
- থিম বা বিনোদন পার্কের অ্যাক্সেস রোডে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নত করা।
- স্থানীয় বা বিদেশি দর্শনার্থীদের বিনোদন বা থিম পার্কে নিয়ে যাওয়ার জন্য শহর এলাকা থেকে ট্যুরিস্ট বাসের প্রবর্তন করা।
- বিনোদন/থিম পার্ক সমর্থন করার জন্য স্থানীয় ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ শিল্পকে উৎসাহিত করুন।
- সম্মিলিতভাবে উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বিনোদন বা থিম পার্ক সহকর্মীদের মধ্যে জ্ঞান ও বেস্ট প্র্যাকটিস শেয়ার করার সংস্কৃতি তৈরি করা।
- বাপা'র সদস্য বৃদ্ধি করা এবং এর সদস্যদের আন্তর্জাতিক মেলা/বাণিজ্য শোতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া।
- বিনোদন পার্ক স্থাপন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং পর্যটক সেবা নিশ্চিতসহ উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য পৃথক নিবন্ধন আইন প্রণয়ন করা।
- প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশীপের অধীনে বিনোদন বা থিম পার্ক গড়ে তোলার জন্য বা বেসরকারি খাতে জমি ইজারা দেওয়ার জন্য সরকারি জমির সুবিধা প্রদান করা।
- বিদেশি বিনিয়োগকারীদের (যেমন চেইন পার্ক) বাংলাদেশে বিনোদন বা থিম পার্কে বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানানো।
- বাংলাদেশে বিনোদন বা থিম পার্কের অবকাঠামো উন্নয়নে নতুন বিনিয়োগকারীদের সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা।
- চতুর্থ শিল্প বিপণ্ঢব সফলতা অর্জনে বিনোদন পার্কে নতুন নতুন টেকনোলজি ও মেশিনারিজ স্থাপন করা।

বাংলাদেশে বিনোদন পার্কগুলোতে পর্যটকদের সংখ্যা দিন দিন যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় দেশি বিদেশি বিনিয়োগের প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডিজনিল্যান্ড, ইউনিভার্সাল স্টুডিও'র মতো বিশ্ব বিখ্যাত চেইন বিনোদন পার্ক বাংলাদেশে আগমন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ফলে বৃদ্ধি পাবে প্রতিযোগিতা। বিনোদন পার্কগুলোতে নতুন নতুন বিনোদনের উপকরণ, ইনভেশন, টেকনলজি ও সেবার মান উন্নত করতে পারলে দেশি বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে বিনোদন পার্কই হবে বাংলাদেশের পর্যটনের অন্যতম সেরা পর্যটন আকর্ষণ।

লেখক : উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড।

গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়ন

ওমর ফারুক

মালদ্বীপের লোক সংখ্যা মাত্র পাঁচ লাখ কিন্তু ভ্রমণকারীর সংখ্যা প্রায় প্রতি বছরে ১.৫ মিলিয়ন। তার মানে পনেরো লক্ষ। তাহলে তাদের বিশাল একটা আয় হচ্ছে এই খাত থেকে। আমাদের দেশেও এমন সুবিন্যস্ত সুললিত জায়গা অহরহ যা দিয়ে বিশ্ব পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পারবে। দেশের অগণিত ভ্রমণ প্রিয় জায়গার মধ্যে আমি কথা বলব চট্টগ্রামের বিখ্যাত উপজেলা "বাঁশখালী" সম্পর্কে। চট্টগ্রাম শহর থেকে শাহ আমানত সেতু হয়ে কর্ণফুলী ও আনোয়ারা'র ওপর দিয়ে আমাদের জনপদ বাঁশখালীতে আসতে হয়। প্রায় ৩৭৬ বর্গ কিলোমিটার আয়তন উপজেলাটির। চট্টগ্রাম মহানগর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

আমরাতো সবাই ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে চিনি। যিনি আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতো আরও অনেক অভিযাত্রী রয়েছেন। যারা বিভিন্ন সময়ে ভূখণ্ড আবিষ্কার করেছেন। আরও জানি আমরা ক্লাডিয়াস টলেমি, ইবনে সাঈদ ও আল ইদ্রিসি বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর অসংখ্য মানচিত্র তৈরি করেছেন। চিন্তা করছেন? আমি এই কথাটা কেন বললাম? তাইলে শুনুন, আমার মনে হয় কি বর্তমানে কোনো খ্যাতনামা কাউকে বাঁশখালীর মানচিত্র আঁকতে বললে কিংবা গবেষণা করতে বললে আমাদের জনপদ সম্পর্কে তাঁরা হতভম্ব হয়ে যাবেন।

পুরো দেশে এমন একটি উপজেলা খোঁজে পাওয়া সম্ভবত বিরল ঘটনা! কেননা, এই উপজেলায় রয়েছে অসংখ্য পর্যটন এলাকা কিংবা প্রাচীন স্থান। আনোয়ারা উপজেলা শেষ হয়ে ঢুকতেই আঁকাবাঁকা সাঙ্গু নদী। সাঙ্গুর উপরে আছে তৌরলদ্বীপ সেতু। সেতুর উপর দাঁড়িয়ে আপনি সবুজ তৃণভূমি উপভোগ করতে পারবেন। নদীর জল ও গ্রীষ্মকালে পাশের বিশাল বিশাল ফসল ও ফলের মাঠ উপভোগ করতে পারবেন। গরমের দিনে সেতুর এক প্রান্তে আপনি দৈত্যকার স্তূপ দেখবেন বিভিন্ন ফলের। তরমুজ, বাংগী, শশা ও মিষ্টি কুমড়ার পাহাড়। যা নদীর পাশেই চাষ করা হয়েছে।

আর একটু আসতেই পূর্ব দিকে সামান্য গেলেই দেখতে পাবেন দেশের আর একটা বিখ্যাত দ্রষ্টব্য স্থান চা বাগান। দেখে মনে হবে সিলেটের একটা টুকরো। পাহাড়িয়া চা'বাগানে আপনি উপভোগ করতে পারবেন চমৎকার একটা পরিবেশ। নানান সময়ে দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসে পার্টি করে উক্ত বনে। আর কিছু দূর এসে পশ্চিমে ঢুকলেই পাবেন "জলকদর" খাল। এবড়োখেবড়ো খাল বহু উপকারে আসে জনপদের। ফসলের মাঠে পানি সেচ দেওয়া। বোট ও ডিঙি নৌকা চলাচল করা। সর্বোপরি খাল থেকে মাছ ধরা এবং চোখে দেখে সুন্দরের নেশাও মিটানো যায় এই "জলকদর" খালে।

আপনি জানেন কি! দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর ঝুলন্ত সেতু আমাদের উপজেলায় অবস্থিত। আমাদের পাহাড় ঘেষা কৃত্রিম বাঁধের উপরে "ইকোপার্ক" দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ঝুলন্ত সেতু ঝুলছে। এই "ইকোপার্ক"-এ রয়েছে কংক্রিটের টাওয়ার। যার চূড়া থেকে আপনি সবুজ পাহাড় কৃত্রিম হ্রদ এবং দূরের সমুদ্র উপভোগ করতে পারবেন। স্পিড বোট ও নৌকা নিয়ে নগরের "ফয়েজলেকের" ভাব নিতে পারবেন আপনি। এটা যেন আর একটা "ফয়েজ লেক"। এই ইকোপার্ক দেখতেও দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসে অসংখ্য মানুষ।

আপনি কি এটা জানেন! দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত আমাদের বাঁশখালীতে অবস্থিত। কি! জানতেন নাতো! হুম। আমাদের উপজেলাতেই দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত রয়েছে। আহা! কি শান্তি! এক পাশে পাহাড় অন্য পাশে সমুদ্র। মাঝখানে জলকদর খাল। কিন্তু শেষ হয় নাইতো! নড়েচড়ে বসুন। আরো আছে।

আমাদের সমুদ্র সৈকতে বিভিন্ন পয়েন্ট রয়েছে। যেমন, কাথারিয়া পয়েন্ট, রত্নপুর পয়েন্ট, বাহারছড়া পয়েন্ট, প্রেমাশীয়া পয়েন্ট ইত্যাদি। আপনি সন্ধ্যার পরে ব্লকে বসে রঙবেরঙের বাতির সুদর্শন দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন। দূরের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর দেখতে পারবেন। চট্টগ্রাম বন্দরের সহস্র লাইটিং দেখে চোখের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারবেন। মাছ ধরার অজস্র বোট ও জাহাজ দেখতে পারবেন।

আপনি কি আরও একটা বিষয় জানেন! দেশের বেসরকারি খাতে মেগা প্রজেক্ট "কয়লাবিদ্যুৎ" অর্থাৎ "এসএস পাওয়ার প্ল্যান্ট" কেন্দ্র আমাদের উপজেলাতেই অবস্থিত। সুবিশাল মাঠ নিয়ে সুউচ্চ আকাশচুম্বী চুল্লিসহ দাঁড়িয়ে রয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকার বিদ্যুৎ কেন্দ্র। আপনি প্রতিদিন দেখবেন সেখানেও দর্শনার্থীর ভিড়। মানুষ জমায়েত হচ্ছে সেখানে। আপনি এক দিকে দেখবেন বিদ্যুৎ কেন্দ্র। পাশেই দেখবেন বঙ্গোপসাগরের সৌন্দর্য!

আমাদের উপজেলাতেই রয়েছে বড়ো বড়ো শুটকির মাঠ। লবণের মাঠ। লবণ বিখ্যাত একটা দ্রব্য। সেই লবণের দানব আকৃতির মাঠ রয়েছে আমার জনপদে। আরো রয়েছে চট্টগ্রামের সুপরিচিত শুটকি লবণের মাঠ ও শুটকির মাঠ মিশে একাকার হয়েছে। আরও রয়েছে পূর্বে সাতকানিয়া ঘেঁষে পাহাড়। পাহাড়ের উপর থেকে পড়া ঝরণা! বিশাল বিশাল গাছ। সকাল বেলা দেখবেন রাস্তার পাশেই সবজির বাজার। দেশের কাঁচা বাজারের একটা বড়ো অংশ উৎপাদন হয় আমাদের উপজেলাতে। লিচুর জন্যও বিখ্যাত আমাদের জনপদ। বাঁশখালীর লিচু বললে চট্টগ্রাম শহরে হইচই পড়ে যায়।

সংক্ষেপে যদি বলি! বাঁশখালীতে আনোয়ারা হয়ে ঢুকতেই রয়েছে "সাঙ্গু নদী"। সামান্য এগোলে পুকুরিয়া "চা বাগান"। যাকে আমরা ছোট্ট সিলেট বলে থাকি। আর একটু এসে পশ্চিম দিকে গেলে আঁকাবাঁকা "জলকদর খাল"। আরো পশ্চিমে রয়েছে "বঙ্গোপসাগর"। পূর্বে রয়েছে বিশাল বিশাল "পাহাড়"। মাঝখানে " ইকোপার্ক" ও "কৃত্রিম বাঁধ"। রয়েছে "লবণের মাঠ" ও "শুটকির মাঠ"। "তারেক পার্ক" সহ রয়েছে দেশের মেগা প্রজেক্ট "এসএস পাওয়ার প্ল্যান্ট"। ভাবুন তো একবার এতো সুন্দরের অবয়বে পরিপূর্ণ উপজেলা আর কোথাও আছে বলে মনে হয়?

আরো রয়েছে বহু পুরোনো কিংবা আদি আমলের বিভিন্ন স্থান ও ইমারত। তারমধ্যে আছে, "বখশী হামিদ মসজিদ (১৫৫৮)", "নিম কালীবাড়ী (১৭১০)", "জহুর চৌধুরী জামে মসজিদ (১৭৫০)", "শিখ মন্দির (বাণীগ্রাম)", "মনু মিয়াজি বাড়ি জামে মসজিদ", "জমিদার মনু মিয়াজি বাড়ি পুরোনো ভবন", "মালাকা বানুর দীঘি এবং মসজিদ" (এখানে চট্টগ্রামের লোক-কাহিনি মনু মিয়া-মালাকা বানুর নায়িকা-চরিত্র মালকা বানু চৌধুরীর জন্মস্থান।) "নবী মসজিদ" (অষ্টাদশ শতক)", "বৈলছড়ি খান বাহাদুর বাড়ি" এবং মহিষের টেক সবুজ বেস্টনি ইত্যাদি!

সাবেক সফল উপমন্ত্রী আলহাজ্ব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী, দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের প্রথম মেয়র আলহাজ্ব মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের জনপদেই জন্মগ্রহণ করেছেন। চট্টগ্রাম শহরের সরকারি সিটি কলেজসহ একাধিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষাবিদ ও লেখক প্রফেসর আসহাব উদ্দীন আমাদের উপজেলাতেই জন্মগ্রহণ করেন। উপমহাদেশের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিম আমাদের জনপদেই জন্মগ্রহণ করেন। মধ্য যুগের কবি নসরুল্লাহ খাঁ, অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র সিংহ যিনি সেই যুগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেছিলেন ইংরেজিতে। প্রফেসর ননী গোপাল দাশ একজন পরিসংখ্যানবিদ ও কলকাতা সেন্ট জেবিয়ার্স কলেজের প্রফেসর। সংগীত শিল্পী রবি চৌধুরীসহ আরো অনেক গুণিজনের এই উপজেলাতেই জন্ম।

দেশের বিশাল একটা আয়ের উৎস আসে আমাদের উপজেলা থেকে। আপনি সেটা লক্ষ করতে পারবেন যদি উপরের আলোকপাত করা বিষয় ও পর্যটন স্থানগুলো বিবেচনা করেন। যদি দেশের পর্যটন শিল্পের সুদৃষ্টি আমাদের জনপদে পড়ে তাহলে ভবিষ্যতে আরো বিশাল অঙ্কের টাকা আয় হবে আমার জন্মভূমি থেকে। শুধু দরকার সুষ্ঠু পরিকল্পনার। আর একটু সামান্য নজর দিলেই দেশের বিখ্যাত পর্যটন স্থান হিসেবে সুপরিচিতি লাভ

করবে আমাদের জনপদ। সুতরাং গ্রামীণ এই জনপদকে উন্নয়ন করে দেশকে একটা টুরিস্ট প্লেস উপহার দেওয়া সকলের দাবি। উত্তর-পূর্বে আনোয়ারা-চন্দনাইশ, পূর্বে সাতকানিয়া-লোহাগড়া, দক্ষিণে চকরিয়া-পেকুয়া এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর-কুতুবদিয়ার বেষ্টনীতে আবৃত রয়েছে আমাদের এই প্রিয় জনপদ।

কিছু খারাপ দিকও রয়েছে আমাদের জনপদের। চারপাঁচটি উপজেলার গাড়ি চলাচল করে পিএবি সড়কের উপর দিয়ে। সময়ে অসময়ে কক্সবাজারের গাড়িও চলে। কিন্তু যে পরিমাণ গাড়ি চলাচল সে পরিমাণ সড়ক প্রশস্ত নয়। সুতরাং এটির দিকে নজর দেওয়া উচিত সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের। এতো জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থান থাকার পরেও আশেপাশে রিসোর্ট কম। বড়ো মাপের হোটেল কিংবা রিসোর্ট স্থাপন করা সময়ের দাবি। যদি এই দুইটি দিক সরকার কিংবা কোনো বড়ো শিল্প কোম্পানি নজর দিয়ে সমস্যা সমাধান করতে পারে তাহলে দেশের একটা বড়ো দর্শনীয় স্থান হবে আমাদের জনপদ। যদিও অনেকবার সরকারি ও বিভিন্ন কোম্পানির কর্মচারীরা দেখে বুঝে শুনে গেছেন এই বিষয়ে। আশা করি সামনে কাজ শুরু হবে। ইনশাআল্লাহ!

লেখক : বর্তমানে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজ চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়ন করছেন

গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নে শাহজাদপুরের পর্যটনশিল্পের অমিত সম্ভাবনা ও পদক্ষেপ

সাদিয়া আরেফিন

বৈচিত্র্যময় শিল্প-সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ বাংলাদেশ। এ দেশের প্রাণ হলো এ দেশের গ্রামীণ সমাজ। কারণ গ্রামীণ সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, আচার-অনুষ্ঠান, ভাষা, সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকা প্রভৃতি। এমনকি দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ ভাগ জনগণ বসবাস করে গ্রামে। বলা যায় গ্রামীণ সমাজ জীবন হলো এ দেশের গর্ব। কারণ গ্রামীণ জীবনাচার এ দেশের ঐতিহ্যকে বহন করে। বিশেষ করে বর্তমানে গ্রাম জীবন, নিরিবিলি স্বচ্ছ পরিবেশ প্রভৃতি মানুষের কাছে ব্যাপক আগ্রহের বিষয়বস্তু। পাশাপশি পুঁজিবাদী এই যান্ত্রিক জীবনে অধিকাংশই দিনশেষে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে অথবা নির্জনতা উপভোগ করতে গ্রামীণ আবহাওয়ায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়। যার ফলে, গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্রগুলো ইদানীং ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশ পর্যটনশিল্পে একটি সমৃদ্ধ দেশ। Bangladesh Tourist Police–এর তথ্যমতে, দেশে ছোট-বড় প্রায় ৮শ'র বেশি পর্যটন স্থান এবং ৮-১০ প্রকারের পর্যটন রয়েছে। আয়তনের দিক দিয়ে এ দেশ ছোট হলেও, শিল্প ও সমৃদ্ধশীলতার দিক থেকে অনেক বৃহৎ। কারণ এদেশের নিসর্গ বহুমাত্রিক। এরূপ বহুমাত্রিক প্রাকৃতিক নিসর্গের লীলাভূমির প্রতীক হিসেবে পরিচিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদচারণভূমি শাহজাদপুর। এটি বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলার একটি সমৃদ্ধ উপজেলা। জলাশয় যমুনা, হুরাসাগর, করতোয়া, বড়াল, গোহালা নদী, পানাদহ বিলসহ অসংখ্য খাল বিল এ উপজেলারউপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পাশাপাশি তাঁত ও দুগ্ধ শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, এ অঞ্চলের ভিন্ন পরিচয় বহন করে। শাহজাদপুরের বিশেষত্ব হলো এটি বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন গ্রীষ্মে খাঁ খাঁ রোদ্দুরে যে মৃত্তিকায় ফাটল ধরতে দেখা যায়, ঠিক বর্ষা কিংবা শীতকালে তার উল্টো চিত্র নজরে পড়ে। উল্লেখযোগ্য হলো এ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানই বছরের প্রায় ৩-৪ মাস পানিতে প্লাবিত থাকে। ফলে এ অঞ্চলটি দ্বীপাঞ্চলের মতো দেখা যায়। অর্থাৎ বাসগৃহ, কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার প্রভৃতি অবকাঠামো দেখে মনে হবে যেন এক ভাসমান রাজ্য। এমন সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে প্রতিবছর জুনের শেষ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আশেপাশের অঞ্চলের দর্শনার্থীদের আনাগোনা দেখা যায়। কিন্তু সুপরিকল্পিত টেকসই পর্যটন ব্যবস্থা না থাকার ফলে যথার্থ মূল্যায়ন পাচ্ছে না অপার সম্ভাবনাময় শাহজাদপুর। এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্রের আগামী দিনের অন্যতম উদাহরণ হতে পারে এই শাহজাদপুর। কেননা এখানে একাধিক প্রকারের পর্যটনের সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে এখানে রিলিজিয়াস ও হেরিটেজ পর্যটনের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। পাশাপাশি SDG–এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সবুজ বিনিয়োগসম্পন্ন নতুন সম্ভাবনাময় পর্যটনগুলো: ব্যাকওয়াটার ট্যুরিজম রিভার ট্যুরিজম, বোট ট্যুরিজম, কমিউনিটি ট্যুরিজম, খাবার ট্যুরিজম প্রভৃতি। এই স্মরণিকায় শাহজাদপুরের প্রেক্ষাপটে ব্যাকওয়াটার ও কমিউনিটি ট্যুরিজমের নতুন সম্ভাবনা হিসেবে এর যথার্থতা ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হবে।

ব্যাকওয়াটার ট্যুরিজম ও শাহজাদপুর

ব্যাকওয়াটার হলো বৃহৎ কোনো জলাশয়ের একটি অংশ যেখানে জলের প্রবাহ অনেক কম থাকে। ব্যাকওয়াটার মূলত প্রধান নদীর শাখা নদী হিসেবে বের হয়ে এর পাশাপাশি আলাদাভাবে বয়ে চলে এবং পরে আবার মূল নদীর সঙ্গে মিলে যায়। এছাড়াও যেকোনো সমতল বা স্থির জলের স্থানকেও ব্যাকওয়াটার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ এটি সবসময় প্রধান নদীর অংশ নাও হতে পারে। সাম্প্রতিক বন্যা বা অস্থায়ী বাঁধের কারণেও তৈরি

হতে পারে ব্যাকওয়াটার। অপরদিকে, ট্যুরিজম বলতে মূলত এক ধরনের আনন্দলাভ কিংবা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ভ্রমণকে বোঝায়। মূলত স্থির জলাশয় বা কম প্রবাহ সম্পন্ন জলরাশিভিত্তিক পর্যটনকে ব্যাকওয়াটার পর্যটন বলে। ভারতের কেরালা, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, শ্রীলংকা প্রভৃতি অঞ্চল এই পর্যটনের জন্য সুপরিচিত। বাংলাদেশে বরিশালের ভাসমান পেয়ারা বাজারও ব্যাকওয়াটার পর্যটনের জন্য বিখ্যাত। উল্লিখিত স্থানগুলোর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নদীবিধৌত শাহজাদপুরের অনেকাংশে মিল পাওয়া যায়। যেমন আমরা যদি লক্ষ করি তাহলে দেখা যায়, শাহজাদপুরের মধ্য দিয়ে পদ্মার শাখা নদী বড়াল, যমুনার উপনদী করতোয়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে হুরাসাগরে পড়েছে। যার ফলে এই অঞ্চলে অসংখ্য ছোট-বড় খাল-বিল দেখা যায়। পাশাপাশি নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে বিভিন্ন জায়গায় কম স্রোতবিশিষ্ট জলাশয়ও দৃশ্যমান। ফলে বর্ষাকালে এ অঞ্চলের যোগাযোগের সহজ ও সুলভ মাধ্যম হয় নৌকা। পানিবিধৌত এলাকাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পোতাজিয়া, কৈজুরী, রেশমবাড়ি, রাউতারা, চৌচির, সোনাতনী, খুকনী প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাকওয়াটার পর্যটন গড়ে উঠার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে এ অঞ্চলগুলো দুগ্ধ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। খাঁটি দুধের ব্যাপক চাহিদার ফলে দুগ্ধ কারখানাসহ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন রয়েছে।

চৌচির বিল, পোতাজিয়া

রেশমবাড়ি বিল, পোতাজিয়া

ছবি: ইন্টারনেট

গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের প্রভাবে পরিবেশ তার স্বাভাবিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে তা নতুন কিছু নয়। তাই পরিবেশের এরূপ অস্বাভাবিক ভারসাম্যকে বজায় রাখতে হলে প্রয়োজন সবুজ বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশকে সবুজ অর্থনীতি দেশে পরিণত করা। এদিক থেকে যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে শাহজাদপুর ইতিমধ্যে সবুজ বিনিয়োগের এলাকা। এরূপ জায়গায় যদি টেকসই পরিকল্পনামাফিক পর্যটন গড়ে তোলা যায় তাহলে এক ঢিলে একাধিক কিছু শিকার করা সম্ভব। সবুজ বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন মূলধন সৃষ্টি করতে ভূমিকা রাখতে পারে সম্ভাবনাময় ব্যাকওয়াটার পর্যটন। পাশাপাশি গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নেও এটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। যেমন স্থানীয়দের অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের জায়গা তৈরি হবে। ফলে বেকারত্ব দূরীকরণে রাজধানী শহরে পাড়ি জমাতে হবে না। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ব্যাকওয়াটার পর্যটনের জন্য জলের পাশাপাশি অধিক সংখ্যক নৌকার প্রয়োজন। যেমন: চৌচির বিল থেকে রেশমবাড়ি বিল অথবা রাউতারা বাঁধ এলাকায় যেতে হলে নৌকা মাধ্যমে যেতে হবে। এক্ষেত্রে ট্যুরিস্টদের জন্য আলাদা বোটের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা যদি ভারতের কাশ্মীরের দিকে তাকাই, তাহলে সেখানে ট্যুরিস্ট নৌকা নামেই আলাদা নৌকা রয়েছে। যেটি দেখতে আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। পাশাপাশি ট্যুরিস্ট নৌকাতে স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী খাবার কিংবা হস্তশিল্পের পণ্য প্রদর্শন তথা বিক্রয়ের জন্য রাখা যেতে পারে। কেননা বাইরে থেকে আসা ট্যুরিস্টরা ভ্রমণের পাশাপাশি স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে স্থানীয় পণ্য কিনতে পছন্দও করে।

রাউতারা বাঁধ এলাকা, শাহজাদপুর

রাউতারা বিল

ব্যাকওয়াটার পর্যটনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ

শাহজাদপুরে ব্যাকওয়াটার পর্যটন ধারণাটি একেবারেই নতুন। তবে বাংলাদেশে এটি কোনো নতুন বিষয় নয়। কেননা ইতিমধ্যে এরূপ পর্যটন আমরা বরিশাল অঞ্চলে দেখতে পাই। তাই বরিশালসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে প্রচলিত ব্যাকওয়াটার পর্যটন সম্বন্ধে ভালোভাবে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের কেরালার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ইতিবাচক প্রভাবের ফলে পর্যটন প্রসারতা লাভ করেছে এবং প্রতিবছর উক্ত পর্যটন থেকে বহু মুনাফা অর্জন হয়। বাংলাদেশের ভাসমান পেয়ারা বাজার পর্যটনটিও ব্যাকওয়াটার পর্যটনের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বের তুলনায় এই স্থানটির জনপ্রিয়তা বিকশিত হয়েছে। শাহজাদপুরে হয়তো বরিশালের মতো পেয়ারা বাগান নেই তবে গরুর দুধের রাজ্য রয়েছে। যেটিকে কেন্দ্র করে মিষ্টি-মন্ডা, ক্ষীর, পনির, ঘি, মাঠা-ঘোল প্রভৃতির হাট গড়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ পর্যটকরা একইসঙ্গে জলকেন্দ্রিক পর্যটনের পাশাপাশি খাবারকেন্দ্রিক পর্যটনের সুবিধা পাবেন। আরেকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, দেশে ও আন্তর্জাতিকভাবে এই পর্যটনকে বিকশিত করতে চাইলে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন নিরাপদ গ্রামীণ সড়ক পথ নিশ্চিত করা। শাহজাদপুরের অধিকাংশ গ্রামের চলাচলের সড়ক অ-মজবুত হওয়ায় স্থানীয় পর্যটকদের নানান ভোগান্তিতে পড়তে হয়। এরূপ পর্যটন পদক্ষেপ তখনই কার্যকর হবে যখন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কিংবা সরকারের কর্তৃপক্ষ শাহজাদপুরকে বিশেষ বিবেচনায় নজরে রাখবেন। পাশাপাশি স্থানীয়দের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

কমিউনিটি ট্যুরিজম ও শাহজাদপুর

কমিউনিটি ট্যুরিজমকে উপস্থাপন করতে হলে পূর্বে এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। এটি মূলত এক ধরনের পর্যটন যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে ভ্রমণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সরাসরি সুযোগ করে দেয়। এটা একটি টেকসই পর্যটন চর্চা যা স্থানীয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে সহায়তা করে। পরিবেশবান্ধব পর্যটন পদ্ধতিকে অনুসরণ করে পরিচালিত হয় এটি। হোমস্টে, গাইডেড ট্যুর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আউটডোর বিনোদন প্রভৃতি হলো কমিউনিটি ট্যুরিজম পরিচালিত অনেকগুলো কর্মসূচির মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ। অর্থাৎ যে কমিউনিটিকে কেন্দ্র করে পর্যটন গড়ে তোলা হবে মূলত সেই কমিউনিটির সংস্কৃতি ও জীবন-জীবিকার চিত্র প্রদর্শিত করাই হলো এরূপ পর্যটনের বৈশিষ্ট্য। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, এই অঞ্চলে ব্যাপক সংখ্যক জোলা বা তাঁতি সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। যারা এই অঞ্চলের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখেছে তাঁতশিল্পের মাধ্যমে। তাঁত বুনার পাশাপাশি তাদের নিজস্ব সংগীতও রয়েছে। যেগুলোকে মেহনত কালের সংগীত বলা হয়। কর্মের সময় শারীরিক শ্রম লাঘবের উদ্দেশ্যে তাঁতিরা গীত গেয়ে থাকে। যেমন:

তাঁতঘরে আমার গ্যালি যে য্যবন
ওরে তুরা মন দিয়া কোনো

চেকন নলী মোটা ক্যারি
যুগ্যালীরা আইজ ন্যলি ভরে
মাকুতে ঢোকে না নলী ...।।

বাথান এলাকার বাসস্থান

শাহজাদপুরের তাঁত

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কালের বিবর্তনে তাঁতশিল্পের অবস্থা পূর্বের মতো না থাকায় তাদের জৌলুস বিলুপ্তের পথে। বিলুপ্তের পথে হারিয়ে যাওয়া এই সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনতে নতুন সম্ভাবনার পথ হতে পারে কমিউনিটি ট্যুরিজম। সংস্কৃতি উদ্ধারের পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব প্রদানে ভূমিকা রাখতে পারে। তাঁত শিল্পের কারখানা, তাঁতের হাট, তাঁতিদের সংগীত, তাদের খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি পর্যটকদের আকৃষ্টকরণের বিষয় হতে পারে। তাঁতিদের পাশাপাশি বাথান অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকেন্দ্রিক পর্যটন হতে পারে। বছরের ৩-৪ মাস পানিতে প্লাবিত থাকার কারণে এই অঞ্চলের মানুষের জীবনাচার বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। পাশাপাশি অঞ্চলটি গরুর জন্য বিখ্যাত হওয়ায় দুগ্ধ শিল্পের আলাদা চাহিদা রয়েছে। বর্ষায় অঞ্চলটি দ্বীপাঞ্চলে পরিণত হওয়ায় আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এমন মৌসুমে যে কারো ইচ্ছে করবে এক দুই রাত অবস্থান করতে অথবা ভোরের স্বচ্ছ হাওয়া কিংবা সুর্যাস্ত/সুর্যোদয় অনুভব করতে। এক্ষেত্রে কমিউনিটি ট্যুরিজম অন্যতম উপায় হতে পারে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও শাহজাদপুরের পর্যটনশিল্প

বর্তমান উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো টেকসই উন্নয়ন ও সবুজ বিনিয়োগ করে সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তর করা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে দেশের বিভিন্ন প্রকারের পর্যটন শিল্প। শাহজাদপুরের পর্যটন শিল্পগুলোকে যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে সবুজ অর্থনীতির পাশাপাশি তা SDG লক্ষ্য পূরণে বিরাট অবদান রাখতে পারে। অর্থাৎ অবহেলিত শিল্পগুলো পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি তা রক্ষা পাবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় বহুজাতিক উন্নয়ন সংস্থা বা ব্যক্তি এর দায়িত্ব নিতে পারে। অর্থাৎ শাহজাদপুরে ব্যাকওয়াটার কিংবা কমিউনিটি ট্যুরিজম স্থাপিত হলে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এর সঙ্গে ট্যুরিস্ট ও কর্মীদের খাদ্যতালিকায় শাহজাদপুরের বাথান অঞ্চলের গরুর খাটি দুধের ঘোল, মাঠা, ঘি, ছানার মিষ্টি প্রভৃতি খাদ্যতালিকায় যুক্ত হবে। ফলে খাবার সংস্কৃতি রক্ষার পাশাপাশি এই অঞ্চলের খাবারের পরিচিতি আলাদাভাবে জনপ্রিয় হবে ও বিদেশে রপ্তানি হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। আর এভাবেই তাঁতশিল্পে বিখ্যাত শাহজাদপুর অঞ্চল দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য পূরণে বিরাট অবদান রাখতে পারে।

উপসংহার

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে এদেশকে টিকে থাকতে হলে এদেশের অর্থনীতিকে আরও মজবুত করতে পর্যটন খাতের ভূমিকা অপরিসীম। ইতিমধ্যে, ২০২২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের পর্যটন খাতে আয় প্রায় ৭৬ দশমিক ১৯ মিলিয়ন ডলার। সবুজ বিনিয়োগের পাশাপাশি সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করতে বাংলাদেশের গ্রামগুলো হতে পারে এক একটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি। যা গ্রামীণ উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের টেকসই উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

লেখক : শিক্ষার্থী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়ন

নুসরাত জাহান

নগরালয়ে নিরবচ্ছিন্ন ছুটে চলার ক্লান্তি অথবা শিল্পায়নের যান্ত্রিকতা থেকে একটু ছুটি নিয়ে আড়াল হওয়ার কথা ভাবলেই যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে গ্রাম-বাংলার অপার সবুজ, পাখির কলতান, পুকুরে হাঁসের জলকেলি, অবিরত হিল্লোলে উদ্ভাসিত অবারিত ফসলের মাঠ। এই সকল চাওয়াকে পাওয়ায় রূপান্তরের মাঝেই নিহিত রয়েছে গ্রামীণ পর্যটনের বীজ। কর্ম ব্যস্ততার তাগিদে বর্তমানে মানুষ শহরমুখী হলেও বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এখনো গ্রামে বসবাস করে। দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজন গ্রামে বসবাস করা এই বিরাট অংশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। গ্রামের বসবাসকৃত এই জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়ন। গ্রামই হবে পর্যটন শিল্পের প্রাণকেন্দ্র আর গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষের সহজ-সরল জীবনযাত্রা, গাছ, বিভিন্ন পাখি, নদী, হাওর, বিল, ঝিল, বিভিন্ন ধরনের লোকজ অনুষ্ঠান, গ্রামীণ পেশা, খেলাধুলা, প্রাচীন বৃক্ষ এসবই মেটাবে পর্যটকদের মনের খোরাক।

গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নে তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা জরুরি– উপস্থাপন, ব্যবস্থাপনা এবং প্রচার। বাংলাদেশের গ্রামগুলো হতে পারে পর্যটন আকর্ষণের অপার সম্ভাবনাময়। বাংলাদেশের ৮৬ হাজার গ্রামবাংলা ৮৬ হাজার পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্র, কারণ একটি গ্রাম থেকে আরেকটি গ্রাম আলাদা। কোনো কোনো গ্রাম নদীকেন্দ্রিক, পাহাড়কেন্দ্রিক, হাওরকেন্দ্রিক, বিলকেন্দ্রিক। আবার প্রতিটি গ্রামই একটি অন্যটি থেকে অনন্য। গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নে প্রয়োজন এই বৈচিত্র্যসমূহকেই অনন্য আকারে উপস্থাপন। বিভিন্ন ঋতুতে গ্রামে পাওয়া যায় বিভিন্ন রকম আবহ। গ্রামে গ্রীষ্ম আসে ফলের ঝুড়ি, বর্ষায় চারপাশ থাকে জলে টুইটুম্বুর আর ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ। শরৎ নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা নিয়ে এসে সকলের মনকে স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দেয়। ঘরে ঘরে ফসল তোলার দৃশ্য দেখা যায় হেমন্তে। নবান্ন শেষে শীতে ঠকঠকে কেঁপে খেজুর রসে আর পিঠাপুলির সমারোহে মন ভরে ওঠে। বসন্তে গাছে গাছে কচি পাতা আর কোকিলের কুহুতান সবাইকে বিমোহিত করে। এই ষড়ঋতুভিত্তিক বৈচিত্র্য ঘিরে গড়ে উঠতে পারে গ্রামীণ পর্যটন। গ্রামীণ জীবনযাত্রা, আবার যেসব জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রয়েছে, তাদের দূরে রেখে পর্যটন উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রতিটি জাতিসত্তারই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণ রয়েছে। এখানে পর্যটন উন্নয়ন করতে হলে স্থানীয় যে কয়টি জাতিসত্তা রয়েছে, তাদেরই পর্যটন সম্পদের মালিকানা প্রদান ও মালিকানাবোধ (সেন্স অফ ওনারশিপ) জাগ্রত করতে হবে এবং গুরুত্ব দিতে হবে। অপরপক্ষে, আমাদের গ্রামীণ ঐতিহ্যগুলো যেমন– গ্রাম্য সমাজব্যবস্থা, কৃষি জমির চিরায়ত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, মাছ ধরা, চিরায়ত লোকসংগীত, দেশীয় খাবার প্রস্তুতি– চিড়া, মুড়ি, খৈ, খেজুরের পায়েস, মাঠা ইত্যাদিকে শৈল্পিক উপায়ে প্রদর্শন করা যেতে পারে পর্যটকের সামনে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, গ্রামের চিরায়ত রূপ তুলে ধরতে গিয়ে যেন কৃত্তিমতা চলে না আসে অর্থাৎ গ্রামকে যেন শহুরে আবেশে না মোড়ানো হয়। কৃষি পর্যটনের মাধ্যমে গ্রামবাংলার স্বকীয় কৃষিখামার ও জমির চাষাবাদ পদ্ধতি, ফসল কাটার দৃশ্য, সেচ প্রণালি, ফসল তোলা, গ্রামীণ মহিলাদের ধান শুকানো, ধান উড়ানো এবং ধান ভানার দৃশ্য ইত্যাদি উপস্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়া ইকো-ট্যুরিজম হতে পারে গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি, নদী-নালা, খাল-বিল এবং দেশীয় মাছ, পশু, পাখিসহ নানা প্রজাতির জীববৈচিত্র্য নিয়ে। গ্রামাঞ্চলের অবারিত সবুজের সমারোহ মুগ্ধতা ছড়ায়। এই মুগ্ধতার কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে গ্রামীণ পর্যটন কারণ গ্রিন ট্যুরিজমের সব উপাদানই বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান। লোকসংগীত, লোক নৃত্যসহ নানা ধরনের লোকজ আচার ও উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র আমাদের গ্রাম বাংলা। গ্রামীণ মেলা, গ্রামীণ

উৎসব, আঞ্চলিক গান যেমন কুষ্টিয়ার লালন সংগীত, ময়মনসিংহের ঘাটু গান, রংপুরের ভাওয়াইয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জের গম্ভীরা সংগত কারণেই পর্যটকদেরকে ঐ অঞ্চলের গ্রামগুলিতে আকৃষ্ট করবে। গ্রামে ছড়িয়ে আছে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা যা সংরক্ষণ ও সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ঐতিহ্য পর্যটনকে সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় করা যেতে পারে। বাংলাদেশের অন্যতম গ্রামীণ ঐতিহ্য নৌকা বাইচকে বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডিং করা গেলে অনায়াসে বিদেশি পর্যটক আকর্ষিত হবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গাথা দেশে-বিদেশে সকল স্তরের পর্যটকের মনে শ্রদ্ধার আসন দখল করে আছে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন, বধ্যভূমি ইত্যাদি যে সকল গ্রামে রয়েছে সেগুলোকে সংরক্ষণ করে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা গেলে নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যটনের মাধ্যমে নতুন আঙ্গিকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা যাবে এবং বিদেশি পর্যটক ও গবেষকদের জন্য জ্ঞান আহরণের নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে।

গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নকে দীর্ঘমেয়াদি করার জন্য প্রয়োজন কার্যকরী ব্যবস্থাপনা। পরিবেশকে ক্ষতি করে যেমন গ্রামীণ পর্যটন সম্ভব নয়। আবার শুধু পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করলেও পর্যটনের উন্নয়ন হবে না। রেসপন্সিবল ট্যুরিজমের মাধ্যমে বিষয়টিকে এগিয়ে নিতে হবে যেন স্বাভাবিক ইকো-সিস্টেম ব্যাহত না হয়। পর্যটক ও স্থানীয় জনগণ উভয়ের জন্যই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার পাশাপাশি পর্যটকদের আবাসন সুবিধার দিকেও অধিক মনোযোগী হতে হবে। গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়ন করতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ সরকারের বিনা সুদে কিংবা সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে হবে। যেমন গ্রামের একজন লোক পিঠা, পায়েস বা দই তৈরি করে বাজারে কিংবা পর্যটকদের কাছে বিক্রি করতে চাইলে তার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো, এসব পণ্য স্বাস্থ্যসম্মত করা এবং আরও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরার জন্য অর্থের প্রয়োজন। সহজ শর্তে বা বিনা সুদে ঋণ তাকে নিশ্চয়ই আরও গতিশীল এবং সত্যিকারের টেকসই উন্নয়নের দিকে ধাবিত করবে।

গ্রামীণ পর্যটনের উন্নয়ন হলে পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ এবং অনেক ধরনের ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে। যেমন- চিড়া-মুড়ি-খই-দই প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা, পিঠা-পায়েস-মোয়া প্রস্তুতকারক, হস্তশিল্প (বাঁশ, বেত, হোগলা) প্রস্তুত ও বিপণনকারী ইত্যাদি। এদের টিকিয়ে রাখার জন্য সহজ শর্তে সরকারি ঋণের প্রয়োজন। আবার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষার ট্যুর গাইড, পাচক তৈরি করা যেতে পারে। ছোট ছোট পর্যটন উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে সরকারিভাবে ঋণও দেওয়া যেতে পারে। গ্রামীণ পর্যটনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলে শহরমূখী হওয়ার প্রবণতাও কমে যাবে। এর ফলে, অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হবে। পর্যটন সেবাপণ্য উৎপাদন ও মানসম্মত সাংস্কৃতিক পণ্যায়ন গ্রামের জিডিপিতে উৎকর্ষী অবদান রাখবে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের সহায়ক হবে। আশার আলো এই যে, "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"–এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদে পৌঁছে গেছে উন্নয়নের আলো, জনপদে লেগেছে ডিজিটালাইজেশনের ছোঁয়া।

প্রচারেই প্রসার। গ্রামীণ জীবনযাত্রা অথবা গ্রামীণ কর্মকাণ্ডকে শুধু পর্যটন উপযোগী করলেই হবে না, এই পর্যটন উন্নয়নে সকল পক্ষ লাভবান হতে প্রয়োজন ব্যাপক প্রচার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে প্রচারণা যেমন জরুরি, ঠিক তেমনই প্রয়োজন প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সরব প্রচার। এই বিষয়ে স্থানীয় এবং জেলা পর্যায়ে জনসংযোগ এবং সচেতনতার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। অবসরযাপনে গ্রামীণ জীবনের ইতিবাচক মহিমা উপস্থাপন করতে হবে সর্বস্তরে। দেশি এবং বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে প্রচারণার পাশাপাশি বহুল জনপ্রিয় ট্যুর গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ বা লিয়াজোঁ রাখা প্রয়োজন। সবুজের প্রাণচাঞ্চল্য অনেক বরফাচ্ছন্ন দেশের পর্যটককে আন্দোলিত করে। অনেক স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশের লোক বাংলাদেশের আবহমান সবুজ-শ্যামল গ্রামীণ জনপদকে ভালোবাসেন। শুধু ভালোবাসেন না, দেখতেও আসেন। বিভিন্ন বিদেশি পর্যটক তাদের অবসরযাপনের জন্য গ্রাম বেছে নেন। একইসঙ্গে, এ দেশের সমুদ্র-পাহাড়ে সময় কাটাতে আসা বিদেশি পর্যটকও অবলোকন করতে পারে গ্রামীণ

সৌন্দর্য। এতে গুটিকয়েক ভ্রমণ ডেস্টিনেশনের উপর চাপও কমবে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন হতে ১৯৯০ সালে 'ওয়ান ভিলেজ ওয়ান ডেস্টিনেশন' নামে প্রচারাভিযান চালানো হয়েছিল। সেই প্রচারাভিযানের আলোকে 'একটি গ্রাম একটি পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্র' হিসেবে আমরা বিদেশি পর্যটকদের কাছে আমাদের গ্রামগুলোকে প্রচার করতে পারি। প্রচারের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে কীভাবে গ্রামীণ পর্যটনকে আরও সমৃদ্ধ করা যেতে পারে এ বিষয়ে সর্বস্তরের জনগণ নিয়ে মত-বিনিময় সভার আয়োজন করা যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য পরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত পর্যটন উন্নয়নের প্রয়োজন। একইসঙ্গে, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার একান্ত জরুরি। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন ও পর্যটক সবার দায়িত্ব পর্যটন উন্নয়নের পাশাপাশি পর্যটন আকর্ষণগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা। সরকার ও সকল উপকারীভোগী পক্ষ একযোগে কাজ করলে এবং গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণের দিকে যথাযথ নজর দিলে ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জন করা সম্ভব হবে।

লেখক : উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

নিরাপত্তা-পরিচ্ছন্নে, সুফল আনে পর্যটনে

শরদিন্দু শেখর রায়

বেড়ানোকে আমাদের দেশের মানুষ আর বিলাসিতা মনে করে না। বিনোদনের জন্য আমরা এখন খরচকে আর অযথা মনে করি না। আমাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন এসেছে। এখন নিয়ম করে এদেশের মানুষ পরিবার কিংবা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল থেকেও দল বেঁধে সবাই শিক্ষা সফর বা আনন্দভ্রমণ করে। নিত্যদিনের জীবনে শরীর, স্বাস্থ্য, মনকে উদ্দীপ্ত রাখতে বেড়ানো যে ওষুধের মতো, তা এখন মানুষ বিশ্বাস করে। যারা বেড়াতে ইচ্ছুক, তারা আগেই কিছু পরিকল্পনা করে। কেমন জায়গায় যাবে, কোনো জায়গায় যাবে, কতদিন থাকবে, কীভাবে যাবে, কী কী দেখবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ কেউ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশে যায়। আবার বিদেশিরাও আমাদের দেশ ভ্রমণে আসে। বেড়ানো বা ভ্রমণে মানুষ দু'টো বিষয়কে খুব গুরুত্ব দেয়। তা হলো তাঁর বেড়ানোর জায়গাটা কতটা নিরাপদ এবং জায়গাটা কতটা পর্যটনবান্ধব, পরিচ্ছন্ন ও নান্দনিক।

মানুষের মন বড় বিচিত্র। কেউ প্রাকৃতিক নৈসর্গকে উপভোগ করতে পাহাড়-পর্বত, সাগর-সমুদ্র, দ্বীপ-দ্বীপান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কেউ ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রাচীন নগর কিংবা সভ্যতার খোঁজে দিনের পর দিন পৃথিবী চষে বেড়ায়। আজকাল আমাদের দেশে বেড়ানোর জন্য নানা জায়গায় বড় বড় পার্ক, উদ্যান, রিসোর্ট তৈরি হয়েছে। শুধু বেড়ানোর জন্য তৈরি এসব বিনোদন কেন্দ্রও মানুষের খুব পছন্দের জায়গা।

দেশের বেড়ানোর জায়গাগুলো আমি ঘুরে দেখার চেষ্টা করেছি। দু' একবার বিদেশেও বেড়ানোর সুযোগ হয়েছে। তবে বিদেশে যে কয়বার বেড়াতে গিয়েছি, আমার হৃদয়পটে ভেসে উঠেছে নিজ দেশের অপরূপ জায়গাগুলোর কথা। চোখ বুঁজে দেখতে পেয়েছি, প্রকৃতির দু'হাত ভরে সাজিয়ে তোলা আমাদের অপরূপ সুন্দরবনকে, আমাদের পাহাড়ের রানি বান্দরবানকে কিংবা আমাদের হ্রদ-পাহাড়ের মিতালিতে আঁকা রাঙামাটিকে। তারুণ্যের উদ্যম কক্সবাজার আর সেন্টমার্টিন আমার মানসপটে উঁকি দিয়েছে। বর্ষার রানি সিলেট আর চির সবুজ শ্রীমঙ্গলকে আমি গভীরভাবে অনুভব করেছি।

আমাদের দেশ এখন পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো দেশ। প্রকৃতির অকৃপণ দানে আমরা সমৃদ্ধ। সারা বিশ্বের মানুষ এখন আমাদেরকে চেনে উদার, সহনশীল আর বন্ধুবৎসল জাতি হিসেবে। আমাদের আতিথেয়তা বিশ্ববাসীর কাছে সমাদৃত। তাহলে আমরা কেন পারি না, আমাদের দেশকে বিশ্বের দরবারে পর্যটনবান্ধব দেশ হিসেবে সুপরিচিত করতে! প্রকৃতির এই লীলাভূমিকে আমরা কেন পারিনা সাজিয়ে গুছিয়ে নিরাপদ আর পরিচ্ছন্ন একটা বেড়ানোর দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে! আমরা কেন চেষ্টা করি না, আমাদের আনাচ-কানাচকে এমনভাবে গড়তে, যার আকর্ষণে দেশি-বিদেশি পর্যটকে মুখর থাকবে দেশের আঙিনা!

একটা দ্বীপে জাহাজ থেকে নেমে এগিয়ে যাচ্ছি। এসময় আমাদের ছোট্ট বন্ধুটি একটা খালি পানির বোতল সমুদ্রে ফেলেছে। কোত্থেকে মুহূর্তেই ছুটে এলো ট্যুরিস্ট পুলিশ। ছোট মানুষের দোহাই দিয়ে, বিদেশি পর্যটক পরিচয় দিয়ে, অনুনয়-বিনয় আর অনুরোধ করে আমরা সে যাত্রায় জরিমানার হাত থেকে বাঁচলাম। অবাক হয়ে দেখলাম, আশপাশের পরিচ্ছন্নতা। যতদূর চোখ যায়, সুন্দর, সাজানো-গোছানো দ্বীপের সমুদ্র তীর আর নীল জলরাশি। সেদিনই আবার বিকেল বেলা। আমরা হাঁটতে হাঁটতে সৈকতের দিকে এগুচ্ছি। আমি রাস্তার পাশের দোকান থেকে এক কাপ কফি কিনলাম। খাওয়া শেষ করে খালি কাপটা যেই না রাস্তার ফেলেছি, অমনি পাশের এক

দোকানদার এগিয়ে এলো ঝড়ের বেগে। আমি কেন খালি কাপ নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ফেললাম না? ফেলে দেওয়া খালি কাপটি তুলে ডাস্টবিনে রাখার পর দোকানদার ফিরে গেলো। ঐ ভ্রমণের এই দুটো ঘটনায় আমি আবিষ্কার করলাম, বেড়ানোর জায়গাকে পর্যটনবান্ধব করতে পরিচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্য সচেতনতার বিকল্প নেই। এখানে সবাইকে যেমন দায়িত্বশীল হতে হয়, তেমনি আইনের কড়াকড়িরও দরকার আছে। কয়েক মাস আগে সিঙ্গাপুর যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। মাত্র সাতশ' বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ছোট্ট একটা শহর রাষ্ট্র। নেই কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ। সীমিত জায়গার শহর বলে, শুধু সুউচ্চ দালান চারদিকে। পর্যটকে ঠাসাঠাসি ওদের সমস্ত জায়গা। অথচ, এমন সাজানো-গোছানো! যেন ছবির মতন। ভুলেও কোথাও ময়লা ফেলার সুযোগ নেই। নিয়ম মানা এখানে মানুষের অভ্যাস। বাসে-গাড়িতে খাবার খাওয়া পর্যন্ত নিষেধ। খেলেই জরিমানা। শুধু পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতেই এ নিয়ম। রাত-বিরাত বলে কোনো ভয় নেই এখানে। নিরাপত্তা নিয়ে কারও কোনো সংশয় নেই। চমৎকার ট্রাফিক ব্যবস্থা। সিগন্যাল বাতির নিয়ন্ত্রণে যেমন গাড়ি চলে, তেমনি চলে পথচারীও। সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে দীর্ঘ টানেল পার হয়ে আমরা গিয়েছিলাম সান্তোসা দ্বীপে। কী পরিচ্ছন্ন সৈকত! হাজারো বিদেশি পর্যটক। সবাই যে যার মতো আনন্দে মেতে আছে। দ্বীপের একটা রোপওয়ে স্টেশনে দেখলাম, হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা পর্যন্ত এখানে আছে। অবাক হলাম, পর্যটনবান্ধব করতে বেড়ানোর জায়গাগুলোকে এরা কত নান্দনিক, পরিচ্ছন্ন আর নিরাপদ করে রেখেছে!

দেশের কাছাকাছি দুটো পর্যটন সমৃদ্ধ দেশ ভ্রমণের টুকরো কিছু অভিজ্ঞতা আজকের লেখায় তুলে ধরার উদ্দেশ্য হলো, পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের অবস্থান আমাদের দেশে। বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, যা ইউনেস্কো ঘোষিত 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' হিসেবে পরিচিত এবং যেটি প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য হিসেবে মনোনীত, সেই সুন্দরবনের দেশ, আমাদের বাংলাদেশ। বিস্তীর্ণ হাওর, পাহাড় আর বিশাল জনশক্তির দেশ, আমাদের বাংলাদেশ। তাই, পর্যটনে আমাদেরও আছে অপার সম্ভাবনা। নিশ্চয়ই আমরাও পারি নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন, নান্দনিক পর্যটনের এক নতুন বাংলাদেশ গড়তে। হয়তো একদিন, দেশি বিদেশি পর্যটকে দিন–রাত মুখরিত থাকবে আমাদের হাতিরঝিল। যেমনটা থাকে ভারতের কাশ্মীর রাজ্যের 'ডাল লেক'। হয়তো একদিন, ঢাকার মেট্রোরেলে যুক্ত হবে পর্যটকবাহী বিশেষ বহর শুধু ঢাকা সিটি ভ্রমণের জন্য। নিশ্চয়ই একদিন আমাদের সুন্দরবন, কক্সবাজার, সিলেট কিংবা বান্দরবানে নির্ভয়ে, নির্দ্বিধায়, নিরাপদে দিন-রাত ঘুরে বেড়াবে দেশি-বিদেশি ভ্রমণপিপাসু মানুষ। নিশ্চয়ই আমাদের দেশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে, আমাদের ব্যবহার আর পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থাপনায় আকৃষ্ট হয়ে বার বার এখানে ফিরে আসতে চাইবে সকল বিদেশি অতিথির মন। নিশ্চয়ই কোনো বিদেশি পর্যটক বাংলাদেশ বেড়িয়ে তাঁর ভ্রমণকাহিনি লিখবে আবিষ্ট চিত্তে। বাংলাদেশ ভ্রমণের কোনো সে কাহিনি পড়ে, আমাদের দেশ বেড়ানোর জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠবে অন্য কোনো বিদেশি পর্যটকের। বুকভরা গর্বে নিশ্চয়ই আমরা বলবো একদিন, পর্যটনেও আমাদের পথ চলা এখন বিশ্বমানের।

টেকসই উন্নয়ন ও টেকসই পর্যটনের যোগসূত্র

সাজু সরদার

বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে বিতর্ক এখন তুঙ্গে! বিগত এক দশকে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে একটি পক্ষ সেটি মানতে নারাজ। এই না-রাজির পিছনে রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্য থাকলেও "দৃশ্যমান উন্নয়ন" কোনো বিতর্ক-কে তর্কে রূপ দিতে দেয়নি বা হালে পানি পায়নি। কারণ, এখন "চোখ থাকিতে অন্ধ" মানুষ ছাড়া সবাই উপলব্ধি করতে পারে যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন ঘটেছে। তবে, বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও পরিবেশগত কিছু ত্রুটি উন্নয়ন বিতর্ককে রাজনৈতিক বিতর্কে রূপ দিয়েছে। কিন্তু টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development) ভাবনা এই বিতর্কের সুযোগকেও স্তিমিত করে দিতে পারতো। কারণ, টেকসই উন্নয়নে সকল অংশীজনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুযোগ–সুবিধা নিশ্চিত করে, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও পরিবেশগত প্রভাব বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে, নেতিবাচক প্রভাবকে যথাসম্ভব কমিয়ে উন্নয়ন সাধন করা হয়। টেকসই পর্যটন (Sustainable Tourism) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও পরিবেশগত প্রভাবকে বিবেচনা করেই পর্যটক, স্থানীয় জনগোষ্ঠী (Host Community), পর্যটন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- হোটেল, ট্যুর অপারেটর, ট্রাভেল এজেন্ট, পর্যটন স্থানসহ সকল অংশীজনের সুযোগ–সুবিধা নিশ্চিত করে। এই অর্থে টেকসই পর্যটন টেকসই উন্নয়নের মডেল বা আদর্শ হতে পারে। কারণ টেকসই উন্নয়ন টেকসই পর্যটনের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং টেকসই পর্যটন টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে।

২০১৫ সালে, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং টেকসই উন্নয়নের ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে টেকসই উন্নয়নের ৩টি লক্ষ্যমাত্রাকে (৮, ১২, ও ১৪) পর্যটনের সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করা হলেও ১৭টি লক্ষ্যমাত্রাই টেকসই পর্যটনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। টেকসই উন্নয়নের প্রথম ও দ্বিতীয় লক্ষ্যমাত্রায় শূন্য দারিদ্রতা ও ক্ষুধামুক্ত পৃথিবীর (No Poverty and Zero Hunger) কথা বলা হয়েছে। টেকসই পর্যটনের ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে শুরু করে সমাজের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। এর ফলে নতুন উদ্যোক্তা যেমন গড়ে উঠে তেমনি পর্যটনস্থান কেন্দ্রিক ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ব্যবসা প্রসারের সুযোগ পায়। এছাড়া, যুব ও নারী সমাজের কর্মসংস্থানের (ট্যুর গাইড, ফটোগ্রাফি, স্যুভেনির সামগ্রী তৈরি) সুযোগ তৈরি হয়। টেকসই পর্যটনের এই ধারণাকে জাতীয় দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্য ও কৌশলগুলোর সাথে যুক্ত করে গ্রামীণ পরিবেশে পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করা গেলে (Agro Tourism, Community-Based Tourism, Home Stay) গ্রামীণ সমাজের যেমন আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটবে তেমনি বিদেশি পর্যটকদের জন্য ভ্রমণ আনন্দদায়ক হবে। টেকসই উন্নয়নের তৃতীয় লক্ষ্যে সুস্বাস্থ্যের (Good Health and Well-Being) কথা বলা হয়েছে। ডলার সংকটের এই যুগে বাংলাদেশে থাইল্যান্ড কিংবা মালদ্বীপের মতো বিদেশি পর্যটকদের আগমন ঘটলে পর্যটকদের থেকে প্রাপ্ত বৈদেশিক আয় এবং ট্যাক্স আয়, স্বাস্থ্যসেবায় পুনঃবিনিয়োগ করা যেতো। এর ফলে মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি, শিশুমৃত্যু হ্রাস এবং রোগ প্রতিরোধসহ সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতের জন্য আরো বেশি পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হতো। তবে, এক্ষেত্রে ভিসা প্রক্রিয়া সহজিকরণসহ অন এ্যারাইভাল ভিসা চালু করতে হবে। টেকসই উন্নয়নের চতুর্থ লক্ষ্যে গুণগত শিক্ষার (Quality Education) উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পড়ে শেখার চাইতে দেখে বা হাতে-কলমে শিক্ষা বেশি কার্যকরী। টেকসই পর্যটন ব্যবস্থাপনায় সব শ্রেণির পর্যটকদের (শিশু, যুবক, নারী, প্রবীণ নাগরিক,

আদিবাসী এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি) জন্য ট্যুর গাইড, দর্শনার্থী কেন্দ্র (Visitor Center) ও ইন্টারপ্রিটেশন সার্ভিসের (Interpretation Services) মাধ্যমে পর্যটকদের উক্ত পর্যটন স্থানের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে তাদেরকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করা হয়। আমাদের দেশের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে দর্শনার্থী কেন্দ্র ও ইন্টারপ্রিটেশন সার্ভিস চালু করা খুবই জরুরি। টেকসই উন্নয়নের পঞ্চম লক্ষ্যে লিঙ্গ সমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নারীকর্মী এবং উদ্যোক্তাদের সর্বোচ্চ অংশীদারিত্বের একটি খাত হিসেবে, পর্যটন খাতই নারীদের জন্য তাদের সম্ভাবনা উন্মোচন করার সুযোগ প্রদান করে এবং তাদেরকে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে জড়িত হতে এবং নেতৃত্ব দিতে সহায়তা করে।

বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন এবং সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানিকে (Clean Water and Sanitation; Affordable and Clean Energy) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ষষ্ঠ ও সপ্তম লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পর্যটন কেন্দ্র ও হোটেলে পানি পরিশোধনাগার স্থাপন ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে পর্যটন খাতে পানির সুষ্ঠু ব্যবহার, বর্জ্যপানি ব্যবস্থাপনা, জলজ (নদী, সাগর, হাওর) পর্যটনে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ, এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান পানিসম্পদ রক্ষার চাবিকাঠি হতে পারে। এছাড়াও পর্যটন খাতে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির সঠিক ও দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের মাধ্যমে, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমিত করা সম্ভব। পর্যটন সংশ্লিষ্ট উপখাতগুলোর মধ্যে শুধু পরিবহন খাতের মাধ্যমে পরিবেশের বায়ু দূষিত হয়।

এছাড়া পর্যটন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপখাতগুলো থেকে পরিবেশ দূষণ হয় না বললেই চলে। পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে সৌরবিদ্যুত ও অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার এবং সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দূষণকে রোধ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে অর্জন করতে সহায়ক হবে। টেকসই উন্নয়নের অষ্টম লক্ষ্যে শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের (Decent Work and Economic Growth) কথা বলা হয়েছে। ২০২২ সালে শুধু পর্যটন খাতে ২২ মিলিয়ন নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা ২০২১ সালের তুলনায় ৭.৯ ভাগ বেশি। একই সময়ে মোট জিডিপির ৭.৬ ভাগ অর্জিত হয়েছে পর্যটন খাত থেকে যা বিগত বছরের তুলনায় ২২ ভাগ বেশি। উল্লিখিত তথ্যই টেকসই উন্নয়নে টেকসই পর্যটনের ভূমিকাকে বিশদভাবে তুলে ধরেছে। শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো-কে (Industry, Innovation, and Infrastrusture) টেকসই উন্নয়নের নবম লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পর্যটন শিল্পের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি, পর্যটকদের দক্ষতার সাথে সেবা প্রদানের জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার, এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করছে। দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামো যেমন পর্যটকদের আকৃষ্ট করে তেমনি পর্যটকদের যাতায়াত সুবিধাও নিশ্চিত করে। যেমন– বাংলাদেশে পদ্মাসেতু নির্মাণ ও উদ্বোধনের পর এই সেতু যেমন পর্যটকদের কাছে দর্শনীয় স্থান হিসেবে রূপ নিয়েছে, তেমনি উক্ত সেতু নির্মাণের ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের পর্যটন শিল্পে নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের দশম লক্ষ্যে অসমতা হ্রাস (Reduced Inequalities) করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই অসমতা শহর ও গ্রাম ছাড়িয়ে উন্নত-স্বল্পোন্নত দেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন আঞ্চলিক অসমতাকে বোঝানো হয়েছে। তবে টেকসই পর্যটনে পর্যটকদের সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য শহর ও গ্রামের পরিকিল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে শহর ও গ্রামীণ পরিবেশের সমান উন্নয়ন করা যায়।

স্বল্পোন্নত দেশগুলো তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রকৃতি নির্ভর পর্যটনের মাধ্যমে উন্নতির দিকে ধাবিত হতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলের পর্যটনখাত সংশ্লিষ্টদের মধ্যে আঞ্চলিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করে আঞ্চলিক অসমতা দূর করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ- বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের আয়োজনে ভারত, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কার ট্যুর অপারেটরদের নিয়ে আয়োজিত ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব বিনিময় সেশনের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। এর লক্ষ্যই ছিল দক্ষিণ এশিয়ার ট্যুর অপারেটরদের মাধ্যমে এই অঞ্চলের দেশগুলো থেকে বাংলাদেশে পর্যটকদের ভ্রমণে উৎসাহিত করা। টেকসই নগর ও জনপদকে (Sustainable Cities and communities) টেকসই উন্নয়নের এগারতম লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পর্যটনশিল্পের সবুজ অবকাঠামোয় (দক্ষ পরিবহন সুবিধা, বায়ু দূষণ হ্রাস, ঐতিহ্যবাহী দর্শনীয় স্থান এবং উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণ) সবুজ ও বিপুল বিনিয়োগ স্মার্ট, টেকসই ও সবুজ নগর উপহার দিতে পারে। এক্ষেত্রে থাইল্যান্ডের পুরাতন ব্যাংকক শহর, বাংলাদেশের পানামা ও সোনারগাঁও সিটি উদাহরণ হতে পারে।

টেকসই উন্নয়নের দ্বাদশ লক্ষ্যে টেকসই ভোগ ও উৎপাদনকে (Responsible Consumption and Production) প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও উৎপাদন। টেকসই পর্যটনে বেশিরভাগ প্রাকৃতিক সম্পদ সরাসরি ভোগ বা নিঃশেষ না করে ব্যবহার বা উপস্থাপন করা হয়, পাশাপাশি চাকরির সুযোগ সৃষ্টি এবং স্থানীয় সংস্কৃতি ও পণ্য-সামগ্রীকে উপস্থাপন ও সংরক্ষণ করা হয়। টেকসই উন্নয়নের ত্রয়োদশ লক্ষ্যে জলবায়ু কার্যক্রমের (Climate Action) গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। পর্যটন শিল্পে বিশেষত পরিবহন এবং বাসস্থান খাতে, অনবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার কমিয়ে এবং নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলিতে স্থানান্তরিত করার মাধ্যমে, পর্যটন জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম চাপের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়তা করতে পারে। টেকসই উন্নয়নে জলজ ও স্থল জীবনকেও (Life Below Water and Life on Land) গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্যমাত্রায় (চতুর্দশ ও পঞ্চদশ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সামুদ্রিক পর্যটনের মাধ্যমে সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার থেকে ক্ষুদ্র দ্বীপসমূহ ও উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলি অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি করতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সামুদ্রিক বা জলজ জীবনের সঠিক ব্যবহার করে মেরিন ইকোপার্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে পর্যটনকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করেছে এবং জলজ জীবনের রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। এছাড়াও টেকসই পর্যটন শুধুমাত্র জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নয়, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থলজ বাস্তুতন্ত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশের জাতীয় উদ্যানগুলোতে টেকসই পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে পর্যটকদের আকৃষ্ট করে স্থলজ জীবনের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে এবং উদ্যানের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য পর্যটন আয়কে পুনরায় বিনিয়োগ করা যেতে পারে। বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও বাংলাদেশের জাতীয় উদ্যানগুলোতে স্থলজ জীবনের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। টেকসই উন্নয়নের ষষ্ঠদশ লক্ষ্যমাত্রায় শান্তি, ন্যায়বিচার, ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানের (Peace, Justice, and Strong Institution) ভূমিকাকে তুলে ধরা হয়েছে। পর্যটনের মাধ্যমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমির মানুষদের মধ্যে সংস্কৃতি, আচার-আচরণ বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়। এর ফলে বহুসাংস্কৃতিক আন্তঃবিশ্বাসের সহনশীলতা এবং একে অপরের সাথে বোঝাপড়া নিশ্চিত হয়ে সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। টেকসই উন্নয়নের প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সমাজের সকল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। এজন্যই সর্বশেষ লক্ষ্যমাত্রায় অংশীদারিত্বকে (Partnerships for the Goals) সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আর সকল শিল্পের মধ্যে পর্যটন শিল্পই সরাসরি সবচেয়ে বেশি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে। কারণ পর্যটন শিল্পের ধরনই অংশীদারিত্ব নির্ভর। এই শিল্পের সাথে অসংখ্য উপখাত এবং জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। এই জন্য পর্যটন শিল্পকে ছাতার সাথে তুলনা করা হয় যে ছাতার নিচে অসংখ্য উপখাত ব্যবসা করে। পর্যটনের এই প্রকৃতির কারণেই পর্যটন বেসরকারি/সরকারি অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করতে পারে এবং টেকসই উন্নয়নের সকল লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল অংশীজনকে (আন্তর্জাতিক, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয়) একসাথে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

টেকসই পর্যটনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির সবগুলো সূচক অর্জন এবং আর্থসামাজিক সব ক্ষেত্রেই টেকসই প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। তাই টেকসই পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে কাজ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি পর্যটন ও উন্নয়ন সম্পর্কে সকলের নেতিবাচক ধারণা পরিবর্তন করার সুযোগ রয়েছে।

লেখক : রিসার্চ ফেলো (পার্ক, রিক্রিয়েশন এন্ড ট্যুরিজম প্রোগ্রাম), ক্যাসেটসার্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড ও সহকারী অধ্যাপক, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

পঞ্চগড় জেলায় টেকসই পর্যটন বিকাশের সম্ভাব্যতা

উম্মে হালিমা শ্রাবনী

আবিষ্কার এবং জ্ঞানের তৃষ্ণা মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলোর মধ্যেই গণ্য হওয়া উচিত। না হলে এতকিছু জানার পরেও, এত আবিষ্কারের পরেও মানুষের এই নেশা থেমে না গিয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত না। জ্ঞান অর্জনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে ভ্রমণ। মানুষ স্বভাবতই ভ্রমণ করতে পছন্দ করে। ভ্রমণ মানুষকে দেয় আনন্দময় প্রত্যক্ষ জ্ঞান। পৃথিবীতে তাই প্রতিনিয়ত বাড়ছে ভ্রমণপিপাসু মানুষের সংখ্যা। পর্যটন তাই পরিণত হয়েছে শিল্পে। বর্তমান পর্যটন শিল্প নিয়ে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভাবনার উদ্ভব ও বিস্তার ঘটছে। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ মানুষকে করেছে ব্যস্ত থেকে ব্যস্ততর। মানুষের অবকাশ খুবই স্বল্প। আর এই স্বল্প অবকাশ মানুষ তাই যাপন করতে চায় আনন্দে, ভিন্নতরভাবে। আর এই চাহিদা পর্যটন শিল্পে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। তাই ভ্রমণ এখন শুধু জ্ঞান অর্জন কিংবা আবিষ্কারের মাধ্যম নয়, হয়ে উঠেছে মানসম্মত অবকাশযাপনের একটি মাধ্যম।

বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়। শিল্পোন্নয়ের যুগে যেখানে বায়ু প্রতিনিয়ত দূষণের স্বীকার হচ্ছে, এই জেলার বাতাস এখনো নির্মল, স্নিগ্ধ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই জেলা সম্প্রতি পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। পঞ্চগড়কে বলা হয় হিমালয় কন্যা। বাংলাদেশের একমাত্র সমতলভূমিতে চা চাষ হয় পঞ্চগড়ে। হিমালয় পর্বতমালার নিকটে অবস্থিত হওয়ায় শরৎ ও শীতকালে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাসহ হিমালয় পর্বতমালার অনেকগুলো পর্বতশৃঙ্গ দৃশ্যমান হয়। একারণেই মূলত এই জেলাটি পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। প্রত্যকে বছর অসংখ্য মানুষ পঞ্চগড়ে আসছে সুদূর হিমালয় পর্বতমালার উঁচু এই শৃঙ্গগুলো মানস চোখে প্রত্যক্ষ করার জন্য। অভিনব সে অভিজ্ঞতা।

চিত্র: সমতল ভূমি থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা

টেকসই পর্যটন কী?

বর্তমান 'টেকসই পর্যটন' প্রত্যয়টি বিশ্বে বহুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। পর্যটনের মাধ্যমে অর্জিত উন্নয়ন যখন টেকসই হয় তখন তাকে বলা হয় টেকসই পর্যটন। বিশ্ব পর্যটন সংস্থা টেকসই পর্যটনকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে, "Tourism that takes full account of its current and future economic, social and

environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities" অর্থাৎ, পর্যটন হতে হবে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশ বান্ধব।

পঞ্চগড় জেলায় টেকসই পর্যটনের সম্ভাবনা

পঞ্চগড় জেলায় পর্যটকদের আগমন ঘটছে শরৎ থেকে শীতকালে, যে সময়টুকুতে কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মিলছে। এর কারণ মানুষের আগ্রহের জায়গা তৈরি হয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ঘিরে। সে কারণে এখানে পর্যটন ব্যবসায় হয়েছে ঋতুভিত্তিক কিংবা বহুল ব্যবহৃত যে শব্দ সেটি হলো সিজনাল ব্যবসা। পর্যটন বিকাশের অনেক বেশি সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সঠিক পরিকল্পনা এবং সৃজনশীলতার অভাবে সেরকমভাবে পর্যটকদের চাহিদা মেটানো এবং তাদের সন্তুষ্ট করা যাচ্ছে না। পর্যটন খাতে বিনিয়োগের অভাবে অনেক ধরনের সংকটের মুখোমুখি হতে হয় পর্যটকদের। যেমন: খাদ্য, আবাসন, যাতায়াত ইত্যাদি। অথচ সৃজনশীল পরিকল্পনা থাকলে এই খাতে বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে এ অঞ্চলের মানুষের। টেকসই উন্নয়ন প্রত্যয়টি আসলেই সেখানে বোঝানো হয় অন্তর্ভুক্তিমূলক,পরিবেশবান্ধব এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

টেকসই পর্যটন বিকাশে যেসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে

পর্যটন বিকশিত হবে এবং টেকসই উন্নয়ন ঘটবে, পর্যটনকে ঘিরে এমন সকল পরিকল্পনাগুলোই মূলত টেকসই পর্যটন পরিকল্পনা হতে পারে। সেক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে বিভিন্ন দেশে, এমনকি বাংলাদেশেও।

কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম ব্যাপারটি খুবই জনপ্রিয় বর্তমান পর্যটন খাতে। কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম থেকেই বোঝা যাচ্ছে এটির সাথে স্থানীয়দের দ্বারা সংঘটিত কোনো ব্যাপার বোঝানো হচ্ছে। এখানে পর্যটন এলাকার বসবাসকারীদের সাথে পর্যটকদের অংশগ্রহণমূলক যোগাযোগ সংঘটিত হয়। একজন পর্যটক যখন কোনো স্থানে ভ্রমণে যায়, যদিও সেই ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন হয়, তবুও তার আগ্রহ থেকে যায় সে অঞ্চলে বসবাসরত মানুষ এবং তাদের সংস্কৃতি জানার। সাধারণভাবে একজন পর্যটক কোথাও গেলে তাকে স্থানীয় কোনো হোটেলে থাকতে হয়, অভিজ্ঞতার হেরফের হলেও হোটেল বলতে পুরো বিশ্বে একটি ধারণাকেই বোঝায়। তার সাথে স্থানীয় সংস্কৃতির খুব বেশি যোগাযোগ হয় না। সেখানে কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম এর ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই অঞ্চলের মানুষদের সাথে পর্যটকদের একটি যোগাযোগ সংঘটিত হয়। হোস্ট কমিউনিটি পর্যটকদের আতিথেয়তার ব্যবস্থা করে স্থানীয় সংস্কৃতির আলোকে। স্থানীয় কোনো গ্রামের বা কোনো নির্দিষ্ট কিছু পরিবার মিলে আবাসন, খাদ্য এবং বিভিন্ন ধরনের সেবা পর্যটকদের জন্য ব্যবস্থা করে অর্থের বিনিময়ে।

পঞ্চগড় বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা। বিশেষ করে পঞ্চগড় সদর এবং তেঁতুলিয়া উপজেলা ঘিরে পর্যটকদের আগ্রহ বেশি। মানুষের মধ্যে এক ধরনের কৌতূহল কাজ করে এ অঞ্চলের মানুষ কেমন, তাদের ভিন্ন কোনো সংস্কৃতি আছে কি না। যেকোনো স্থানে গেলেই পর্যটকদের মধ্যে স্থান ভ্রমণ ছাড়াও যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ বোধ করে সেটি হলো সে অঞ্চলের খাবার। কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজমে একজন ব্যক্তিকে স্থানীয় খাবার পরিবেশন করা হয় স্থানীয় পণ্যের দ্বারা যেগুলো তৈরি। ফলে যারা প্রতি বছর শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে আসছে তারা এ অঞ্চলের সংস্কৃতির সাথে যদি পরিচিত হতে পারে এতে তাদের আগ্রহ এবং অভিজ্ঞতা বাড়বে বরং কমবেনা। যারা পঞ্চগড়ে ভ্রমণে আসছে তাদের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাটি হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম-এর বিকাশ ঘটার অপার সম্ভাবনা রয়েছে এই অঞ্চলে।

চিত্র: চাওয়াই নদী

চিত্র: নদী তীরের চা বাগান

হোমস্টে ব্যাপারটি কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম-এর সাথে সম্পৃক্ত। হোমস্টে বলতে সাধারণ ভাষায় বোঝায় বাড়ির বাইরে বাড়িতে থাকা। যখন স্থানীয় কোনো অধিবাসী বা অধিবাসীরা তাদের বাড়িতে অর্থের বিনিময়ে পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করেন তখন সেটিকে বলা হয় হোমস্টে। হোমস্টেতে হোস্ট শুধু থাকার না, খাওয়ার ব্যবস্থাও রাখেন। সেক্ষেত্রে হোটেলের মতো খাওয়ার ব্যবস্থা সেখানে না রেখে বাড়িতে সাধারণত যেভাবে এবং যে ধরনের রান্নাবান্না হয় সেভাবেই বন্দোবস্ত করা হয়। বাড়ির লোকজনের সাথে ভ্রমণকারীর অতিথির মতো যোগাযোগ হয় বলেই তার মনে হয় সে বাড়িতেই আছে।

পঞ্চগড়ে আগত পর্যটকদের জন্য আবাসন একটি সংকট হয়েই দাঁড়ায়। তেঁতুলিয়া উপজেলা পর্যটকদের মূল আকর্ষণ হয়ে থাকে কারণ মহানন্দার তীর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্যান্য পর্বতমালা সুন্দর করে দেখা যায়। তেঁতুলিয়া ডাকবাংলোয় বসে রাতে দার্জিলিং শহরের দৃশ্য উপভোগ করা যায়। এক্ষেত্রে তেঁতুলিয়ায় থাকার জন্য পর্যটকরা বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে। সেক্ষেত্রে দুই একটি হোটেল স্থাপিত হলেও সেগুলো জায়গা এবং পরিমিত সেবা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে পর্যটকদের। আবার সেসব হোটেলের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এক্ষেত্রে হোমস্টে একটি সুন্দর সমাধান হতে পারে। হোমস্টে সেবায় খরচ তুলনামূলক কম হোটেল-মোটেলের চেয়ে। এক্ষেত্রে পর্যটকরা কম খরচে গৃহের মতো পরিবেশে থাকতে পারবে।

হোমস্টে অনেক ধরনের সমস্যার সমাধান করবে। প্রথমত, আবাসন সংকট মোকাবিলায় নতুন নতুন ভবন নির্মাণ পরিবেশের জন্য মোটেও সুখকর নয়। পর্যটন এলাকার ইকোলজিকাল ফুটপ্রিন্ট অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি হয়। আবার নতুন স্থাপনাগুলোর যোগ হলে সেই ফুটপ্রিন্ট আরো বেড়ে যায়। আবার টেকসই উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হলো স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন। হোমস্টে সেবায় স্থানীয়রা সরাসরি যুক্ত থাকবে। তারা তাদের সকল সেবা স্থানীয় উৎপাদনকে ঘিরে সরবরাহ করবে। ফলে ইকোলজিকাল ফুটপ্রিন্ট যেমন কম ব্যাহত হবে আবার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আয়ের সংস্থানও হবে। তেঁতুলিয়ায় স্থানীয়দের সচেতন করার মাধ্যমে এ ধরনের ব্যবস্থা নিলে তা টেকসই পর্যটনকে ত্বরান্বিত করবে।

শুধু তেঁতুলিয়ার মধ্যেই যে এমন উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব এমন নয়। নয়নাভিরাম চা বাগান এখন পঞ্চগড়ের বাড়িগুলোর উঠোনের প্রতিবেশী। পঞ্চগড় সদর উপজেলায় ভিতরগড় দুর্গনগরী এলাকা দেশের অন্যতম প্রাচীন দুর্গনগরীগুলোর মধ্যে একটি। ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও মুগ্ধ করার মতো। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার জন্য মানুষের আনাগোনা শুধু তেঁতুলিয়ায়, অথচ পঞ্চগড়ের বিভিন্ন স্থান থেকে এই দৃশ্য উপভোগ করা যায়। সেক্ষেত্রে ভিতরগড় এলাকায় হোমস্টে সেবা চালু করলে এখান থেকে চা বাগান,কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং ঐতিহাসিক এই নগরী একসাথে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হবে ভ্রমণার্থীদের দ্বারা। ফলে এক স্থানের উপর চাপ সৃষ্টি না হয়ে পর্যটন কেন্দ্রের বিকেন্দ্রীকরণ হবে। এতে পরিবেশ এবং পর্যটক দুপক্ষের স্বস্তি মিলবে।

বর্ষায় চা বাগানের বৃষ্টি বিলাস সাথে এক কাপ চা, মন শান্ত ও আনন্দঘন করার জন্য যথেষ্ট। আবার শীতকালে বাড়ির আঙিনায় খড়কুটো দিয়ে আগুন পোহানোর অভিজ্ঞতাও অতুলনীয়। বর্ষার পঞ্চগড় এবং তীব্র শীতের

পঞ্চগড়ের রূপও সুন্দর। এখন ভ্রমণপিপাসুরা শুধু সিজনাল ভ্রমণ নয়, অন্যান্য ঋতুগুলোতে ব্যতিক্রম অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যও আগ্রহ প্রকাশ করে। সেই অভিজ্ঞতার স্বাদ দেওয়ার মতো উপযুক্ত পরিবেশ এখানে আছে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন যথেষ্ট প্রচারনা এবং উদ্যোগ নেওয়া।

ইকো হোম ব্যাপারটিও বিশ্বে অনেক পরিচিত। স্থানীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এবং পরিবেশের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে না এরকমভাবে গৃহ নির্মাণ করে আবাসনের ব্যবস্থা করাই মূলত ইকো হোমের অন্যতম উদ্দেশ্য। গ্রিন ইকোনমির সাথে এটি সম্পৃক্ত। যুক্তরাষ্ট্র,ভারত এমনকি বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলগুলোতেও এই ধরনের গৃহ দেখা যায় যেখানে পর্যটকরা অবস্থান করে। যেমন সাজেকে গেলে মাঁচাঙ ঘরে থাকতে পর্যটকদের আগ্রহ বেশি থাকে। সেখানকার রিসোর্টগুলোও সেভাবে বানানো।

পঞ্চগড় খুব বেশি ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল নয়। এখানে এরকম ইকো হোম নির্মাণের সম্ভাবনা রয়েছে। অনেক পর্যটক আছেন যারা একা প্রকৃতির মাঝে সময় কাটাতে চান। পঞ্চগড়ের নদীগুলো ছোট এবং স্বচ্ছ পানির আধার, তার দুপাশ দিয়ে চা বাগান,পাখির কলকাকলিতে পূর্ণ থাকে। এরকম জায়গায় যদি খড়ের চাল আর বাঁশের বেড়া দেওয়া কোনো ঘর থেকে দিনের সৌন্দর্য আর রাতের আকাশ দেখা যায়, তার কল্পনা যত সুন্দর বাস্তবে সেটি আরো সুন্দর।

নদীর ধারের এসব জমি মূলত স্থানীয়দের হয়ে থাকে। তারা যদি এরকম ছোট ছোট ইকো হোম তৈরি করে সেক্ষেত্রে খুব কম বিনিয়োগ করে পর্যটন ব্যবসার সাথে যুক্ত হতে পারবে তারা। এতে এ অঞ্চলের পর্যটন বিকশিত হবে এবং সে পর্যটন হবে টেকসই।

চিত্র: ঐতিহাসিক মহারাজার দীঘি

Creative Tourism বা সৃজনশীল পর্যটনের ধারণাটিও এখন অনেক বেশি আলোচিত। যারা পঞ্চগড়ে আসবেন বা আসছেন ভ্রমণ করতে তারা যে বহুদূর থেকেই আসেন এমন নয়। দিনে এসে দিনে চলে যান এমন পর্যটকদের সংখ্যাও অনেক বেশি। সেক্ষেত্রে তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সেবা চালু করা যায়। যেমন কিছু সমবায় যদি করা যায় পরিবহন দিয়ে যারা সারাদিনে গুরত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে পর্যটকদের নিয়ে যাবেন ভ্রমণ করাতে। তাদের সাথে কিছু ট্যুর গাইডও থাকতে পারে। এভাবে পর্যটন আরো সুশৃঙ্খল ও গ্রহণযোগ্য হবে। এছাড়া পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। যেমন ধরা যাক চা বাগানে বৃষ্টি বিলাস। বিশেষ একটি দিনে এর আয়োজন হলো। তখন এক ধরনের আগ্রহ তৈরি হবে পর্যটকদের মধ্যে। বিভিন্ন ধরনের চা পাওয়া যায় পঞ্চগড়ে যেমন অর্গানিক টি, হোয়াইট টি, গ্রিন টি, ব্ল্যাক টি বিখ্যাত। এখানকার চা কারখানাগুলোতে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেখানে প্রত্যক্ষভাবে চা প্রক্রিয়াজাতকরণ দেখার সুযোগ থাকবে।

উপর্যুক্ত যে বিষয়গুলো আলোচিত হলো সবগুলোর সাথে পর্যটন বিকাশ এবং টেকসই পর্যটন সম্পৃক্ত। উক্ত পদক্ষেপগুলো যেমন এ অঞ্চলের প্রকৃতিকে রক্ষা করবে, সাথে বৃদ্ধি করবে স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক সক্ষমতা। টেকসই পর্যটনের বিকাশ পঞ্চগড়ে সম্ভব শুধু সঠিক পরিকল্পনা ও উদ্যোগের মাধ্যমে।

লেখক : শিক্ষার্থী, মাস্টার্স ১ম সেমিস্টার, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

কৃষি ও গ্রামীণ পর্যটনে সমৃদ্ধি ঘটছে উত্তরাঞ্চলে

এসকে দোয়েল

পর্যটন শিল্প একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। বিশ্বে একটি চালিকাশক্তির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে এই পর্যটন শিল্প। এটি বিশ্বের একক বৃহত্তম শিল্প হিসেবে সর্বাধিক স্বীকৃত। বলা হয় যে দেশে পর্যটনের স্পট বেশি রয়েছে, সেখানে পর্যটকের সমাগম বেশি হয়ে থাকে, সেসব পর্যটন অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও বেশি হয়ে থাকে। এ জন্য পর্যটনখাত বিশ্বের প্রায় সব দেশেই অন্যতম প্রধান খাত হিসেবে পর্যটন শিল্পকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

কারণ হচ্ছে, পৃথিবীর চারটি কর্মসংস্থানের মধ্যে পর্যটন খাত একটি। এ খাতে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়ে থাকে। এ পর্যটন খাত থেকে বাংলাদেশের আয় হয়ে থাকে প্রায় দশমিক ৭৬.১৯ মিলিয়ন ডলার। সেখানে ভারত আয় করেছে ১০ হাজার ৭২৯ মিলিয়ন ডলার, মালদ্বীপ ৮০২ মিলিয়ন ডলার, শ্রীলঙ্কা ৩৮৫ মিলিয়ন ডলার ও নেপাল ১৯৮ মিলিয়ন ডলার আয় করছে। যা সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের অবস্থান কিন্তু কম নয়।

বলা হচ্ছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে থাকে ১৫৬ কোটি পর্যটক । অর্থাৎ প্রতি সাতজনের একজন পর্যটক। ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের ৫১টি দেশের পর্যটকেরা বাংলাদেশে ভ্রমণ করবেন, যা মোট জিডিপির ১০ শতাংশ অবদান রাখবে। ধারণা করা হচ্ছে আগামী ২০২৪ সালে মোট কর্মসংস্থানের ১ দশমিক ৯ শতাংশ হবে পর্যটনশিল্পের অবদান। পর্যটনশিল্পের অপার সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ার রোল মডেল।

অন্যান্য দেশের তুলনায় পর্যটন শিল্পে পিছিয়ে থাকলেও আমাদের সোনার বাংলাদেশে প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্য, দুর্লভ প্রজাতির অনন্য জীব, প্রাণী ও উদ্ভিদের সবকিছুতেই পর্যটকদের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে, আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। এদেশের প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য মুগ্ধ করছে লাখো কোটি ভ্রমণচারী মানুষদের। এই ভ্রমণচারীদের পদাচরণে পশ্চিমে সুন্দরবন, দক্ষিণাঞ্চলের কক্সবাজারের বিশাল সমুদ্র সৈকত, কুয়াকাটা, সেন্টমার্টিনসহ পর্যটন জায়গাগুলো দেশ-বিদেশের পর্যটকদের আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে আসছে।

ঠিক তেমনি উত্তরাঞ্চলেও রয়েছে চোখ জুড়ানো নানান দর্শনীয় স্থানের জায়গাগুলো। সেসব জায়গাগুলো পর্যটকদের আকৃষ্ট করছে। উত্তরাঞ্চলের পর্যটনের রাজধানী হিসেবে মনে করা হয় বগুড়াকে। এটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বিন্দুও হিসেবেও সুপরিচিত। এ বগুড়াতে রয়েছে মহাস্থানগড়। যাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল বহু রাজাদের রাজ্য। সেই রাজাদের স্মৃতিপট চোখে পড়ে এই মহাস্থানগড় গেলে। বেহুলা লখিন্দরের গল্পকে না জানে। সেই বেহুলার বাসর ঘর এখানে। তাছাড়া রয়েছে ভাসুবিহার, পশুরামের প্রাসাদ ও প্রাচীর, কাটাবিহীন বড়াইয়ের গাছ, মাজার শরীফ, শিলা দেবীর ঘাট প্রভৃতি।

আমরা যদি পার্শ্ববর্তী গাইবান্ধার দিকে তাকাই। রাজা গোবিন্দের ষাট হাজার গরুর গো-চারণ ভূমির নামকরণ করা হয়েছে গাইবান্ধা জেলাকে। এ জেলাতেও রয়েছে মুগ্ধ করার মতো বেশ কিছু পর্যটন দৃশ্যপট। যা পর্যটকদের আকৃষ্ট করছে। কিছুদিন আগে দেখে এসেছিলাম মাটির নিচে সবুজঘর ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার, গোবিন্দগঞ্জের কুটিবাড়ি, ড্রিমল্যান্ড পার্ক, বালাসী ঘাট, যমুনার চর ও এসকেইন পার্ক। এ জেলা যমুনার চর ও বালাসী ঘাটের মানুষের জীবনযাপনের যে চিত্র রয়েছে তা প্রত্যেক পর্যটকের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায়।

এদিকে লালমনিরহাট। কৃষি জেলা। এ কৃষি জেলায় যেসব দর্শনীয় স্থানগুলো পর্যটকদের মন তুষ্ট করে তিস্তা ব্যারেজ, প্রাচীন বিমান বন্দর, বুড়িমারী জিরোপয়েন্ট, তিনবিঘা করিডোর, শীগুড়মটীর দীঘি, কবি শেখ ফজলুল করিমের বসত ভিটা ও কাকিনা রাজার বাড়ি। আরেকদিকে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ছিটমহল ছিল সেটা এই লালমনিরহাটে। ছিটমহলগুলোর আজ বিলুপ্ত। এ ছিটমহলগুলো ঘুরে দেখে মনে হবে দেশের বুকে আরেক ছোট্ট বাংলাদেশ। এসব বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে পর্যটকদের পদচারণ ঘটছে।

নীলের দেশ বলা হয় নীলফামারী জেলাকে। ইংরেজ আমলে বৃটিশরা এখানকার চাষিদের বাধ্য করতো নীল চাষ করতে। ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে এ জেলার প্রত্যেকটি স্থান। ইতিহাস সমৃদ্ধ দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে নীলসাগর, ময়নামতি দুর্গ, সিন্ধুরমতি দিঘি, মীরজুমলার মসজিদ। এ জায়গাগুলোতে পর্যটকদের জন্য পর্যটনের রসদ তৈরি হয়েছে।

ভারতের মেঘালয় রাজ্যঘেষা ও যমুনা নদীর আববাহিকায় মহারাজা বিশ্বসিংহের কুড়িটি পরিবারের দেশ থেকেই কুড়িগ্রাম জেলা। এ জেলাটির ইতিহাস সমৃদ্ধ করেছে বহু ঐতিহাসিক স্থাপত্য। প্রাচীনকালের জমিদার বাড়ি দিয়েই যেন অনেকটা সমৃদ্ধ করেছে আজকে ইতিহাসখচিত এ জেলার পর্যটন শিল্প। জমিদার বাড়িগুলোর মধ্যে রয়েছে 'পাঙ্গা জমিদার বাড়ি, ঘড়িয়ালডাঙ্গা জমিদার বাড়ি, ভিতরবন্দ জমিদার বাড়ি ও নাওডাঙ্গা জমিদার বাড়ি। শাহী মসজিদ, চান্দামারী মসজিদ, বীরপ্রতীক প্রাপ্ত তারামন বিবির বাড়ি, জালার পীরের দরগাহ, মুন্সিবাড়ি, কোটেশ্বর শিব মন্দির, ধাম শ্রেণি মন্দির, চতুর্ভুজ সেনপাড়া শিব মন্দির, ধলডাঙ্গা বাজার এবং ধরলা ব্রিজ, ধরলা বাঁধ, বেহুলার চর, উদুনা-পুদুনার বিল, টুপামারী (জিয়া পুকুর), সোনাহাট ব্রিজ, ফুল সাগর, কালজানি ঘাট ও চিলমারী বন্দরের দর্শনীয় জায়গাগুলো পর্যটকদের আকৃষ্ট করছে। সেখানে পর্যটকরা ছুটে যাচ্ছে।

কুঁড়িগ্রাম জেলার বিলুপ্ত ছিটমহলগুলো প্রধান আকর্ষণ। ২০১৫ সালে ৩১শে জুলাই মধ্যরাতে দু'দেশের সরকারের সমঝোতায় বিনিময় হয় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ১১১টি ও ভারতের অভ্যন্তরে ৫১টি ছিটমহল। এ ছিটমহলগুলোর মধ্যে কুঁড়িগ্রামেই ছিল ১২টি ছিটমহল। যা আজ বিলুপ্ত। এ ছিটমহলগুলোতে আজ উন্নয়ন ঘটেছে। মুক্ত স্বাধীনতা পেয়েছে পরাধীনতায় থাকা মানুষগুলো। এ সব মানুষদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে সরকার। এ পরাধীনতার শেকল থেকে মুক্তজীবনে ফিরে আসার চিত্রও পর্যটকদের জানার পর্যটনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একইভাবে রংপুরের তাজহাট জমিদারবাড়ি, ভিন্নজগৎ, নীলদরিয়া বিল, চিড়িয়াখানা, বেগম রোকেয়ার বাড়ি ও চিকলী বিল পর্যটন শিল্পকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। রামসাগর দীঘি, কান্তজির মন্দির আর কৃষি পর্যটনে সমৃদ্ধ লিচুর রাজধানী দিনাজপুর। রংপুর ও দিনাজপুরের দর্শনীয় জায়গাগুলোতে পর্যটকদের সমাগম ঘটছে।

এখনি আসা যাক উত্তর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলা ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড়। সীমান্তের কোলঘেষা এ দুটি জেলায় রয়েছে স্থাপত্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান। যা পর্যটকদের দৃষ্টি কাড়তে শুরু করেছে। ঠাকুরগাঁওয়ের দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে প্রায় দুইশত বছরের প্রাচীন সূর্যপুরী আমগাছ পর্যটকদের আকৃষ্ট করছে। এবার ঈদের দেখে এসেছিলাম বালিয়াডাঙ্গীর একটি গ্রামে প্রাচীন এ আমগাছটি ঘিরে গ্রামটি পর্যটন গ্রাম হয়ে উঠেছে। এ জেলার অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলো হচ্ছে ফানসিটি অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, জামালপুর জমিদারবাড়ী, রাজা টংকনাথের রাজবাড়ী, হরিপুর রাজবাড়ী, জগদল রাজবাড়ী, শালবাড়ী, সনগাঁ মসজিদ, সাগর মসজিদ, গেদুড়া মসজিদ, ফতেহপুর মসজিদ, হেশপুর মহালবাড়ী ও বিশবাঁশ মাজার ও মসজিদস্থল, ইমামবাড়া, মেদিনী গোরক্ষনাথ মন্দির এবং কূপ, হরিণমারী শিব মন্দির, গোবিন্দনগর মন্দির, ঢোলরহাট মন্দির, ভেমটিয়া শিবমন্দির, রাজভিটা, জাবরহাট ইউনিয়ন, প্রাচীন রাজধানীর চিহ্ন, নেকমরদ মাজার, মালদুয়ার দুর্গ, গড়গ্রাম দুর্গ, বাংলা গড়, ভবানীপুর, গড়খাঁড়ি, কোরমখান গড় সাপটি বুরুজ এ দর্শনীয় স্থানগুলো এ অঞ্চলের পর্যটন শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে।

পর্যটন শিল্পের দক্ষিণে টেকনাফ আর উত্তরে তেঁতুলিয়া এ দুটি জায়গা পর্যটকদের জন্য বহুল প্রতীক্ষিত ভ্রমণের জায়গা। উত্তরের সীমান্ত জেলা পঞ্চগড় হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থান থাকায় সর্বজন নন্দিত হিমালয়কন্যা হিসেবেই পরিচিত। পাথর ও চা শিল্পখ্যাত অঞ্চল হওয়ায় উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে মাথাপিছু আয়ের অধিকারী জেলা পঞ্চগড়। ভারতের সাথে সীমান্ত সংযোগের মধ্য দিয়ে চারটি দেশ যুক্ত হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। পর্যটন শিল্পেও অপার গুরুত্ব তৈরি করেছে ত্রি-সীমান্তবেষ্টিত এ উত্তরের জেলা।

গত কয়েক বছরে উত্তরাঞ্চলে কৃষি উন্নয়ন ঘটেছে। দুই দশকের চা শিল্পকে সবুজ অর্থনীতির পাশাপাশি পর্যটকদের দর্শনীয় এলাকা হিসেবে সুপরিচিত ঘটেছে। এ চা শিল্প ঘিরে টি ট্যুরিজম গড়ে উঠেছে। পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার ত্রি-সীমান্ত জুড়ে কাঁটাতারে আবদ্ধ থাকলেও সীমান্ত পাড়ের গ্রামগুলো কিন্তু সৌন্দর্য বিলাসে মুগ্ধতা কাড়ছে। সীমান্ত প্রবাহিত নদ-নদীগুলোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলো এখন পর্যটনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সীমান্ত প্রবাহিত মহানন্দা নদীটি এ অঞ্চলের পর্যটনের গুরুত্ব তৈরি করেছে। এর সবচেয়ে গুরুত্ব তৈরি করেছে ভারত-নেপালের হিমালয়-কাঞ্চনজঙ্ঘা দুই পর্বতশৃঙ্গ। প্রতি বছর লাখ লাখ ভ্রমণচারী মানুষ যেখানে পাসপোর্ট ভিসা করে ভারত-নেপালে হিমালয়-কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে ছুটে যাচ্ছেন। সেই পর্বতযুগলের মোহনীয় সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ তৈরি করেছে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার এই সীমান্ত প্রবাহিত মহানন্দা নদীর পাড়। এ পাড়ে দাঁড়িয়ে শরতের কাঁশফুলের আড়ালে যখন পরিষ্কার নীল আকাশের উত্তর কোণে দৃশ্যমান হয়ে উঠে কাঞ্চনজঙ্ঘার বিধৌত রূপ-সৌন্দর্য। সে রূপের মোহে গত এক যুগের বেশি সময় ধরে এ অঞ্চলে প্রতি বছর হেমন্ত-শীত ঋতুতে হাজার হাজার পর্যটকের সমাগম ঘটে। তারা অবাক চিত্তে মুগ্ধতার দর্শনে দেখে তৃপ্তি জুড়ায়। ২০ কিলোমিটার নদীর কিনার জুড়ে এই হিমালয়-কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ সৌন্দর্য পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনা তৈরি করেছে এ এলাকাটি। এ মহানন্দা ছাড়াও এ এলাকায় ডাহুক, বেরং, করতোয়া, গবরা, চাওয়াই নদী পর্যটনে সম্ভাবনা তৈরি করছে।

নদী ঘিরে পর্যটনকে গুরুত্ব দিয়ে স্থাপত্য তৈরি করা হয়েছে। যেমন আমরা দেখেছি সম্প্রতি সময়ে পঞ্চগড়ের চাওয়া নদীর তীরে গড়ে নির্মাণ করা হয়েছে মুক্তাঞ্চল। নদীর অববাহিকায় নদী সংস্করণ করে সেখানে পঞ্চগড়ের পাঁচটি গড়ের ইতিহাস তুলে ধরতে বিদায়ী জেলা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল হক মুক্তাঞ্চল পার্ক তৈরি করে গেছেন। শুধু তাই নয়, এ নদীতে দুটি কাঠের সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এ কাঠের সেতু দেখতেও পর্যটকরা ছুটে যাচ্ছেন তা দেখতে। এখন চাওয়াই নদীর তীরে নির্মিত পার্কে সকাল-সন্ধ্যায় অবকাশ সময় কাটাচ্ছেন পর্যটকরা। হেমন্ত-শীত ঋতুতে এখান থেকেও দেখা যাবে কাঞ্চনজঙ্ঘার মোহনীয় রূপ।

ঠিক মহানন্দার নদীর তীরে সৌন্দর্যের বিলাস উপভোগ করতে পর্যটন রূপ দিয়েছেন তেঁতুলিয়ার ইউএনও সোহাগ চন্দ্র সাহা। এ উপজেলার একমাত্র পর্যটন স্পট হচ্ছে ডাকবাংলো পিকনিক কর্নার। উপজেলা পরিষদের সহযোগিতায় ডাকবাংলো পর্যটন স্পটটি আরও স্থাপনা নির্মাণ করে নান্দনিকতা রূপ দেওয়া হয়েছে। একটি পরিত্যক্ত ঘরকে অপ্রতিরোধ্য জাদুঘর তৈরি, গ্রামীণ বাংলার আবহমান চিত্র তুলে ধরতে বিভিন্ন ভাস্কর্য স্থাপন, ওয়াচ টাওয়ারসহ বিভিন্ন স্থাপনা তৈরির মধ্য দিয়ে পর্যটনের উন্নয়ন হয়েছে।

কৃষি উৎপাদনও পর্যটনে নতুনমাত্রা তৈরি করেছে। এ অঞ্চলে এখন নতুন নতুন উচ্চমূল্যের ফল ও ফুল উৎপাদনের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটছে। বলা যেতে পারে, এসব কৃষিপণ্য ঘিরে এগ্রো ট্যুরিজমের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। দুই বছর ধরে এ উপজেলার সীমান্তঘেষা দর্জিপাড়া নামের একটি গ্রামে শীতকালীন ভিনদেশি নেদারল্যান্ডের টিউলিপ ফুল চাষ করে এগ্রো ট্যুরিজমের বেশ ভূমিকা রাখছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ইএসডিও। অবশ্য ইএসডিও পল্লী কর্মসংস্থান ফাউন্ডেশন পিএকেএসএফের অর্থায়নে এ টিউলিপ চাষে পর্যটন শিল্পে নতুনমাত্রা তৈরি করেছে। দুই বছরে দেখা গেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন বয়সী হাজার হাজার পর্যটকের আগমন ঘটেছে গ্রাম অঞ্চলে।

পর্যটনের গুরুত্ব তৈরি করেছে চতুর্দেশীয় বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর ও ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট। এ বন্দরটির বাংলাদেশের সাথে ভারত, নেপাল ও ভুটান যুক্ত রয়েছে। আগামীতে এ বন্দরটির সাথে চীন সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যার কারণে এ বন্দর ব্যবহার করতে পর্যটকরা বেশি ঝুঁকছে। কারণ হচ্ছে এ বন্দর থেকে ভারতের শিলিগুড়ির দূরত্ব মাত্র ১০ কিলোমিটার, নেপালের দূরত্ব ৫৮ কিলোমিটার, ভুটানের দূরত্ব ৬০ কিলোমিটার ও চীনের দূরত্ব ২০০ কিলোমিটার।

আমরা যদি ভারতের কথা বলি। এ বন্দরটি ব্যবহার করে কেউ চিকিৎসা, কেউ ব্যবসা, কেউ শিক্ষা ও কেউ ভ্রমণ করতে ভারতের দর্শনীয় স্থানগুলোতে ছুটে যাচ্ছেন। ভারতের পর্যটন শিল্পের অন্যতম স্থান হচ্ছে দার্জিলিং, সিকিম, ডুয়ার্স, কাশ্মীর, তাজমহল, মানালি প্রভৃতি। আবার হিমালয়ের দেশ নেপাল। এ নেপালে কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাঠমন্ডু, নগরকোট, ডেভিস ফলস, পোখারা, চন্দ্রগিরি পাহাড়, ফেওয়া লেক, মহেন্দ্র গুফা, চিতওয়ান ন্যাশনাল পার্ক, বৌধনাথ স্তূপ, পশুপতিনাথ মন্দির, স্বয়ম্ভূনাথ স্তূপ, থামেল, সারাংকোট আর ভুটানের ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ড্রুকিয়াল জং, টাইগার্স নেস্ট বা টাইগার্স মনাস্ট্রি, কিচু মনাষ্ট্রি, সিটি ভিউ পয়েন্ট ও পারোসহ প্রচুর দর্শনীয় স্থান রয়েছে, যেখানে বাংলাদেশি পর্যটক বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর ও ইমিগ্রেশন চেক ব্যবহার করে ঘুরতে যাচ্ছেন। আরেকদিকে চীন যেহেতু এখনো যুক্ত হয়নি। কিন্তু তবে চীন ও ভুটানে বাংলাদেশে অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে, আবার ওইসব দেশের শিক্ষার্থীরা রয়েছে যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছে।

পঞ্চগড়ের পর্যটন শিল্পের দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে কাছ থেকে হিমালয়-কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপদর্শন, ডাকবাংলো পিকনিক কর্নার, রং মিউজিয়াম, দক্ষিণ এশিয়ার প্রত্নদুর্গনগরী, দেড় হাজার বছরের প্রাচীন মহারাজা দীঘি, আনন্দধারা, চা বাগান, টিউলিপ গার্ডেন, চারদেশীয় বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর ও ইমিগ্রেশন, চীন মৈত্রী সেতুসহ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান যা পর্যটকদের আকৃষ্ট করছে।

এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, উত্তরাঞ্চলের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ঘটছে যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে। উত্তরাঞ্চলের সৈয়দপুর পর্যন্ত বিমানবন্দর থাকার পর ঠাকুরগাঁওয়ে বিমানবন্দর হওয়ার কথা থাকলেও সেটি বন্ধ থাকলেও আগামীতে হয়তো বাস্তবায়ন করা হবে। এক্ষেত্রে সড়ক পথে এখানকার রাস্তাঘাট উন্নত হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হয়ে উঠেছে। সড়ক পথে আরও সহজ হয়ে উঠেছে রেলপথ। বলা যেতে পারে, রেল যোগাযোগের রাজধানী এখন উত্তরের জেলা পঞ্চগড়। এছাড়াও এ জেলার জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিকভাবে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ঘটছে।

তবে এ অঞ্চলে এখনো সেভাবে উন্নত কোনো রিসোর্ট, পর্যটন মোটেল ও আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। গড়ে উঠলে পর্যটনের হাত ধরেই বদলে যেতে পারে অর্থনীতির রূপরেখা। এ উত্তরাঞ্চলের গ্রামীণ জনপদগুলো পর্যটনের আকর্ষণের অপার সম্ভাবনা। কমিউনিটিভিত্তিক ট্যুরিজমের পূর্ণতা পেলে স্থানীয়দের বেকার সমস্যা কমানো সম্ভব হবে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের পর্যটন সহায়ক মনোভাব বদলে দিতে পারে উত্তরবঙ্গ পর্যটনের উন্নয়নের দুয়ার।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট এবং সম্পাদক তেঁতুলিয়া ট্রাভেল ম্যাগাজিন

গ্যাস্ট্রোনোমি ট্যুরিজমঃ সম্ভাবনা চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

মোঃ বিল্লাল হোসেন

ভ্রমণ মানব জীবনের অপরিহার্য অংশ। জীবিকার তাগিদে কিংবা নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনে মানুষের ভ্রমণ করতে হয় প্রতিনিয়ত। প্রাচীনকালে যখন আধুনিক বাহন ছিল না তখন মানুষ ভ্রমণ করতো পায়ে হেঁটে। তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আবিষ্কৃত হয়েছে নানা ধরনের যানবাহন যা মানুষের যাতায়াতকে করেছে সহজ। ফলে যে কেউ যখন তখন যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে। মানুষ এখন শুধু প্রয়োজনের তাগিদে ভ্রমণ করে না। বিনোদন, আত্মতৃপ্তি কিংবা নতুন কিছু আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে মানুষ এখন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে যায়। বিশেষত বর্তমান সময়ের তরুণ প্রজন্ম অজানাকে জানতে আর অদেখাকে দেখতে প্রতিনিয়ত বিশ্বের নানা প্রান্তে ভ্রমণ করছে যা পর্যটন হিসেবে পরিচিত। জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থার মতে "যখন কোনো ব্যক্তি বিনোদন, অবসর অথবা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তাদের নিজস্ব বাসস্থানের/এলাকার বাইরে দেশের মধ্যে বা বিদেশে ভ্রমণ করে তখন তাকে পর্যটক বলা হয় এবং এই পুরো ব্যাপারটিকে পর্যটন হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই প্রক্রিয়াটিকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।"

খাদ্য মানব জীবনের অপরিহার্য অংশ। তেল ছাড়া যেমন গাড়ি অচল, তেমনি খাদ্য ছাড়া মানুষ অচল। আমরা বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকি না কেন খাদ্য আমাদের খেতেই হবে। সুতরাং, যখন কেউ বিনোদন কিংবা আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করে তখনও তার বিভিন্ন জায়গা থেকে খাবার খেতে হয়। ফলে সে নানান জায়গার খাবারের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। যখন কোনো পর্যটক একটি এলাকায় বা দেশে ভ্রমণে গিয়ে সেখানকার বিভিন্ন ধরনের খাবার খায় তখন তাকে খাদ্য পর্যটন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থার কমিটি অন ট্যুরিজম এন্ড কম্পিটিটিভনেস (সিটিসি) এর মতে "খাদ্য পর্যটন বা গ্যাস্ট্রোনোমি ট্যুরিজম বলতে পর্যটকের খাদ্য ও খাদ্য সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতাকে বুঝায় যা সে ভ্রমণের সময়ে অর্জন করেছে। বিশেষ করে এলাকাভিত্তিক যেসকল খাবার রয়েছে সেগুলোর স্বাদ গ্রহন করাকে বুঝায়।"

বর্তমান সময়ে পর্যটন একটি লাভজনক শিল্পে রূপ নিয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পর্যটন ব্যবসার মাধ্যমে তাদের নিজস্ব অর্থনীতিকে চাঙ্গা করছে। যেহেতু সাম্প্রতিককালে পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসার ব্যাপক হারে বেড়েছে তাই সহজেই পর্যটনের নানা শাখা উন্মোচিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তেমনিভাবে তুলনামূলকভাবে পর্যটনের একটি নতুন শাখা খাদ্য পর্যটন। ওয়ার্ল্ড ফুড ট্রাভেল এসোসিয়েশনের সভাপতি এরিক উলফ ২০০১ সালে সর্বপ্রথম খাদ্য পর্যটন বা গ্যাস্ট্রোনোমি ট্যুরিজম কথাটি ব্যবহার করেন। এরপর থেকে গ্যাস্ট্রেনোমি ট্যুরিজম জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে। বর্তমান সময়ে খাদ্য পর্যটন খুবই সম্ভাবনাময় একটি পর্যটন খাত। আর বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যাভাসের দেশে খাদ্য পর্যটন আরো বেশি সম্ভাবনাময়। বাংলাদেশের ৬৪ জেলার প্রতিটি গ্রামে গ্রামে রয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যের সমাহার। প্রতিটি জেলার আলাদা আলাদা খাদ্যাভাসের কারনে এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবারের সমাহার দেখা যায়।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মুঘল খাবার কাচ্চি বিরিয়ানি, সিক কাবাব, জালি কাবাব, মোগলাই পরাটা, বড় বাপের পোলা খায়, বিউটি লাচ্ছি, বাকরখানি, খিচুড়ি ও তেহারি, মুড়ি ভর্তা, মাঠা, বোরহানি, বুদ্ধুর পুরি, তান্দুরি চা, সোনা মিয়ার দই ও মিষ্টি। রাজশাহীর কলাইরুটি, হাঁসের মাংস, কালাভুনা, নাটোরের কাচাগোল্লা, বগুড়ার দই, খুলনার বিখ্যাত চুই-ঝাল দিয়ে হাঁসের মাংস, চিংড়ি, কুমিল্লার রসমালাই, ফরিদপুরের বাগাট দধি ও মিষ্টি, সিলেটের চা, দেশীয় ঐতিহ্যবাহী বাহারী পিঠা, ভর্তা, আদিবাসী খাবার, বাঁশকোরল, বাঁশ মুরগি রান্না, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, পদ্মার ইলিশ ইত্যাদি। এছাড়াও আমাদের

দেশের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা পদের খাবার। রসনা তৃপ্তিতে এই খাবারগুলোর জুড়ি নেই। সাম্প্রতিককালে পর্যটকগণ এসব দেশীয় খাবারের স্বাদ নিতে এবং গ্রামকে জানতে পাড়ি জমাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে যা দেশের পর্যটন শিল্পের জন্য অনেক বড় সুখবর।

বাংলাদেশে গ্যাস্ট্রোনোমি ট্যুরিজমের সম্ভাবনা

খেতে পছন্দ করেনা এমন মানুষ দুনিয়াতে খুঁজে পাওয়া ভার। বিশ্বের প্রায় সকল মানুষই বাহারী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার খেতে পছন্দ করে। তাছাড়া খাদ্য হচ্ছে মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি। খাদ্য ছাড়া মানুষের পক্ষে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা ও জীবনধারণ করা অসম্ভব। সুতরাং মৌলিক চাহিদা ও ভোজন রসিকতার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে খাদ্য পর্যটন দারুণ সম্ভাবনাময় একটি শিল্প।

বিশেষ করে বাংলাদেশের মত একটি ক্ষুদ্র দেশে খাদ্যের যে বৈচিত্র্য তা অকল্পনীয়। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় খাবার। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বাহারী সব পিঠা উৎসবের আয়োজন হয়ে আসছে সেই প্রাচীনকাল থেকে। তাছাড়া রয়েছে নানা ধরনের স্পেশাল সব খাবার, পিঠা-পুলি কিংবা পায়েস।

বর্তমান সময়ের পর্যটকগণ দর্শনীয় স্থানে ঘুরতে যেমন ভালোবাসেন তেমনি ঘুরার সময়ে নানা ধরনের সুস্বাদু খাবার খেতেও খুব পছন্দ করেন। উদাহরণস্বরূপ, সাজেক ভ্যালির ব্যাম্বো টি কিংবা ব্যাম্বো চিকেন এর কথা বলা যেতে পারে। সাজেক ভ্যালিতে যারা ঘুরতে আসেন তারা প্রায় সকলেই এই খাবার দুটি খেয়ে থাকেন এমনকি অনেকেই আছেন যারা শুধুমাত্র এই দুটি খাবার খেতে আসেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু খাবার রয়েছে যা খেতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন ছুটে আসে। যেমন ঢাকার বিরিয়ানী কিংবা বাকরখানী, বগুড়ার দই, যশোর বা রাজশাহীর খেজুরের গুড়, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম, চাঁদপুরের ইলিশ, সিরাজগঞ্জের সলপের ঘোল, ফরিদপুরের বাগাটের মিষ্টি, চট্টগ্রামের কালভুনা, কক্সবাজার কিংবা সুন্দরবনের শুটকি, সুন্দরবনের মধু, কিশোরগঞ্জের বালিশ মিষ্টি, টাঙ্গাইলের চমচম, মুন্সিগঞ্জের ভাগ্যকুল মিষ্টি, নরসিংদীর সাগর কলা, রাঙামাটির আনারস, কাঁঠাল, কলা, ফেনীর মহিষের দুধের ঘি ও খন্ডলের মিষ্টি, কুমিল্লার রসমালাই, কক্সবাজারের মিষ্টি পান, কুষ্টিয়ার তিলের খাজা, মেহেরপুরের রসকদম্ব, খুলনার চুকনগরের চুঁইঝাল দিয়ে হাঁসভূনা, সিলেটের সাতরঙা চা ও সাতকড়ার আচার, পটুয়াখালির মহিষের দই, বরিশালের আমড়া, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার মন্ডা, দিনাজপুরের লিচু ও চিড়া, নীলফামারীর ডোমারের সন্দেশ, উত্তরবঙ্গের সিদল ভর্তা, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, চাঁপাইনবাগঞ্জের কালাই রুটি ইত্যাদি। এছাড়াও আরো অনেক ঐতিহ্যবাহী খাবারের তীর্থস্থান বাংলাদেশ। আমরা সকলেই উপরোল্লিখিত কোনো না কোনো খাবার খাওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জেলাতে ভ্রমণ করে থাকি। এমনকি বিদেশ থেকেও পর্যটকগণ আসেন এসব ঐতিহ্যবাহী খাবার খেতে। এই যে খাবার খাওয়ার উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ভ্রমণ করা এটাই মূলত গ্যাস্ট্রোনোমি ট্যুরিজম বা খাদ্য পর্যটন। সুতরাং এটি বলাই বাহুল্য যে খাদ্য পর্যটন বাংলাদেশে খুবই সম্ভাবনাময় একটি খাত। সামনের বছরগুলোতে আরো বেশি জনপ্রিয় হবে খাদ্য পর্যটন। তখন এটিকে আমরা মূলধারার পর্যটন শিল্প হিসেবে বিবেচনা করতে পারবো এবং এটি আমাদের অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বাংলাদেশে গ্যাস্ট্রোনোমি ট্যুরিজমের সংকট ও উত্তরণের উপায়

নিরাপদ খাদ্য সংকট

খাদ্য পর্যটনের সংকটের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে নিরাপদ খাদ্যের কথা। আমরা যখন ভ্রমণে যাই তখন হঠাৎ করে বাইরের খাবার খেয়ে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ি। ফলে পুরো ভ্রমণের যে মাহাত্ম সেটি নষ্ট হয়ে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্যাটির সৃষ্টি হয় ফুড পয়জনিং থেকে। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা যেসব খাবার খেয়ে থাকি তা অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে তৈরি করা হয় ফলে খুব সহজেই এসব খাবারে অণুজীব মিশে গিয়ে খাবারের মান নষ্ট করে দেয়। তাই আমরা এসব খাবার খেলেই অসুস্থ হয়ে পড়ি। এই সমস্যা কাটিয়ে

উঠতে হয়ে খাদ্য প্রস্তুত, পরিবেশন সহ অন্যান্য সকল সময়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে রান্নাঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, রন্ধনশিল্পীর ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, কাঁচা ও রান্না করা খাবার আলাদা রাখা, রান্নায় পরিষ্কার বাসন ও পাত্র ব্যবহার করা, বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা, সঠিক তাপমাত্রায় রান্না করা ও সঠিকা তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা দরকার। তাহলেই কেবলমাত্র নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এজন্য আমাদের দেশের নিরাপদ নিশ্চিতের জন্য সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য খাদ্য পর্যটন এলাকাগুলোতে রন্ধনশিল্পী ও এলাকাবাসিদের নিয়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সেমিনার, সভা ও ক্ষুদ্র নাটিকা প্রদর্শনের আয়োজন করা যেতে পারে। এটি করা সম্ভব হলে সকলেই সচেতন হবে এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রশিক্ষিত জনবল

আমাদের দেশের রন্ধনশিল্পীদের রন্ধন বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পর্যাপ্ত নয় বিধায় তা খাদ্য পর্যটন শিল্পের জন্য সুখকর নয়। তাই খাদ্য পর্যটনের সাথে সম্পর্কিত রন্ধনশিল্পীদের রান্নাবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা গেলে খাদ্য পর্যটন সমৃদ্ধ হবে।

পর্যটনে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার

বর্তমান ইন্টারনেটের যুগ। বাংলাদেশেও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল পাচ্ছে। তাই ইন্টারনেটের অবাধ প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে সোশাল মিডিয়া ও ভিডিও স্ট্রিমিং সাইটের মাধ্যমে দেশীয় খাবারকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারলে খাদ্য পর্যটনের সঠিক বিকাশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

প্রচার প্রচারণা

বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় রয়েছে নানা ধরনের খাবার। এসব খাবার সম্পর্কে অনেকেই জানেন না। ঐতিহ্যবাহী দেশীয় খাবারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্রান্ডিংয়ের উদ্দেশ্যে সরকারিভাবে আরও প্রচার প্রচারণা বাড়ানো প্রয়োজনে। বিশেষ করে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

নিরাপদ আবাসন

বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার যেসব এলাকায় পাওয়া যায় সেখানে নিরাপদ ও মানসম্মত আবাসনের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। এসব এলাকায় নিরাপদ ও মানসম্মত বাসস্থানের সংখ্যা ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি করা গেলে খুব সহজেই পর্যটকদের আকৃষ্ট করা যাবে।

ওয়ার্ল্ড ফুড ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশনের তথ্যমতে "গন্তব্যের ভ্রমণ সক্ষমতার উপর নির্ভর করে পর্যটন ব্যয়ের অন্তত ১৫ থেকে ৩৫ শতাংশ ব্যয় হয় শুধু খাদ্য ও পানীয়ের সরবরাহ নিশ্চিত করতে।" সুতরাং এটি স্পষ্ট বোঝাই যাচ্ছে খাদ্য পর্যটন থেকে একটি দেশের অর্থনীতি খুব সহজেই চাঙা হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের তথ্যমতে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ৫১টি দেশের পর্যটক ভ্রমণ করবে যেখান থেকে ১০% জিডিপি আয় করা সম্ভব। এটিও আমাদের খাদ্য পর্যটনের জন্য বিশাল একটি সুখকর বার্তা।

স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী পার করলেও পর্যটন শিল্পের সঠিক বিকাশ এখন পর্যন্ত ঘটেনি। বিশেষ করে খাদ্য পর্যটন এখন রয়ে গেছে অবহেলিত। খাদ্য পর্যটন শিল্প এভাবে অবহেলিত থাকলে এসডিজি ও রুপকল্প-২০৪১ অর্জন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা ও রুপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়ন করতে চাইলে গ্যাস্ট্রোনোমি ট্যুরিজমকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তা হলেই বাংলাদেশ পরিণত হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় আর দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশে। খাদ্য পর্যটন হোক আগামীর অর্থনীতির চালিকাশক্তি এই প্রত্যাশা রইলো।

লেখক : প্রভাষক, খাদ্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

হালাল পর্যটন ও বিশ্বায়ন

বেনজির আহমেদ

চিত্তবিনোদন কিংবা শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণই পর্যটনের মূল কথা। অধিকন্তু শারীরিক ও মানসিক উদ্যম বাড়ানোর পাশাপাশি পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য মানুষ এক দেশ থেকে আরেক দেশে কিংবা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ভ্রমণ করে থাকে। মুসলিম জাতি-গোষ্ঠীর জন্য ইসলামের পরিসীমার মধ্যে পর্যটনের যাবতীয় স্বাদ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করাকেই হালাল পর্যটন বলে। হালাল ট্যুরিজমের বিষয়টি মাথায় রেখে মালয়েশিয়া, তুরস্কসহ অনেক দেশ মুসলিম পর্যটকদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে মিল রেখে বিশ্বব্যাপী মুসলিম পর্যটকদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। মুসলিম পর্যটকদের প্রয়োজন আর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে 'হালাল ট্যুরিজম'–এর জন্ম, বিকাশ এবং প্রসার। ২০২৬ সালের মধ্যে এ বাজারের আয়তন হবে প্রায় ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গ্লোবাল মুসলিম ট্রাভেল ইনডেক্স ২০১৮ অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান মুসলিম পর্যটক, আয় বৃদ্ধি এবং হালাল সেবা সহজলভ্য হওয়ার কারণে এ বাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলাম বর্তমান পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং সর্বোচ্চ হারে ক্রমবর্ধমান ধর্ম।

শুধু ওআইসিভুক্ত রাষ্ট্রসমূহই নয়; এর বাইরে জাপান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াসহ অন্যান্য দেশগুলোও হালাল ট্যুরিজম নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ করছে। হালাল ট্যুরিজমের পূর্বশর্ত হচ্ছে ইসলামিক কালচারভুক্ত সর্বজনীন বিষয়াবলি নিশ্চিতসহ অন্যান্য বিনোদনমূলক সুযোগ বিদ্যমান থাকা। মাস্টারকার্ডের সহযোগিতায় জিএমটিআই প্রতিবছর সেরা মুসলিম ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন নির্বাচন করে। গত আট বছর ধরে মালয়েশিয়া শীর্ষ মুসলিম ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন হিসেবে অবস্থান করছে। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে ইন্দোনেশিয়া, এরপরে সংযুক্ত আরব আমিরাত, তুরস্ক, সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, ওমান, মরক্কো এবং কুয়েত। ওআইসি দেশসমূহের বাইরে প্রথমেই সিঙ্গাপুরের স্থান। তারপরে থাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, জাপান, তাইওয়ান, হংকং, দক্ষিণ আফ্রিকা, জার্মানি, ফ্রান্স এবং অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস দূর করে সৌহার্দ-সম্প্রীতি স্থাপনে হালাল ট্যুরিজম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

হালাল ট্যুরিজম বিস্তারে মালয়েশিয়া, আরব আমিরাত ও তুরস্ক উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এর অন্যতম হলো- 'হালাল হলিডে'। মালয়েশিয়ায় ইতোমধ্যে পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে ৫৫ শতাংশ। মালয়েশিয়ার পর তুরস্কে চালু হওয়া হালাল হলিডে মুসলমানদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তুরস্কের ওমে ডিলাক্স হোটেলের মহাব্যবস্থাপক ইউসুফ জারসেকার জানান, কয়েক বছর আগেও তাদের হোটেলে আসা পর্যটকদের ৮০-৯০ শতাংশ ছিলেন তুর্কি। আর এখন ৬০ শতাংশ অতিথিই হচ্ছেন বিদেশি। বিদেশি পর্যটকদের বেশিরভাগই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বাসিন্দা।

২০২১ সালের ৮ম ওআইসি এবং সপ্তম বিশ্ব হালাল শীর্ষ সম্মেলনের সময় তুরস্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, দিন দিন বিশ্ব বাণিজ্যে হালাল অর্থনীতির পরিধি বাড়ছে। বিষয়টি আর অনুমাননির্ভর কিংবা জাগরণী কোনো মন্তব্য নয়। তিনি আরও বলেন, ২০১৭ সালে হালাল অর্থনীতি ছিল ৪০ লাখ কোটি ডলারের। এখন তা ৭০ লাখ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। হালাল অর্থনীতির যে ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে, এটা তারই প্রমাণ বহন করে।

বৈচিত্র্যময় এ পৃথিবীতে আছে ঐতিহাসিক, রহস্যঘেরা ও নয়নাভিরাম বহু স্থান। যা দেখতে ছুটে যায় পৃথিবীর নানা প্রান্তের পর্যটকরা। মুসলিম বিশ্বের এমন জনপ্রিয় সাতটি পর্যটনকেন্দ্র নিম্নরূপ :

নকশে জাহান স্কয়ার

ইরানের ইস্পাহান শহরে অবস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইসলামি পর্যটনকেন্দ্র নকশে জাহান স্কয়ার। ১৫৯৮ সালে শাহ আব্বাস তার সাম্রাজ্যের রাজধানী কাজিন থেকে ইস্পাহানে স্থানান্তরিত করার সময় পারস্যের প্রধানকেন্দ্র হিসেবে নির্মাণ শুরু করেন। ৫২০ ফুট প্রশস্ত এবং ১৮৪০ ফুট দীর্ঘ এই স্কয়ারটি শাহ স্কয়ার বা ইমাম স্কয়ার নামেও পরিচিত। চত্বরটি সাফারীয় যুগের ভবন দ্বারা বেষ্টিত। এর দক্ষিণে শাহ মসজিদ, পশ্চিমে আলী কাপু প্রাসাদ, পূর্বে শেখ লোতফ আল্লাহ মসজিদ এবং উত্তরে কায়সারি গেট ইসফাহান গ্র্যান্ড বাজারের দিকে অভিমুখী। বর্তমানে শাহ মসজিদে জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।

জালুলু হাম্মাম

তুরস্কের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র তুর্কি আদালতের স্থপতির নকশাকৃত ইস্তাম্বুলের ঐতিহাসিক জালুলু হাম্মাম। এখানে পর্যটকদের বিশেষ যত্নে ঐতিহ্য ও আধুনিক পদ্ধতির সমন্বয়ে গোসল করানো হয়। এটি ১৭৪১ সালে নির্মিত। এখানে ইস্তাম্বুলের বৃহত্তম স্প্ল্যাশিং ঝরনা ও হালকা ফিল্টারিং গম্বুজ রয়েছে। বাথহাউসগুলো গম্বুজযুক্ত এবং অষ্টভুজাকার রুম কেন্দ্র করে নির্মিত।

জিয়ান মুসলিম কোয়ার্টার

এটি চীনের জিয়ান শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, যা বেল টাওয়ার ও ড্রাম টাওয়ারের কাছাকাছি। মুসলিম কোয়ার্টারের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ আঠারো শতকে নির্মিত গ্র্যান্ড মসজিদ। এছাড়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বাণিজ্যিক কারণে মুসলিম কোয়ার্টার বেশ জনপ্রিয়। অধিকন্তু ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের জন্য পর্যটকদের কাছে বেশ প্রিয়।

আলহামরা প্রাসাদ

স্পেনের গ্রানাডা শহরের পশ্চিমে সাবিক পাহাড়ের উপরে দুর্লভ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থানে অবস্থিত দৃষ্টিনন্দন আলহামরা প্রাসাদ। নবম শতাব্দীতে এ স্থানে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত এক রোমান দুর্গ। নাসিরিদ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ বিন আল হামার এখানে আসার পূর্বে আলহামরা আর দশটা দুর্গের মতোই ছিল। তিনি এখানে রাজকীয় বাসভবন নির্মাণ করলে আলহামরার সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল সময়ের সূচনা ঘটে। তবে আজকের যে আলহামরা নির্মাণের কৃতিত্ব সুলতান প্রথম ইউসুফ ও পঞ্চম মুহাম্মাদের। আলহামরার অতুলনীয় ও জমকালো অভ্যন্তরীণ সজ্জা তাদের হাত ধরেই এসেছিল। আলহামরায় ১৭৩০ মিটার দেয়ালে ঘেরা শহরের ভিতরে রয়েছে ৩০টি টাওয়ার আর ৪টি সদর দরজা। আলহামরার সবচেয়ে বিখ্যাত স্থাপনা ০৩টি হলো চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত কোমারিস প্যালেস, কোর্ট অব লায়ন ও পার্টাল প্যালেস।

আরব স্ট্রিট

সিঙ্গাপুরের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোর অন্যতম আরব স্ট্রিট একটি জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। ব্রিটিশ-মোঘল নকশায় আইরিশদের নির্মিত সুলতান মসজিদ এখানে অবস্থিত, যার চারপাশে রয়েছে মুসলিম ব্যবসাকেন্দ্র। রেস্তোরাঁয় আরবীয় খাবার, পার্সিয়ান কার্পেট, জায়নামাজ, চামড়া ও বুটিকের জুতা, চন্দনকাঠের সুগন্ধির জন্য বিখ্যাত আরব স্ট্রিট।

আরব ওয়ার্ল্ড ইনস্টিটিউট

আরব ওয়ার্ল্ড ইনস্টিটিউট প্যারিসের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্পর্কে তথ্য গবেষণা ও প্রচারের জন্য ১৯৮০ সালে ফ্রান্স এবং ১৮টি আরব দেশ যৌথভাবে ফ্রান্সের প্যারিসে আরব ওয়ার্ল্ড ইনস্টিটিউট নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। আরব সভ্যতা, শিল্প, জ্ঞান ও নান্দনিকতার প্রচারের জন্য একটি জাদুঘর, গ্রন্থাগার, মিলনায়তন, রেস্তোরাঁ, অফিস ও সভাঘর নির্মাণ করা হয়। জাদুঘরটি আরব ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন দিয়ে সাজানো এবং সমসাময়িক আরব শিল্প থেকে আরব-আফ্রিকান ইসলামি সংস্কৃতির বহু নিদর্শন এখানে স্থান পেয়েছে।

কায়রো

ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র মিশরের রাজধানী কায়রো। এখানে ইসলামি সভ্যতার বহু নিদর্শন রয়েছে। শহরজুড়ে রয়েছে অসংখ্য প্রাচীন স্থাপনা, মসজিদ ও মাদরাসা। কায়রো জাদুঘরগুলোতেও আছে ইসলামের ঐতিহাসিক অনেক নিদর্শন। কায়রোর জনপ্রিয় ইসলামী পর্যটন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে আছে মিসরীয় জাদুঘর, ইসলামি আর্ট জাদুঘর, আল-আজহার মসজিদ, আহমাদ ইবনে তুলুন মসজিদ, সুলতান হাসান মসজিদ, আল-আজহার পার্ক, তাহরির স্কয়ার, দ্য সিটাডেল, গেজারিয়া ইত্যাদি।

ইসলামের হালাল-হারাম বিধান অনুযায়ী হালাল খাদ্য, হালাল পণ্য, হালাল পর্যটন, হালাল অর্থনীতি ইত্যাদির ভিত্তি গড়ে উঠেছে। এখন মুসলিম দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হালাল খাদ্য, পণ্য ও পরিবেশের নিশ্চয়তা থাকায় মুসলিম পর্যটকদের সংখ্যা বাড়ছে। ইতোমধ্যে তুরস্কের অর্থনীতির অপরিহার্য উৎসে পরিণত হয়েছে পর্যটনশিল্প। অন্যান্য মুসলিম দেশ বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এ ক্ষেত্রে বেশ এগিয়ে গেছে।

হালাল খাদ্য ও পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলো পিছিয়ে আছে। বর্তমানে হালাল খাদ্য ও পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে প্রথমেই ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, নিউজিল্যান্ড উল্লেখ্য, যারা অমুসলিম দেশ হিসাবে পরিচিত। প্রধানত অমুসলিম দেশ থেকেই তাদের পণ্যের জোগান আসে। মুসলিম দেশও এই বাজারটি দখলে নিতে পারে, যদি হালাল ও মানসম্মত পণ্য রপ্তানি করতে পারে। হালাল খাদ্য ও পণ্যের বিশ্ববাজার দখল করতে হলে মুসলিম দেশগুলোকে সর্বাগ্রে পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রতিষ্ঠান ও উত্তম ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য চাই উদ্যমী উদ্যোক্তা, পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ও সরকারের নীতি সহায়তা।

মুসলিম পর্যটকের সংখ্যা, আর্থিক সামর্থ্য ও সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় হালাল ট্যুরিজমের প্রতি আগ্রহী হচ্ছে পর্যটন কোম্পানিগুলো। নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, ২০১৬ সালের পর মুসলিম পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে ৩০ শতাংশ এবং আগামী দশকে এর আর্থিক পরিমাণ দাঁড়াবে ৩০০ মিলিয়ন ডলার। পর্যটননির্ভর অর্থনীতির দেশগুলো এরই মধ্যে হালাল ট্যুরিজমে মনোযোগী হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যেসব বৌদ্ধপ্রধান দেশে মুসলিম নাগরিকদের নানাভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়, তারাও হালাল ট্যুরিজমকে গুরুত্ব দিচ্ছে। 'বুকিং ডটকম' ও 'ট্রিপ অ্যাডভাইজার'-এর মতো কোম্পানিগুলো হালাল ট্যুরিজমের জন্য পৃথক প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করেছে। 'বুকহালালহোমস ডটকম' জনপ্রিয় একটি পোর্টালে পরিণত হয়েছে, যা নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে ট্যুরিস্ট এজেন্সি ও হোটেল কোম্পানিকে হালাল ট্যুরিজমের সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে। 'হালাল ট্রাভেল গাইড',

'ক্রিসেন্ট রেটিং' ও 'হালাল ট্রিপ'-এর মতো হালাল ট্যুরিজম সাইটের ভিজিটরও প্রতিদিন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।

দ্য ট্যুরিজম অথরিটি অব থাইল্যান্ড মুসলিম পর্যটকদের সুবিধার্থে একটি অ্যাপ তৈরি করেছে, যার সাহায্যে মুসলিম পর্যটকরা খুব সহজে হালাল পণ্য ও সেবা খুঁজে পান। পাশাপাশি স্থানীয় নামাজ-রোজার সময়, হালাল খাদ্যের তালিকা, পর্যটন স্পট সম্পর্কে ধারণা দেবে অ্যাপটি। 'হালালট্রিপ' নামের আরেকটি অ্যাপ বিশ্বের ৬৫টির বেশি দেশের হালাল পণ্য, খাবার ও নামাজের সময় সম্পর্কে নির্দেশনা দেয় পর্যটকদের। ভবিষ্যতে হালাল ট্যুরিজম বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা করছেন অর্থনীতিবিদরা।

হালাল খাদ্য ও পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্ভাবনা মোটেই কম নয়। এ সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে অর্থনীতিতে একটা নবধারা সংযোজন সম্ভব। কী ধরনের পণ্য বাংলাদেশ উৎপাদন ও রপ্তানি করতে পারে, তার তালিকা প্রণয়নপূর্বক উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেকোনো পণ্য উৎপাদনের আগে প্রয়োজনে বিস্তর গবেষণার আশ্রয় নিতে হবে। হালাল পণ্যের সনদ একটি অপরিহার্য বিষয়। আলাদা একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সনদের স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করাও বাধ্যতামূলক। সনদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও থাকতে হবে। একটি পৃথক সংস্থা গড়লে মুসলিম দেশগুলো হালাল খাদ্য ও পণ্যের বাজার একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যথাসময়ে একটি কমন মার্কেট গঠিত হলে মুসলিম বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বিকাশ এখন অন্য জায়গায় থাকতো। হালাল খাদ্য ও পণ্যের বাজারে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে চিন্তাভাবনা করত দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। সময়ের এ দাবি পূরণে বেসরকারি উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসতে পারেন।

হালাল পর্যটনের বিষয়টি সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে এর গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। কারণ স্বয়ং মহান রব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে মানুষকে পৃথিবীতে পর্যটক হিসেবে সৃষ্টির গুরুত্বকে অনুধাবন করার জন্য নির্দেশ দিয়ে সূরা আনকাবূতের ২০ নম্বর আয়াতে বলেন- "পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন।" অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহর সৃষ্টির বৈচিত্রময়তাকে অনুধাবনকরত মহান আল্লাহর প্রতি একচ্ছত্র ঈমান পোষণ করার জন্য পর্যটনের ভূমিকা অপরিসীম। অধিকন্তু পবিত্র কুরআনেও পর্যটক ও হালাল শব্দ দু'টিকে একই প্রেক্ষাপটে চয়ণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ সূরা মায়িদার ৯৬ নম্বর আয়াতে বলেছেন - "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও উহা ভক্ষণ করা হালাল করা হয়েছে তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য।" আর এই বিষয়টি হালালের সাথে সংযুক্ত হয়ে অধিক অর্থবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। কারণ, আবু হুরাইরা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, রাসুল (স.) বলেছেন, 'হে লোকসকল! আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না।' (মুসলিম-১০১৫-ফু.আ.বা) সুতরাং সার্বিক দিক বিবেচনাকরত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নপূর্বক পর্যটন শিল্পকে যদি সামগ্রিকভাবে হালাল পর্যটনে বিশ্বায়ন সম্ভব হয় তাহলে তা মুসলিম জাতির চিত্তবিকাশের পাশাপাশি কোনো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রায়ও পৃষ্ঠাঙ্কন করবে দৃঢ়চিত্তে।

লেখক : ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত

পর্যটন-সম্ভাবনা : ছোটো ছোটো উদ্যোগ বদলে দেবে চিত্র

আবু আফজাল সালেহ

পর্যটনে বাংলাদেশের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন স্পট/শ্রেণির স্পট আকৃষ্ট করতে সক্ষম। বড় কিছু উদ্যোগের সঙ্গে দরকার ছোটো-ছোটো পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। ছোটো ছোটো অথচ গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদ্যোগ বদলে দেবে বাংলাদেশের পর্যটন-খাত। বিশ্ব জানে, বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত রয়েলবেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। কান্তজিও, পাহাড়পুর-সহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, মসজিদ-মন্দির-প্যাগোডা-সহবিভিন্ন ধর্মীয় স্থাপনা। জল-পাথর-বন-পুরাকীর্তি-উপজাতি-চা নিয়ে বাংলাদেশের ট্যুরিস্টস্পট অনেক সমৃদ্ধ। বৈচিত্র্যময় কৃষ্টিকালচারে দেশি-বিদেশি পর্যটক আকর্ষণ করা সম্ভব।

পর্যটনকে বলা হয় অদৃশ্য অর্থনৈতিক শক্তি। পর্যটন হচ্ছে বিশ্বের শীর্ষ আয়ের খাতের একটি। পর্যটন শিল্প অনেক উন্নয়নশীল দেশের জন্য Life blood হিসেবে কাজ করে ওইসব দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। এ-শিল্পের সাথে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে অনেক শিল্প নির্ভর করে। পর্যটন একটি বহুমাত্রিক ও শ্রমঘন শিল্প। সবচেয়ে দ্রুত সম্প্রসারণশীল ও বৃহৎ বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড হিসেবে এ-শিল্প বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রচুর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় পর্যটন খাত থেকে। পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সেক্টর (যেমন–পরিবহন, হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ, রিসোর্ট, এয়ারলাইন্স ও অন্যান্য) যোগাযোগের মাধ্যম থেকে পৃথিবীর অনেক দেশ প্রতি বছর প্রচুর রাজস্ব আয় করে, যা অন্য যে কোনো বৃহৎশিল্প থেকে পাওয়া আয়ের চেয়ে বেশি। আমাদের সম্ভাবনাও প্রচুর রয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের জন্য অত্যন্ত অনুকূল।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য আলাদা পরিকল্পনা নিতে হবে। একইসঙ্গে পাহাড়, সমুদ্র সৈকত, নদী, পাথর, বনাঞ্চল, ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্থাপত্য, বিভিন্ন ধর্মীয় স্থাপনা ইত্যাদির প্যাকেজ পৃথিবীর আর কোনো এককস্থানে নেই। শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চলে পর্যটনে আলাদা গুরুত্ব দিতে হবে, বাজেট বাড়াতে হবে। সুন্দরবন হচ্ছে আকর্ষণীয় একটি বিষয়। কিন্তু বনের বিভিন্ন অংশ সরকারের ভিন্ন ভিন্ন দপ্তর নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। এতে উন্নয়নে স্থবিরতা হয়। ফলে, সুন্দরবনের জন্য দপ্তর/বিভাগ চালু করা যেতে পারে। আলাদা দপ্তর করা গেলে সুন্দরবনের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ একার হাতেই থাকবে। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সহজ ও অল্পসময়ে করা সম্ভব হবে। আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবনের জন্য আলাদা দপ্তর ও মন্ত্রী রয়েছে। অথচ ৬২ শতাংশ সুন্দরবন বাংলাদেশের হয়েও আলাদা কোনো দপ্তর নেই। ইকোট্যুরিজম সর্বোচ্চ কাজে লাগানো দরকার। এক্ষেত্রে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছোটো ছোটো অনেক স্পট গড়ে উঠেছে। তবে বড় বড় স্পটগুলিতে পর্যায়ক্রমে পর্যটনবান্ধব করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

বিদেশি পর্যটক যেদেশে যত বেশি সেদেশের পর্যটন থেকে আয় ততই বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ফ্রান্স বা ইউরোপে বিদেশিদের আনাগোনা অনেক বেশি। তাই এসব দেশে পর্যটন থেকে আয়ের পরিমাণও বেশি। এশিয়ার মধ্যে চীন, থাইল্যান্ডে পর্যটন খাত থেকে আয়ের পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণও কিন্তু বিদেশি পর্যটক। ভারত বা শ্রীলংকায় আমাদের অঞ্চলে পর্যটন আয় বেশি। কারণ তাদের পরিকল্পিত চিন্তাভাবনা। ছোটরাষ্ট্রসমূহ (যেমন হংকং, সিংগাপুর, ম্যাকাউ, মালদ্বীপ, ফিজি) কিন্তু পর্যটন খাত থেকে প্রচুর আয় করে শুধু বিদেশিদের

আনাগোনার জন্যই। চীন, জাপান, মালয়েশিয়া পর্যটন খাত থেকে প্রচুর আয় করে দেশি পর্যটকের চেয়ে বিদেশি–পর্যটকের জন্য। উল্লিখিত দেশের পর্যটনখাতে চীনের পর্যটক আয়ে বড় ভূমিকা পালন করছে। পর্যটনশিল্পের প্রচারের জন্য ট্রেন/বাস/স্টিমার/লঞ্চ প্রভৃতির যাত্রী টিকিটে সংশ্লিষ্ট এলাকার ট্যুরিস্টম/ঐতিহ্যের ছবি সংযুক্ত করা যায়। সংশ্লিষ্ট ট্রেন স্টেশন থেকে টিকিটে সেই এলাকার পর্যটন এলাকার ছবি ও একেবারেই সংক্ষিপ্ত শিরোনাম দিতে হবে। এতে মনের অজান্তেই যাত্রীগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকা/ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন। জেলাভিত্তিক না-করা গেলেও রেলের টিকিটে অঞ্চলভিত্তিক এ উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। তবে বাস বা নৌযাত্রীদের টিকিটে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রাধান্য দিতে হবে। আর একটি সুপারিশ খুব কার্যকর হতে পারে–সেটি হলো ট্রেন স্টেশনগুলোতে বা বাস টার্মিনালে বা নৌবন্দরে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভ্রমণের চিত্র দেওয়ালে তুলে ধরা যায় এবং ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করলে খুব ভালো হবে। ট্রেনের অপেক্ষায় থাকা যাত্রীগণ নিকটস্থ স্পট ঘুরে আসতে অনুপ্রাণিত হবে বলে মনে করি। বিশ্বে চীনা পর্যটকেরা বেশি ব্যয় করে। চীনের নাগরিকের বেশিরভাগ বৌদ্ধধর্মালম্বী। তাই তাদের আকৃষ্ট করতে বৌদ্ধস্থাপনাগুলোতে যোগাযোগ ও অন্যান্য সুবিধা বাড়াতে হবে। চীনা পর্যটকদের আনতে পারলে অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার হবে। থাইল্যান্ড বা মালয়েশিয়ায় পর্যটনখাতে অনেক এগিয়ে। দেখা যায়, চীনা পর্যটকের হার অনেক বেশি এ দুদেশে। ভারতেও পর্যটন থেকে আয় অনেক হয়। কিন্তু শুধুমাত্র চীনা/জাপানিদের উল্লেখিত দুদেশের সমান হতে পারেনি। তাই, উল্লিখিত দুই দেশ থেকে ভারত পিছিয়ে। বিশ্বপর্যটকের বড় একটি অংশ খ্রিষ্টান ধর্মের। অনেক পর্যটক বিভিন্ন ধর্মের প্রসিদ্ধ স্থাপনা ভ্রমণ করতে ভালোবাসেন। তাই, ধর্মীয় ঐতিহ্য ও স্থাপনাগুলোতে অধিক নজর দেওয়ার দরকার বলে মনে করি। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের স্থাপনাতেও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বিশেষ নজর দিতে হবে।

পাঠ্যপুস্তকে আরও বেশি করে ট্যুরিস্ট-স্পট নিয়ে লেখা, ছবি অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অনেক উন্নত দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কালচার সম্পর্কে বাস্তব অবস্থা জানতে পারে এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় সহযোগী হতে পারে। বিভিন্ন দূতাবাসে লিফলেট বা তথ্যসংবলিত ম্যাপ/বই প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে বিদেশি/প্রবাসীদের আকর্ষণ করা যাবে। ভারতের ভ্রমণস্পটগুলো প্রচারের জন্য বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেছে। এর জন্য বিভিন্ন সাইটও খুলেছে অনলাইনে। এগুলো খুবই তথ্যসমৃদ্ধ। যেমন একটা সাইট: 'ইনক্রিডেবল ইন্ডিয়া'। ভিডিও, ছবি এবং তথ্যে সমৃদ্ধ একটি পর্যটন সাইট। ভারতের মতো আমরাও এরকম বিভিন্ন সাইট খুলতে পারি। আর সেসব সাইট বিদ্যমান সেগুলো আরও তথ্যসমৃদ্ধ করতে পারি। অনেক বিদেশি পর্যটক অনেকসময় খোলামেলা পরিবেশ পছন্দ করেন। এসব সেদেশের কৃষ্টি-কালচার। বিদেশিদের জন্য কক্সবাজার, কুয়াকাটা বা সৈকত এলাকায় সংরক্ষিত এলাকা তৈরি করা দরকার। বাঙালির ভিড় এড়িয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারলে বিদেশি পর্যটক আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি ট্যুরিস্ট স্পটগুলোতে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত গাইডও তৈরি করতে হবে আমাদের। যারা বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজিতেও দক্ষ হবেন, কৌশলী হবেন। বিদেশিদের আস্থা অর্জন করতে পারবে। এ-জন্য পর্যাপ্ত ট্রেনিং ব্যবস্থা নিতে হবে। ইংরেজি বা অন্যান্য ভাষার গাইডদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। তবে দালালদের দৌরাত্ম রুখে দিতে হবে। দালালদের কার্যক্রম বিদেশি পর্যটকদেরকে অসন্তুষ্ট করে থাকে। রিকশা ড্রাইভারসহ নৌকা, কার, মাইক্রোবাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে মুনাফালোভীদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। এগুলি মাঝেমধ্যে খুবই পীড়াদায়ক হয়। বিদেশিদের জন্য আমরা আলাদা জোন করতে পারি। সেখানে আবাসিক ব্যবস্থা, বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। পর্যটন স্থানগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো আবশ্যক। নিরাপত্তার অভাব, চুরি বা ছিনতাই, রাস্তা বা ট্যুরিস্টস্পটের নোংরা পরিবেশ ইত্যাদি বিদেশিদের কাছে চিন্তার কারণ। অনেক স্পটে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয়। ট্রেন যোগাযোগ বিদেশিরা পছন্দ করে। এটি আরামদায়ক। এক্ষেত্রে বিদেশিরা যেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে তেমনই বিপুল পরিমাণ খরচ করবে তারা। এতে আমরাই লাভবান হব। ভারতে দেখেছি ট্রেনে বিদেশিদের জন্য আলাদা টিকিটের ব্যবস্থা আছে। আমরাও তা করতে পারি। রেলসুবিধা বাড়াতে হবে যাতে বিদেশিরা আরামদায়ক বোধ করে। বর্তমান সরকারের আমলে রেলের অনেক উন্নয়ন সাধন হয়েছে। কক্সবাজার পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ

করা হয়েছে। যেসব পর্যটন এলাকাগুলোতে রেললাইন নেই সেখানে রেললাইন সম্প্রসারণ করতে হবে।

দেশের বর্তমানের ১৭ জি-আই পণ্যকে দেশি-বিদেশি পর্যটকের কাছে পরিচিত করতে হবে। পাশাপাশি প্রসিদ্ধ কিছু খাবার/জিনিস যোগ হতে পারে। অনেক পর্যটন স্পটে যাওয়ার কানেক্টিং রোড অপ্রশস্ত ও খারাপ। পর্যটন স্পটে যাওয়ার কানেক্টিং/লিংকরোডের উন্নয়ন করতে হবে। জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে পাহাড়পুর কানেক্টিং রোড বা রামসাগর লিংকরোড উদাহরণ হতে পারে। এগুলি প্রসস্ত, সংস্কার বা নির্মাণ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ, ঐতিহাসিক, ও প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর/স্থাপনা উন্নয়ন করতে হবে। উপজাতি সংস্কৃতির বিকাশ করতে ব্যবস্থা নিতে হবে। চা-শিল্পের উন্নয়ন ও বিস্তার করলে পর্যটক বাড়বে। নদী ও গ্রামীণ পর্যটনের উন্নয়ন ও বিকাশে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড গ্রামীণ পর্যটন থেকে অনেক আয় করে। আমাদের গ্রাম ও নদীকেন্দ্রিক পর্যটনে জোর দিতে হবে। হাওর পর্যটনে গুরুত্ব দিতে হবে। হাওরে উন্নয়ন করতে হবে। পর্যটন-স্পটগুলোতে নারী ও প্রতিবন্ধী পর্যটকদের জন্য বিশেষ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। ওয়াসরুম ও নিরাপত্তা বাড়াতে হবে। দুপ্ক-কর্নার করা যেতে পারে। জেলা ব্র্যান্ডিং জোরালো করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রচার বাড়াতে হবে। একইসঙ্গে বড় বা সব স্পটে হাত দিতে না-পারলেও পকেট পকেট পর্যটন স্পট বিকশিত করার পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। গুচ্ছ উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন–(১) বর্ডার ট্যুরিজম: চায়না-ভিয়েতনাম বোর্ডার ট্যুরিজম খুব কাজে দিচ্ছে। বাংলাদেশে–ভারত সীমান্ত হতে পারে আমাদের বিরাট সম্ভাবনা। যেমন 'বর্ডার হাট' একটি ভালো পরিকল্পনা। (২) ধর্মীয় স্থাপনা: ভারত-শ্রীলংকা-নেপাল হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিদর্শন ভ্রমণ করেন অনেকে। বাংলাদেশ-ভারত মুসলিম-হিন্দু স্থাপনা এমন দৃষ্টান্ত হতে পারে। (৩) শহর পর্যটন: প্যারিস (র‍্যাংকিং-১), বেইজিং(২), সাংহাই(৩), ম্যাকাউ(৬), টোকিও(৭), ব্যাংকক(১০), সিংগাপুর(১২) বিশ্বেও শীর্ষস্থানীয় জিডিপি-তে অবদান রাখা শহর। প্রথম তিন শতভাগ শহরভিত্তিক পর্যটন। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পর্যটন স্পট বিবেচনায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম পর্যটনশহর (পার্শ্ববর্তী শহরসহ) হতে পারে। (৪) অডিও/ভিডিও/চিত্র প্রকাশ: তাজমহলসহ ভারতের অনেক ট্যুরিস্ট স্পটে দেখেছি বিভিন্ন স্থাপনায় অডিওসেট করা। সেখানে চাপ দিলেই বিভিন্ন তথ্য (হিন্দি-ইংরেজি) পাওয়া যাবে। এরকম ব্যবস্থা নিলে আমরাও বিদেশি পর্যটককে তথ্য দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারব। প্রয়োজনে ভিডিও/এপস চালু করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে যাবেন পর্যটক। (৫) ছুটি: নভেম্বর-ডিসেম্বর-জানুয়ারি–এই তিন মাসে শুক্রবার ও শনিবারের সঙ্গে রবি বা বৃহস্পতিবার একদিন ছুটি (দুই-তিন সপ্তাহে) প্রদান/বর্ধিতকরণ করা ভালো কাজ হতে পারে। এতে চাকরিজীবিরা তিনদিনের ছুটি পাবেন এবং পর্যটনে উৎসাহিত হবেন। এতে বিপুল রাজস্ব আদায় হবে। পর্যটনসংশ্লিষ্ট শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন হবে। গতবছর (২০২২ সালের ২৫ ডিসেম্বর রবিবার হওয়ায় পর্যটন স্পটগুলিতে প্রচুর চাপ হয় ও বিপুল রাজস্ব আয় সম্ভব হয়েছে। (৬) পুরস্কার ও প্রণোদনা : পর্যটনসংশ্লিষ্ট লেখক, সংগঠন ও ট্যুর আয়োজনকারীদের মধ্যে র‍্যাংকিং করে পুরস্কার প্রণোদনা বা স্বীকৃতি দিলে ভালো হবে। এতে করে লেখকরা সংবাদপত্রে আরও বেশি বেশি ফিচার প্রকাশ করতে আগ্রহী হবে। (৭) অভিজ্ঞতা বাস্তবায়ন: পার্শ্ববর্তী দেশ থাইল্যান্ড, ভারত, শ্রীলংকা ও নেপাল পর্যটনে অনেক আয় করে। এসব দেশের বিভিন্ন উদ্যোগ/অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে রূপান্তর করে বাস্তবায়ন করা ফলপ্রসু হবে বলে মনে করি।

সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ইত্যাদি রাষ্ট্রের আমাদের দেশের মতো বৈচিত্র্যময় ট্যুরিস্টস্পট নেই। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, সি-বিচ, পাহাড়, ধর্মীয় স্থাপনা ইত্যাদির ভেরিয়েশন রয়েছে আমাদের দেশে। তারপরেও উল্লিখিত দেশে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে পর্যটনে শীর্ষস্থানীয় একটি খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, যানবাহনগুলোতে সুযোগসুবিধা বাড়িয়ে আমরা বিদেশি পর্যটক আকর্ষণ করতে পারি। পর্যটন বিশেষজ্ঞদের মতে বিপুল সংখ্যক পর্যটকের প্রায় ৭৩ শতাংশ ভ্রমণ করবেন এশিয়ার দেশগুলোতে। এছাড়াও বিশ্ব পর্যটন সংস্থার তথ্যমতে, এ শিল্প হতে ২৯ কোটি ৭০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে, যা বিশ্ব অর্থনীতিতে অবদান রাখবে ১০.৫ ভাগ। বাংলাদেশ যদি এ বিশাল বাজার ধরতে পারে তাহলে পর্যটনের হাত ধরেই বদলে যেতে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতি।

লেখক : কবি, ভ্রমণলেখক ও প্রাবন্ধিক

শরণখোলায় ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নে বিনিয়োগ সম্ভাবনা

মো: উসমান গনি

প্রারম্ভিকা

কপাল খুলছে বাংলাদেশের, ঢেলে দিচ্ছে প্রকৃতি। যে মুহূর্তে বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের সিংহভাগ ভূখণ্ড সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার আশংকায় বিশ্ব জুড়ে তোলপাড় চলছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেশের অভাবনীয় সম্ভাবনা সীমাহীন আশা জাগিয়ে তুলছে জনমনে। নতুন আশায় স্বপ্নের জাল বুনছে বাংলাদেশের মানুষ। প্রকৃতির খেয়ালি আচরণে ভাঙা-গড়ার নিষ্ঠুর খেলায় এক গুণ হারালে দশ গুণ দিচ্ছে আমাদেরকে। তাইতো অথৈ জলের মাঝে জেগে উঠছে মাইলের পর মাইল ভূ-খণ্ড, উন্নয়নশীল দেশটাকে সামুদ্রিক দুর্যোগ থেকে নিরাপত্তা প্রদানে রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের ফুসফুস খ্যাত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন। প্রকৃতির আশীর্বাদ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। প্রকৃতির দেওয়া দানকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রজেক্টের নির্দেশনা দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নে পরিবহন, পর্যটন, আবাসন, কটেজ-মোটেল, রেস্টুরেন্ট এমনকি শিল্পায়নের কাজেও বিনিয়োগের সিংহদ্বার তৈরি হয়েছে শরণখোলায়।

দেশে ও বিশ্বে পর্যটনের অবস্থান

পর্যটন শিল্প বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অ্যামাজন বন, নায়াগ্রা জলপ্রপাত, আইফেল টাওয়ার, তাজমহলসহ বিশ্ব সমাদৃত পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে সর্বাধিক পর্যটকের আগমন ঘটে। পর্যটন বিকাশে বাংলাদেশের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, সাজেক, জাফলং এবং আকাশলীনা ইকো-ট্যুরিজম, শ্যামনগর, সাতক্ষীরায় দেশি-বিদেশি পর্যটকে মুখরিত থাকে। পরিকল্পিতভাবে সম্ভাবনার সবটুকু কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে পর্যটনের ক্ষেত্রে মডেল হতে পারে। সুন্দরবন পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি। ১৯৯২ সালে 'রামসার সাইট' এবং এর তিনটি অঞ্চল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো ঘোষিত 'বিশ্ব ঐতিহ্য' এলাকা'র স্বীকৃতি লাভ করে। মোট আয়তনের ৬২% বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইকো-ট্যুরিজম বিনিয়োগে ও সুন্দরবন ভ্রমণের প্রবেশের জন্য নিকটতম দ্বার শরণখোলা।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটনের গুরুত্ব

পথ চলতেই মানুষের আনন্দ। দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করে মানুষ তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য পিপাসাকে নিবৃত্ত করে। ইবনে বতুতা, ভাস্কো-দা-গামা, কলম্বাস, ক্যাপ্টেন কুক, হিউয়েন সাং–সহ বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটকরা ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে আছেন। বিনিয়োগ সম্ভব হলে পর্যটন শিল্পের উন্নতির সঙ্গে যে সব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হতে পারে সেগুলো হলো:

- ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বেকারত্ব লাঘব
- প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন
- কুটির শিল্প ও মাঝারি শিল্পের সমৃদ্ধি
- অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- সরকারি বেসরকারি ও বৈদেশিক বিনিয়োগ
- বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি
- আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি ইত্যাদি

শরণখোলা বিনিয়োগ বান্ধব রেঞ্জ

বাগেরহাট জেলার অন্তর্গত শরণখোলার (অক্ষাংশ ২২০১৮'৪৪.৩"দক্ষিণে, দ্রাঘিমাংশ ৮৯০৫১'২৬.৮"উত্তরে) প্রকৃতি নন্দন কাননের সৌন্দর্যমণ্ডিত কোনো সার্থক চিত্রশিল্পীর নিখুঁত চিত্রকর্মের তুলনায় রোমাঞ্চকর। কেননা প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মননশীল চেতনা সমৃদ্ধ শিল্পীর তুলি। বিনিয়োগ বান্ধব এই শরণখোলা রেঞ্জ এলাকায় রিভার ভিউ পার্ক, বগী ফরেস্ট স্টেশন, টেরাবেকা টহল ফাঁড়ি, শরণখোলা ফরেস্ট স্টেশন ও রেঞ্জ অফিস, আলি বান্দা ইকো-ট্যুরিজম কেন্দ্র, সুপতি ফরেস্ট স্টেশন, কচিখালী, জামতলা সি-বিচ, কটকা, আলোরকোল, দুবলার চরসহ রয়েছে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নে বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনার সিংহদ্বার তৈরি হয়েছে।

শরণখোলা, মোংলা ও শ্যামনগর হতে তুলনামূলক দূরত্ব:

ক্রম	স্থান	দূরত
০১	শরণখোলা-কচিখালি মোংলা-কচিখালী শ্যামনগর-কচিখালী	৫৮ কি.মি ১৭২ কি.মি ১৬৪ কি.মি
০২	শরণখোলা জামতলা সি-বিচ মোংলা - জামতলা সি-বিচ শ্যামনগর- জামতলা সি-বিচ	৭৪ কি.মি ১৭৪ কি.মি ১৮৮ কি.মি
০৩	শরণখোলা-কটকা মোংলা- কটকা শ্যামনগর-কটকা	৭৬ কি.মি ১৬৭ কি.মি ১৭৮ কি.মি
০৪	শরণখোলা- দুবলার চর মোংলা - দুবলার চর শ্যামনগর-দুবলার চর	৯৪ কি.মি ১২৮ কি.মি ১৩৩ কি.মি

বলেশ্বর রিভারভিউ পর্যটন স্পট

স্বপ্নচারী সাবেক ইউএনও জনাব মো. নুর-ই-আলম সিদ্দিকীর পরিকল্পনায়, বাগেরহাট-৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এ্যাড. আমিরুল আলম মিলনের ৩১শে জুলাই ২০২৩ তারিখে 'বলেশ্বর রিভারভিউ পর্যটন স্পট'–এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। নয়নাভিরাম এই

পার্ক ইকো-ট্যুরিজম বিনিয়োগে অজস্র সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে। এটি Coastal Embankment improvement Project Phase-1(CEIP-1) চায়না কোম্পানি নির্মিত ৪৭ কি. মি. দৈর্ঘ্য বেড়ী বাঁধে অবস্থিত। উপজেলা পরিষদ হতে ২ কিলোমিটার ও উপজেলার প্রধান বাজার রায়েন্দা হতে ১ কিলোমিটার দূরে চোখ জুড়ানো মন ভুলানো পার্কটিতে প্রায় ৫০০ মিটার দৈর্ঘ্য, ১০০ ফিট প্রস্থ বিভিন্ন রং করা আসনে ৬৫৪০ জন একত্রে বসার ব্যবস্থা রয়েছে। হ্যালানো চেয়ারে মা-বাবা, ভাই-বোন অথবা প্রিয়জনকে নিয়ে গল্প করার সুযোগ। বাহারি দোলনায় উঠে শিশুকালের স্মৃতি মন্থন করা যাবে। লাভ গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে ফটোসেশন না করে কোনো পর্যটক ফিরতে চান না। রংধনু সার্কেলে নিজেকে আবিষ্কার করা বড়ই আনন্দের। ছাতার নিচে বীচ খাটে শুয়ে প্রচণ্ড গতির জোয়ার-ভাটা দেখার মতো লোভনীয় সুযোগের পাশাপাশি দেখা যাবে শত শত নৌকায় হাজারো জেলেদের জাতীয় মাছসহ প্রায় ১০০ প্রজাতির দেশি ও সামুদ্রিক মাছ ধরার দৃশ্য। চরকিতে উঠে স্নায়ুতন্ত্রের আড়ষ্ঠতা ভেঙে নিতে পারেন অনায়াসে। ক্ষুধা পেলে ইকো-প্যারাডাইসে আছে সমাধান। শতাধিক বেকার নারী-পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। বেকারত্বের গ্লানি ঘুচে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজারো মানুষের চোখে ফুটেছে আনন্দের হাসি।

ভ্রমণে সহজ রুট

প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য, বিশ্ব ঐতিহ্যের লীলাভূমি শরণখোলা। প্রাকৃতিক মিউজিয়াম শরণখোলা আসতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা হতে সরাসরি বাস সার্ভিস চালু আছে। নিজস্ব পরিবহনযোগেও আসতে পারেন। উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা তুলনামূলক ভালো। ভ্রমণের জন্য ভ্যান, ইজি বাইক, মোটর সাইকেল, ঘোড়ার গাড়ি, নদীতে ট্রলার, স্পিড বোট রয়েছে। আপ্যায়নে চটপটি, বাদাম, আচার, চাটনি, হোটেল, ফাস্ট ফুডের ছোট্ট ছোট্ট দোকান, মুদি দোকান রয়েছে। আরও আছে শিক্ষা উপকরণ ও খেলনা জাতীয় দোকান ।

ইকো-পার্ক তৈরিতে বিনিয়োগ

শরণখোলা উপজেলার পূর্বে ৫ কি. মি. চওড়া বলেশ্বর ও পশ্চিম পার্শ্বে ভোলা নদীর অববাহিকায় তাফালবাড়ী, গাবতলী, টেরাবেকা, বগী, শরণখোলা, সোনাতলা, রসুলপুর, রাজাপুর, ধানসাগর, ভোলার পাড়সহ ৪৭ কিলোমিটার বেড়িবাধ এলাকার যে কোনো স্থানে পার্ক তৈরি করলে পর্যটক আকৃষ্ট করবে। যা রাজশাহী পদ্মা পাড়ের তুলনায় অধিক আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক স্পট হবে।

বিলাসবহুল কটেজ তৈরিতে বিনিয়োগ

উপজেলার প্রাণকেন্দ্র রায়েন্দা বাজারে সরকারি ডাকবাংলো, সুন্দরবন অবকাশ, অগ্রদূত ফাউন্ডেশন, পিংকি আবাসিক হোটেল আছে কিন্তু প্রয়োজন ও চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এখানে রিভার ভিউ পার্কের কারণে প্রচুর পরিমাণে পর্যটকের আগমন ঘটছে কিন্তু উন্নত মানের বিলাসবহুল হোটেল, কটেজ না থাকায় ভগ্ন হৃদয়ে ফেরত যেতে হয় অনেককে। বিলাসবহুল কটেজ তৈরিতে বিনিয়োগ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত হবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

পরিবহনে বিনিয়োগ

স্থলপথে পরিবহন হিসেবে সদরঘাটের মতো ঘোড়ার গাড়ি, মাইক্রো, পিক-আপ, লেগুনা, চাঁদের গাড়ি, মাহেন্দ্র, জনপ্রিয় হবে। জলজান হিসেবে জালিবোট, লঞ্চ, স্পিড বোট, সাম্পান, ট্রলার ইত্যাদি ভ্রমণপিপাসু মানুষদের প্রত্যাশা পূরণ করবে। মাওয়া ঘাটে ব্যবহৃত হতো এমন নৌ-যানসমূহ শরণখোলা আসতে পারে।

রেস্টুরেন্ট ও ফাস্ট ফুডে বিনিয়োগ

রায়েন্দা বাজারে কয়েকটি সাধারণ মানের রেস্টুরেন্ট থাকলেও শরণখোলা উপজেলায় আরো ভালো রেস্টুরেন্টের চাহিদা আছে। পাশাপাশি ফাস্ট ফুডের কোনো মানসম্মত দোকান নেই। রিভারভিউ পার্কের পাশে 'ইকো-প্যারাডাইস' হয়েছে সেখানে প্রচুর পর্যটকের সমাগম হয়। দোকানে সিরিয়াল পেতে সময় লাগে। রেস্টুরেন্টে বিনিয়োগ ফলপ্রসূ হবে বলে সচেতন মহল মনে করে।

পরিকল্পিত আবাসনে বিনিয়োগ

প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা তদুর্ধ্ব শ্রেণিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জনকল্যাণমুখী, অলাভজনক ও অরাজনৈতিকভাবে এখানকার সম্ভাবনাময় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সহস্রাব্দের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যোগ্য করে গড়ে তোলার নিমিত্তে শরণখোলা উপজেলা প্রশাসনের পরিচালনায় "শরণখোলা আইডিয়াল ইনস্টিটিউট" নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে এতটুকু সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে যে, দূর-দূরান্ত থেকে এসে ভাড়া থেকে তাদের সন্তানদের পড়াচ্ছে পাশাপাশি তারা ইকো-ট্যুরিজম বিনিয়োগে আগ্রহী। চাহিদার কারণে ভাড়া বেড়েছে কিন্তু আবাসনের মান এখনো বাড়েনি। তাই পরিকল্পিত আবাসনে বিনিয়োগ করতে পারলে বিনিয়োগকারীরা লাভবান হবেন।

নিরাপদ পানির উৎস তৈরিতে বিনিয়োগ

এই জনপদে বর্ষাকাল ব্যতিত সারা বছর বিশুদ্ধ খাবার পানির স্বল্পতা। নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে। মোংলা পৌরসভায় এ্যাকোয়ারকৃত জমিতে ১টি পানির প্রকল্প চালু করে প্রায় পাঁচ হাজার পরিবারের পানির চাহিদা পূরণ হচ্ছে পাশাপাশি এলাকাটি পর্যটন স্পটে পরিণত হয়েছে।

সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা

সুন্দরবনের ইকোসিস্টেমের ওপর পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীর জীবন, জীবিকা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্ভরশীল। পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন এর কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নির্মল ও কোলাহলমুক্ত পরিবেশ, জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে সামুদ্রিক স্রোতধারা, স্থানীয় বনজীবীদের মাছ, মধু ইত্যাদি সম্পদ আহরণের ঐতিহ্যবাহী কৌশল সমগ্র বিশ্বের ভ্রমণপিয়াসু পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণে পরিণত হয়েছে।

শরণখোলা হতে সংক্ষিপ্ত পথে স্বল্প সময়ে অল্প খরচে অনেক বেশি স্পট পর্যটন/ভ্রমণ করা যায় এ তথ্য জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচারবিহীন থাকায় শরণখোলায় বিনিয়োগ পিঁছিয়ে। মোংলা ব্রিটিশ আমল থেকে বন্দর, প্রচার বেশি এবং ঐ পথে ফেরি না থাকায় পর্যটকরা ভ্রমণ সহজ মনে করে। কিন্তু মোড়েলগঞ্জের পানগুছি নদীতে ব্রিজ হওয়ার যাবতীয় প্রাথমিক কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে ব্রিজের নির্মাণ কাজ শুরু হবে। ফলে সময়ের সাশ্রয় হবে এবং জাতীয় রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

সমাপনী

মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি জগৎ পর্যটনের জন্য মানুষকে নির্দেশ দিয়ে বলেন- বলুন, "তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কীভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।" সুরা আনকাবুত, আয়াত- ২০ । তিনি আরও বলেন- বলুন, "তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো।" সুরা আন নমল, আয়াত-৬৯। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক রাষ্ট্রনায়ক, দার্শনিক পেরিক্লিস তার দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক তরুণ নাগরিকদের একটি শপথ বাক্য পাঠ করাতেন। সেখানে বলা হতো, "আমি আমার জন্মের সময় যে দেশকে পেয়েছি, কর্মের মধ্য দিয়ে আমার মৃত্যুর সময় তার চাইতে উন্নততর দেশ রেখে যাবো"। মানুষের সহজাত জ্ঞান বা প্রবৃত্তির সঙ্গে বিবেক থাকে, বোধ থাকে, প্রেম থাকে, মায়া থাকে। নির্মমতা, হিংস্রতা, স্বার্থপরতাও থাকে। প্রকৃতি ও পর্যটন মানুষের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য কমিয়ে বিবেককে জাগ্রত করে। তাই উচ্চতর চিন্তা ও সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে ইকো-ট্যুরিজমে যথাসাধ্য বিনিয়োগ সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে গড়ে উঠুক শান্তিময় জীবন, উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট শরণখোলা, সোনার বাংলাদেশ।

তথ্যসূত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০০ বক্তব্য, বন অধিদপ্তরের সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা, সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রকল্পের এক নজরে সুন্দরবন, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি), গণমাধ্যম সহায়িকা (পরিবেশ সুরক্ষা), সুন্দরবন একাডেমির প্রকাশিত বাদাবন ও বিভিন্ন পত্রিকা এবং আল-কুরআন।

লেখক : অধ্যক্ষ, শরণখোলা আইডিয়াল ইনস্টিটিউট

মৌসুমি ফলভিত্তিক কৃষি পর্যটন

জাকারিয়া জিহাদ

প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ। ঋতুবৈচিত্র্যের কারণে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সাবেক প্রিন্সিপাল ও পর্যটন বিশেষজ্ঞ পারভেজ এ চৌধুরী কৃষি পর্যটন নিয়ে খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি অবশ্য গ্রামভিত্তিক ট্যুরিজমের কথা বলেছেন যা কৃষি পর্যটনের মধ্যে পড়ে যায়। বাংলাদেশের প্রত্যেকটা গ্রামেই ট্যুরিস্টদের জন্য আকর্ষণীয় সেখানে আছে মাছ ধরার জায়গা, ফসলের জমি, গরু-ছাগলের পাল। প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে থেকে বাংলাদেশের বেশিরভাগ পর্যটক ভ্রমণগুলো উপভোগ করতে চায়। আমাদের জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে এবং শ্রমশক্তির প্রায় ৬০ শতাংশ গ্রামে বাস করে। সুপরিকল্পিতভাবে এই বিশাল শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে গ্রামীণ অর্থনীতির সমৃদ্ধির পাশাপাশি বিশ্ব ট্যুর মার্কেটে বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা সম্ভব। বাংলাদেশে মূলত প্রায় সব সুস্বাদু, রসালো, পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ, ফল পাওয়া যায়। বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন প্রকারের মৌসুমী ফল পাওয়া যায়। মৌসুমী ফল বছরে অন্য সময় পাওয়া যায় না তাই ক্রেতাদের আগ্রহের কেন্দ্রে থাকে এই ফলগুলো।

কৃষি পর্যটন

কৃষি ও কৃষকের খুব কাছাকাছি গিয়ে অবকাশযাপনের মধ্য দিয়ে কৃষি সম্পর্কিত বাস্তব জ্ঞান আহরণ ও কৃষি পণ্য ক্রয়ের সুযোগ করাই কৃষি পর্যটন। যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিপাইন, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র এ ধারণাকে কাজে লাগিয়ে তাদের কৃষিখাত ও পর্যটন খাতকে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ করছে। কৃষি পর্যটন এমনি এক খাত যেখানে একজন কৃষক তার ফসল উৎপাদন ছাড়াও আবাসস্থল এবং শস্যক্ষেত্রকে পর্যটন বান্ধব করে সারা বছরেই আয়ের উৎসতে পরিণত করতে পারেন। বাংলাদেশে কৃষি পর্যটন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের নীতি কাঠামোতে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালা ২০২০, কৃষি পর্যটনকে উন্নত করার পরামর্শ দিয়েছে। আমাদের দেশের জিডিপির প্রায় ১৪.১০ শতাংশ কৃষিক্ষেত্র থেকে আসে। কৃষিক্ষেত্রগুলোকে পর্যটনের আওতায় আনতে পারলে বিদ্যমান কৃষিতে অতিরিক্ত উপার্জনমুলক কার্যক্রম যুক্ত হবে। জাতীয় জিডিপিতে কৃষির অবদান বাড়বে বিশ্ব ট্যুর মার্কেটে বাংলাদেশের অংশীদারিত্বের মাত্রা ১.০৯ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে, কৃষি ও কৃষক অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করবে।

মৌসুমী ফল

যেসব ফল সারা বছর পাওয়া যায় না, নির্দিষ্ট কোনো মৌসুমে পাওয়া যায় তাকে মৌসুমী ফল বলে। ষড়ঋতুর এই বাংলায় গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে বেশি মৌসুমী ফল পাওয়া যায়। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচুর ঘ্রাণে চারপাশ ভরে ওঠে মধুমাস জৈষ্ঠ্য। ২০০৯ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ফলের চাহিদা প্রায় ১১৬.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন।। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার ফলের চাষাবাদ হলেও মোট উৎপাদনের সিংহভাগ (৭৭%) আম, কলা, কাঁঠাল, তরমুজ, পেয়ারা এবং আনারস থেকে আসে। ২০২০-২১ অর্থবছরের দেশে প্রায় ৭ লক্ষ ২৯ হাজার হেক্টর জমিতে প্রায় ১ কোটি ২২ লক্ষ মেট্রিক টন ফল উৎপাদিত হয়েছে যার বেশিরভাগই মৌসুমী ফল। [উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো]

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৌসুমী ফল

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ ২০২১ এর তথ্য মতে, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশে আম চাষাবাদের আওতাধীন জমির পরিমাণ প্রায় ২ লাখ ৮৬ হাজার একর এবং উৎপাদন ১২ লাখ মেট্রিক টনের বেশি। জাতিসংঘের এফ.এ.ও–এর তথ্য মতে, বাংলাদেশ ১৮ বছর ধরে গড়ে ১১.৫ হারে ফলন উৎপাদন বাড়ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে মোট ফসলভিত্তিক আয়ের ১০% ফল থেকে আসে। দেশে চাষযোগ্য জমির মধ্যে ফলের আওতায় আছে মাত্র ১-২ শতাংশ জমি। বিশ্বে উৎপাদিত ফলের মধ্যে বাংলাদেশের লিচুর অবস্থান ২য়, কাঁঠাল ২য়, আম ৭ম, পেয়ারা ৮ম, পেঁপে ১৪ তম।

পর্যটন সম্ভাবনায় লিচু বাগান

বাংলাদেশের দিনাজপুরের লিচু বেশ বিখ্যাত। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, মোটামুটিভাবে দেশের সব অঞ্চলেই লিচু উৎপাদন হয় তবে আবহাওয়া ও মাটির গুণগত বৈশিষ্ট্যের কারণে দিনাজপুরে লিচু চাষ জনপ্রিয়। এই জেলার প্রায় প্রত্যেকটি উপজেলায় লিচু চাষ হয়। ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় তিন হাজারের বেশি লিচু বাগান আছে। লিচুর বৈজ্ঞানিক নাম Litchi Chinensis। এটি দক্ষিণ-পূর্ব চীনের কুয়াংতুং এবং ফুসিয়েন প্রদেশের বিশ্বমণ্ডলীয় অঞ্চলের স্থানীয় উদ্ভিদ। লিচু বাগানগুলোতে ভ্রমণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা সম্ভব ভেজালমুক্ত সুস্বাদু লিচু একইসঙ্গে শহুরে জীবনে গরম, শারীরিক ও মানসিক অবসাদে শান্তির পরশ ভুলিয়ে দিতে পারে লিচু বাগান।

চিত্র: দিনাজপুরের লিচু বাগান (উৎস: ইন্টারনেট)

এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে জুন মাস পর্যন্ত পর্যটকের ভ্রমণ পিপাসা মেটাতে পারে এই লিচুবাগানগুলো। লিচু গাছে যখন মুকুল আসে বাগানগুলো যেন মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে দেয় প্রকৃতিতে। ভ্রমণপিপাসু ও প্রকৃতিপ্রেমীদের মন নিমিষেই চাঙ্গা করে দিতে পারে এই অতুলনীয় গন্ধ। মনে হবে যেন বুক ভরে শ্বাস নেই ও মুকুলের গন্ধে সঁপে দেই নিজেকে। মুকুল থেকে লিচু যখন ফলে পরিণত হয় তখন যেন নিমিষেই রূপ পরিবর্তন করে ফেলে বাগানগুলো। চোখ জুড়ানো সবুজের সমারহ ফুটে ওঠে লিচু বাগানগুলোতে। আর যখন লিচুতে পাক আসে পুরো বাগানের ফলগুলো তখন লালছে গোলাপি বর্ণ ধারণ করে। এসময় অন্য রূপে সাঝ নেয় লিচু বাগানগুলো। এই অপরূপ রূপের পরিবর্তন দেখার মাঝে আলাদা প্রশান্তি অনুভব করতে পারবে পর্যটকেরা। তাই ভ্রমণপিপাসু প্রকৃতিপ্রেমী মানুষের জন্য লিচুবাগান ভ্রমণ থাকতে পারে পছন্দের তালিকায়।

পর্যটন স্পট হিসেবে রংপুরের হাঁড়িভাঙ্গা আম বাগান

বিশ্ব বিখ্যাত হাঁড়িভাঙ্গা আমবাগান হতে পারে পর্যটকদের ভ্রমণের পছন্দের স্থান। রংপুরের মিঠাপুকুরে

ঘোড়াগাছের তেকানী গ্রাম থেকে সারা দেশব্যাপী পরিচিতি পাওয়া হাঁড়িভাঙ্গা আম সবার পছন্দের তালিকা। একটি মাত্র মা গাছ থেকে সারা রংপুরে ছড়িয়ে পড়া আমবাগানগুলো হতে পারে প্রকৃতিপ্রেমী ভ্রমণপিপাসু ব্যক্তিদের আগ্রহের বিষয়। পাইকার নফল উদ্দিন নামের এক ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এই আমের জাতটি। প্রচলিত আছে মূল গাছটি লাগানোর সময় তিনি পানি প্রদানের সুবিধার জন্য মাটির হাঁড়ি দিয়ে ফিল্টার বানান। মাটির হাঁড়িটি ভেঙে যাওয়াকে কেন্দ্র করে এই নতুন জাতটির নামকরণ করা হয় হাঁড়িভাঙ্গা। মাঘ ও ফাল্গুন মাসে হাঁড়িভাঙ্গা আম গাছে মুকুল আসে। এ সময় বাংলার প্রকৃতিতে বিরাজ করে ঋতুরাজ বসন্ত। প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকেরা ঋতুরাজে রূপের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হতে পারেন হাঁড়িভাঙ্গা আমের সঙ্গে। বসন্তের আগমনে প্রকৃতি যে সাঝ সাঝ আবহ সৃষ্টি করে তা ভ্রমণকারীদের ভ্রমণ আনন্দকে বৃদ্ধি করবে। রংপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভাষ্যমতে, প্রায় প্রতি বছর ১৮৮৭ হেক্টর জমিতে এই আমের চাষ হয়। পর্যটক হাঁড়িভাঙ্গা আম বাগান ভ্রমণের মাধ্যমে এই আম সংগ্রহ করতে পারে নিশ্চিন্তে। নফল উদ্দিন পাইকার ইতিহাস সৃষ্টিকারী এই হাঁড়িভাঙ্গা আমের মাতৃগাছটির ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে আজও দাঁড়িয়ে আছে রংপুরের মিঠাপুকুরের খোরকগাছের তেকানী গ্রামে। একটি মাত্র মা গাছ থেকে হাজার হাজার কলম তৈরি করে হাঁড়িভাঙ্গার বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই মাতৃগাছটি পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণের মাধ্যম হতে পারে।

পর্যটন জনপ্রিয়তায় মধুপুর গড়ের আনারস বাগান

আনারসের রাজধানী বলে খ্যাত টাঙ্গাইলের মধুপুর আনারস বাগান। ইতিহাস থেকে জানা যায় মধুপুরের আদিবাসী ইদিরপুর গ্রামের গারো ভেরেনো সাংমা ষাটের দশকে ভারতের মেঘালয় থেকে জায়ান্ট কিউ জাতের আনারস এনে এখানে চাষাবাদ শুরু করেন। জুলাই-আগস্ট এই দুই মাসের আনারসের মৌসুম ধরা হয়। মৌসুমী পর্যটকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে পারে আনারস বাগান ও মধুপুর। আনারস বাগান যেমন পর্যটকদের আগ্রহে থাকবে ঠিক তেমনি আনারসের হাট দেখে বিভিন্ন প্রজাতির আনারস সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারবে। সকালে ভোরের আলোর সঙ্গে পর্যটককে মুগ্ধ করবে আনারস চাষিদের হাটে আগমনের দৃশ্য। কেউ বাইসাইকেল ঝুলিয়ে, কেউ ঘোড়ার গাড়িতে, কেউ ভ্যান, পিক আপ বোঝাই করে সারিবদ্ধভাবে নিয়ে আসছে আনারস। ওই সময় রাস্তায় ফুটে উঠে যেন নৈসর্গিক দৃশ্য। যেকোনো পর্যটকের ক্লান্তি দূর করে প্রশান্তি নিয়ে আসার মতো দৃশ্য। মধুপুর পর্যটকদের যেমন প্রকৃতির মাঝে ডুবিয়ে দিতে পারে তেমনি আনারস বাগান ও ফলপ্রেমী মানুষের জন্য এই ভ্রমণ হতে পারে তার জীবনের সেরা ভ্রমণগুলোর মধ্যে অন্যতম।

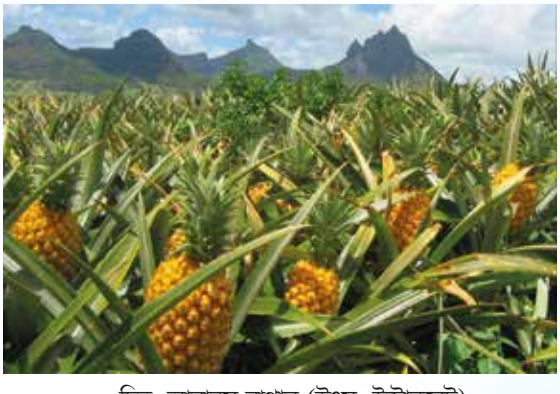

চিত্র: আনারস বাগান (উৎস: ইন্টারনেট)

বাংলাদেশে মৌসুমি ফলভিত্তিক পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা

বাংলাদেশে কৃষি অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তারকারী ফসল মৌসুমি ফল। ফিলিপাইনসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও কৃষিনির্ভর পর্যটনের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং তার যথাযথ ব্যবহারেই পর্যটন শিল্প হতে পারে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। এদেশে বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন সুস্বাদু ফল

পাওয়া যায় যা বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল হওয়ায় বিদেশিদের নিকট বাংলাদেশের কৃষি পর্যটনের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিউইয়র্ক টাইমস ২০০৬–এর ভাষ্য মতে, তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল হওয়ায় পশ্চিমা বিশ্বের ভ্রমণ বিলাসীদের কাছে বাংলাদেশ হতে পারে ইন্দোনেশিয়ার অবকাশ কেন্দ্র বালি অথবা থাইল্যান্ডের চমৎকার বিকল্প। মৌসুমি ফলভিত্তিক বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটলে বহুমুখী ব্যবসায়িক ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। মৌসুমি ফলসমূহ দিয়ে বিভিন্ন রুচিশীল খাবার তৈরি করা যায়। পাকা আম দিয়ে তৈরি হতে পারে জেলি, আমসত্ত্ব, আম-দইয়ের আইসক্রিম, আমের চাটনিসহ হরেক রকমের খাবার যা পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াবে এবং রপ্তানি করা যাবে বিদেশে। কৃষকদের মধ্যে ফল চাষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে ও রাজস্ব প্রবাহের উন্নতি ঘটবে। ফল চাষিদের পারিবারিক আয়সহ অন্য সদস্যদের খামার থেকে অতিরিক্ত উপার্জনের মাধ্যম তৈরি হবে। এছাড়াও মৌসুমি ফলভিত্তিক পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটাতে পারলে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হবে এবং বেশকিছু সম্ভাবনাময় খাত তৈরি হবে।

বিপণন ও প্রচার

মৌসুমি ফল ও ফলের বাগানকে পর্যটন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে বিপণন ও প্রচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে হিসেবে কাজ করবে। মৌসুমি ফলগুলোকে বিপণনের ক্ষেত্রে সৃজনশীল ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করলে পর্যটকের ওই নির্দিষ্ট স্থানভিত্তিক পর্যটনের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। ডিজিটাল মার্কেটিং–এর মাধ্যমে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বিমান ও সমুদ্রবন্দর রেলওয়েতে আর্কষণীয়ভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার করা যেতে পারে। এইসব মাধ্যমে আকর্ষণীয়ভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হলে আন্তর্জাতিক ট্যুরিস্টরা এই স্পটগুলো সম্বন্ধে জানতে পারবে এবং দেশি পর্যটকদের মৌসুমি ফলভিত্তিক পর্যটনের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

মৌসুমী ফলভিত্তিক পর্যটন উন্নয়নে করণীয়

- সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি
- যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিতকরণ.
- এলাকাগুলোর পরিকল্পিত ও নান্দনিক উন্নয়ন
- স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ও সংস্কার
- অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
- প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে নতুন এই স্পটের কথা প্রচার করা
- সামাজিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি

উপসংহার

গ্রামে ভ্রমণের মাধ্যমে পর্যটক যেমন গ্রাম ও গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে জানতে পারবে ঠিক তেমনি তাদের প্রয়োজনীয় মৌসুমি ফল মধ্যস্বত্বভোগীর মাধ্যমে না কিনে নিজেই কিনতে পারবে। পর্যটকের ভ্রমণপিপাসা মেটার সঙ্গে সংযুক্ত হবে সতেজ ও ভেজালমুক্ত ফল সংগ্রহ।

লেখক : শিক্ষার্থী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

শেরপুর জেলার গারো পাহাড়ঃ পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনা

সুবেদা খাতুন

পর্যটন হলো বিশ্বের অন্যতম সম্ভাবনাময় একটি শিল্প। এই শিল্প বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এটি সারা বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। প্রতিযোগিতামূলক বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে পর্যটন শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন সেবা খাতের মধ্যে বর্তমানে পর্যটন একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা খাতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে দেশ-বিদেশ থেকে আসা পর্যটকদের খাদ্য, বাসস্থান, বিনোদন ইত্যাদির জন্য যাত্রীবাহী পরিবহন, বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁ, ট্রাভেল এজেন্সি ও ট্যুর অপারেটর প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকিং সেবা, স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণে বিভিন্ন খুচরা পণ্যের দোকান, স্থানীয় পণ্য এবং আদিবাসী নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন পণ্য প্রভৃতি পর্যটনকে ঘিরে একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। ফলে পর্যটনের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে একটি দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। একই সঙ্গে এই পর্যটন শিল্প সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আমরা জানি, কোভিড-১৯ মহামারিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পর্যটন খাতসমূহ। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে। যেমন পর্যটন নির্ভর শ্রীলংকা দেউলিয়া হওয়ার অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কারণ ছিল করোনা মহামারিতে শ্রীলংকার রাজস্ব আয়ে পর্যটন খাতের ঘাটতি। বাংলাদেশের পর্যটন এই মহামারিতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বেকার হয়েছে লাখ লাখ মানুষ। তবে দীর্ঘদিন গৃহবন্দি থাকার পর গত বছর থেকে বিভিন্ন দেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি ভ্রমণমুখী হয়েছে। যা পর্যটন খাতের অপার সম্ভবনাকে প্রসারিত করছে প্রতিনিয়ত। পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক লীলা নিকেতন হওয়ায় প্রাচীনকাল থেকে এ দেশ বিভিন্ন পরিব্রাজকদের আকৃষ্ট করে এসেছে। এদেশে রয়েছে উঁচু- নিচু পাহাড়, বিশাল সমুদ্র সৈকত, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন নিদর্শন। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলভেদে রয়েছে প্রকৃতির আলাদা সৌন্দর্য যেমন: ভাওয়াল ও মধুপুরের গড়, লালমাই পাহাড়, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল, উত্তরের গারো পাহাড়, সিলেট ও পঞ্চগড়ের চা বাগান, দক্ষিণের সুন্দরবন প্রভৃতি অঞ্চল পর্যটকদের আকৃষ্ট করে থাকে। তাছাড়াও বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হওয়ায় এখানে নতুন নতুন পর্যটন গড়ে ওঠার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশে ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যময় জীবন। যা সমভাবে পর্যটকদের আকৃষ্ট করে থাকে।

শেরপুর জেলার গারো পাহাড়

বৃহত্তর ময়মনসিংহের ভারতের মেঘালয় সীমান্তবর্তী অঞ্চল শেরপুর জেলা। গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই জেলার নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভ্রমণপিপাসুদের আকৃষ্ট করে থাকে। প্রতিবছর দেশ-বিদেশের নানা পর্যটক গারো-পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখতে শেরপুর জেলায় পাড়ি জামায়। ফলে শেরপুর জেলার গারো পাহাড়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি জেলার স্থানীয় মানুষের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে।

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গারো পাহাড় অবস্থিত। তবে এটি পূর্ব-পশ্চিম বরাবর বিস্তৃত একটি পাহাড়ি অঞ্চল বা পর্বত শ্রেণি। ভারতের মেঘালয়ের রাজ্যের গারো-খাসিয়া পর্বত শ্রেণির একটি অংশ গারো পাহাড় নামে

অভিহিত। এর একটি অংশ হচ্ছে ভারতের আসাম ও বাংলাদেশের জেলার নালিতাবাড়ী, ঝিনাইগাতি ও শ্রীবর্দি উপজেলা এছাড়া ময়মনসিংহ নেত্রকোণা, জামালপুর এবং কিশোরগঞ্জের কিছু অঞ্চল এ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টি শেরপুর জেলার শ্রীববর্দিতে অবস্থিত। গারো পাহাড় বিশ্বে অন্যতম বৃষ্টি প্রধান অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি। এ পাহাড়ের শান্ত, সুন্দর ও নির্জন পরিবেশ মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে। বিভিন্ন প্রজাতির জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঘন সবুজ বন, নদী, বিল, হাওর এবং বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণিসমূহ গারো পাহাড়কে সমৃদ্ধ করেছে। এ পাহাড়ে শাল, বাঁশ ও বেত প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। বনভূমিতে নানা প্রজাতির পাখি, সরীসৃপ,বন্য হাতি, হরিণ, বন্য মুরগি, শূকর, ধনেশসহ প্রচুর পরিমাণে পাখি দেখতে পাওয়া যায়। গারো পাহাড়ের বাংলাদেশ অংশের শেরপুর জেলায় রয়েছে মনোমুগ্ধকর গজনী অবকাশ কেন্দ্র, মধুটিলা ইকো পার্কের সঙ্গে নতুন করে পর্যটকদের আকৃষ্ট করছে পানিহাটা, মায়াবী লেক এবং রাজার পাহাড়। যদিও মায়াবী লেক, রাজার পাহাড় এবং পানিহাটাতে কোনো পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি তবে এ স্থান গুলোতে বর্তমানে বাড়ছে পর্যটকদের ভিড়। দর্শনার্থীদের পছন্দের তালিকায় এই স্থানগুলোর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এ স্থানগুলোতে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব হলে পর্যটকদের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি স্থানীয় এবং জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একইসঙ্গে বাংলাদেশের এসজিডি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে ধারণা করা হয়।

গারো পাহাড়কেন্দ্রিক বিভিন্ন জাতিসত্তার বসবাস

গারো পাহাড় মূলত একটি দুর্গম পার্বত্য এলাকা। গারো পাহাড় নামটির সাথে জড়িত রয়েছে একটি ঐতিহ্যবাহী মাতৃতান্ত্রিক নৃগোষ্ঠী গারো অধিবাসী। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে ভারতের মেঘালয় এবং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে তাদের বসবাস শুরু হয়। তাদের নাম অনুসারে পাহাড়ি অঞ্চলটি আজ গারো পাহাড় নামে পরিচিত। গারো পাহাড়ে গারো আদিবাসী নৃগোষ্ঠীর পাশাপাশি বসবাস করে হাজং, কোচ, ডালু, বর্মন এবং হদি প্রভৃতি জাতিসত্তার মানুষ। এছাড়া গারো পাহাড়ে অধিবাসী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বাঙালি জনগোষ্ঠীর বসবাসও রয়েছে। এ সকল জাতিসত্তা রয়েছে নিজস্ব ভাষা,বর্ণমালা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রথা, রীতি-নীতি, সমৃদ্ধ এক সাংস্কৃতিক জীবনাচরণ। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক জীবনাচরণ গারো পাহাড়ের প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যের ন্যায় সমভাবে পর্যটকদের আকর্ষণ করে। বিভিন্ন সময় গবেষকগণ এ সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে গারো পাহাড়ের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করে থাকেন।

রাজার পাহাড়

চঞ্চল ও পৃথিবীর ব্যস্তময় জীবনে একটু শান্তি বা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে কর্মজীবী মানুষ খোঁজে প্রকৃতির সান্নিধ্য। আর এ প্রকৃতি যদি হয় সবুজের সমারোহ পাহাড়ের নির্জন ও মনোরম দৃশ্য এবং পাহাড়ি আদিবাসী অধ্যুষিত সংস্কৃতির সংস্পর্শ তাহলে তো কথায় নেই। বাংলার প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমির এই জায়গাটির নাম রাজার পাহাড়। এটি শেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা শ্রীবর্দি থেকে ১৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ভারতের মেঘালয় সীমান্তবর্তী অঞ্চল কর্ণঝোড়া গ্রামে অবস্থিত। বাংলাদেশে অবস্থিত গারো পাহাড়ের যতগুলো পাহাড় রয়েছে সেই সকল পাহাড়ের মধ্যে রাজার পাহাড়ের উচ্চতা সবচেয়ে বেশি। এটিকে বলা হয় বলা যায় বাংলাদেশের গারো পাহাড়ের রাজা বা রাজার পাহাড় নামকরণের সার্থকতার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

নয়ানাবিরাম পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে শতাধিক হেক্টরের সবুজ শ্যামলে ঘেরা সমতলের বিরানভূমি। যাকে এই পাহাড় অন্যান্য পাহাড় থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও নান্দনিক করে তুলেছে। এ দৃশ্য দেখার জন্য প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা ভিড় জমায় এ পাহাড়টিতে। পাহাড়ের চূড়ার বিশাল এ সমতল ভূমিতে মানুষের যাতায়াতের জন্য রয়েছে সরুপথ। আর এ রাস্তাটি যে কাউকে সহজে মুগ্ধ করে তোলে। এ পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ালে দেখতে পাওয়া যায় আশেপাশের এলাকাসমূহ যেমন- কর্ণঝোড়া, মালাকোচা, বাবেলা কোনা, দিঘলাকোনা, হারিয়াকোনা চান্দাপাড়া এবং বাবেলা কোনাসহ ভারতের মেঘালয় সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহ। এই

পাহাড়টির চূড়া যেন সবুজের এক মহাসমারোহ আর আকাশের নীলের সংমিশ্রণে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যা দেখতে ঠিক আকাশ ছোঁয়া নীল সবুজের বিশাল নৈসর্গিক প্রাকৃতিক দৃশ্য। এই পাহাড়ের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ঢেউফা নদী। এ নদীর দু'তীরে পাহাড়। নদী আর পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এই স্থানটি দেখতে খুবই মনোমুগ্ধকর। বর্ষাকালে এর সৌন্দর্য দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এই পাহাড়ের পাশেই রয়েছে আদিবাসী এলাকা বাবেলাকোনা। অসংখ্য পাহাড়ি উঁচু টিলা ঘেরা এ অঞ্চলে বাস করে গারো, হাজং, কোচ, হদি প্রভৃতি আদিবাসী নৃগোষ্ঠীর মানুষ। উক্ত অঞ্চলে রয়েছে এ সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যময় ঐতিহ্যবাহী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা। এখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী কোচ ও হাজং অধিবাসীরা বারো মাসে তেরো পার্বণ পালন করে আর খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী গারো আদিবাসীরা ওয়ানগালা, বড়দিন এবং স্টার সানডে পালন করে। রাজার পাহাড়ের সৌন্দর্যকে রঙিন করে তুলে অধিবাসীদের এই পূজা-পার্বণ। রাজার পাহাড়ের বিভিন্ন কোনায় দেখা যায় আম, কাঁঠাল, লিচু ও কলার বাগান। একইসঙ্গে এই পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় বাঙালি এবং অধিবাসী জনগোষ্ঠী মৌমাছি চাষ করেন। এখানে আদিবাসীদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও চর্চা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে বাবেলাকোনা কালচারাল একাডেমী, জাদুঘর, লাইব্রেরি, গবেষণা কেন্দ্র, মিলনায়তন এবং রাবার বাগান। বাবেলাকোনা কালচারাল একাডেমি থেকে এখানকার আদিবাসী সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানা যায়। তাছাড়া এখানে রয়েছে গারো অদিবাসীদের কারুকার্যমণ্ডিত গির্জা, হিন্দুদের মন্দির ও উপাসনালয়সহ অসংখ্য প্রাকৃতিক নিদর্শন। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বাবেলাকোনার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক জীবনধারা এখানে আগত পর্যটকদের সমানভাবে আকর্ষণ করে। ভ্রমণপিপাসুদের দাবি এখানে একটি পর্যটন কেন্দ্র হলে তাদের চাহিদা পূরণে যোগ হবে নতুন মাত্রা।

আলোকচিত্র-০১: রাজার পাহাড়

মায়াবী লেক

শেরপুর জেলা শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার উত্তরে ঝিনাইগাতি উপজেলার তাওয়াকুচি নামক স্থানে মায়াবী লেক অবস্থিত। এই লেকের তিন ধারে পাহাড় ঘেরা আর একপাশে ঘনবন। লেকের ধারে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নিচে তাকালে সত্যি কিছুক্ষণের জন্য মনে হতে পারে আপনি সুইজারল্যান্ড বা কাশ্মীরে চলে এসেছেন!

আলোকচিত্র-০২: মায়াবী লেক (সূত্র: বাংলাট্রিবিউন)

নীল আকাশের নিচে সবুজ পাহাড়ঘেরা জলরাশি। পানিতে তাকালে মনে হয় আকাশ যেন জলে নেমে এসেছে। চোখ ধাঁধানো এ জলরাশিকে স্থানীয় লোকেরা নাম দিয়েছে মায়াবী লেক। তবে কেউ কেউ একে ছোট সুইজারল্যান্ড ও কাশ্মীর বলেও ডাকে। মায়াবী লেকের পাহাড়ে দাঁড়ালে দেখতে পাওয়া যায় আশেপাশের এলাকাসহ ভারতের মেঘালয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেখতে আসা দর্শনার্থীরা এই মায়াবী লেকে গোসল করা বা সাঁতার কাটার আনন্দ থেকে বাদ যায় না। এ লেকের আশেপাশের তিন কিলোমিটার এলাকার কোনো দোকানপাট নেই তবু এখানে দর্শনার্থীর কোনো কমতি নেই। উক্ত স্থানটি সামাজিক বনায়ন, জীববৈচিত্র্য বন্য হাতির অভয়ারণ্য হিসেবে বিবেচিত বলে এখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেনি। তবে এখানে পর্যটন শিল্প গড়ে না উঠলেও প্রতিবছর দর্শনার্থীর আনাগোনার কোনো কমতি নেই। এখানে যদি জীববৈচিত্র্য এবং বন্যহাতির কোন ক্ষতি সাধন না করে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পশু পাখির সংরক্ষণ জায়গা রেখে ইকো ট্যুরিজম বা পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব হলে গারো পাহাড়ে আরও একটা নতুন অবকাশ কেন্দ্র গড়ে উঠবে। তাছাড়া ঝিনাইগাতির এই লেকের আশেপাশের অঞ্চলে রয়েছে গারো, হাজং, কোচ ও বর্মন প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাস। পাহাড় ও লেকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আদিবাসী সংস্কৃতির রঙের মেলা।

লেখক : শিক্ষার্থী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রবিন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্লোরাল ট্যুরিজম

মোঃ নাফিজ মন্ডল

নদী, প্রকৃতি, সমুদ্র, স্থাপত্য এবং ইতিহাসের শিকড়ে আঁকড়ে থাকা বৈচিত্র্যময়ী এক মায়াবী রানি আমাদের এই বাংলাদেশ। সবুজ শাড়ির আঁচলে এদেশ যেন লুকিয়ে রেখেছে জানা অজানা হাজারো পর্যটন সম্ভাবনা। আর আজকের আলোচনা মূলত এদেশের এমনি একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পর্যটন সম্ভাবনার নিয়ে যার নাম "ফ্লোরাল ট্যুরিজম"। এটি মূলত সম্পূর্ণরূপে শুধু ফুলকে কেন্দ্র করে গঠিত পর্যটনকে বোঝায়। যখন ফুলের সৌন্দর্য পরিদর্শনের জন্য পর্যটকেরা ফুলের বাগান, ফুলের খামার, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ফুলের উৎসব, ফুলের প্রদর্শনী ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করে তখন তাকে ফ্লোরাল ট্যুরিজম বলা হয়। ইতিহাসে ষোড়শ শতক থেকে ফুলের বাগান ভ্রমণের প্রচলন থাকলেও কেবল ফুল দিয়ে যে পর্যটকদের আকৃষ্ট করা যায় এমন ধারণার প্রথম আবির্ভাব ঘটে ১৯২৭ সালের ইংল্যান্ডের জাতীয় উদ্যান প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে। আর এরপর থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফলভাবে ফুলকে ব্যবহার করে আসছে তাদের পর্যটন সমৃদ্ধির জন্য। শুধু ফুলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা বিভিন্ন পর্যটন স্পট আজ বিশ্বব্যাপী ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যার মধ্যে ফ্রান্সে ল্যাভেন্ডার ফিল্ড, বুলগেরিয়ার রোজভ্যালি, হল্যান্ডের কিউকেনহফ টিউলিপ বাগান, জাপানের আশিকাগা ফ্লাওয়ার পার্ক, থাইল্যান্ডের সারাবুরি সানফ্লাওয়ার ফিল্ড, আইসল্যান্ডের আকুরেরি বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি অন্যতম। কানসাই ইউনিভার্সিটির তথ্য অনুযায়ী কেবল জাপানেই ৬৩ মিলিয়ন পর্যটক ভ্রমণ করেছে শুধু চেরি ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে। তাহলে বুঝতেই পারছেন ফুলের আলিঙ্গনের কাছে মানুষ কতটা অসহায়। অবাক করা বিষয় হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশেও ঠিক এমন কিছু পর্যটন সম্ভাবনা আছে যা আমাদের পর্যটনকে সাজাতে পারে সম্পন্ন এক নতুন রূপে। যেমন:

দিয়াবাড়ির কাশবন

শরৎ এলেই নিজের অপার্থিব সৌন্দর্যের জানান দিতে আগমন ঘটে কাশফুলের। শ্বেত শুভ্র স্বর্গীয় সাদা চাদরের মায়া দিয়ে মুড়িয়ে ফেলে গোটা দিয়াবাড়ি। যেদিকেই চোখ যায় তার পুরোটা জুড়ে দেখা মেলে কাশবন এবং কাশফুলের মেলা। শরতের নীল আকাশের শেষ বেলার সোনালি সূর্যের মায়াবী আলো যখন ঢুঁ মারে এই আবির মাখা সাদা কাশফুলের সম্রাজ্যে, তখন খেয়ালি পর্যটকেরা অনেকটা অসহায় হয়ে পড়ে এই সৌন্দর্যের কাছে। শুধু দিয়াবাড়ি নয়, ঢাকার আশেপাশে কাশফুলের নরম ছোঁয়ার মুগ্ধতা নিতে আরো ঘুরে আসতে পারেন আশুলিয়া, আকতার নগর, কেরানীগঞ্জ ও মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধের কাশবন থেকে। এছাড়াও কুড়িগ্রামের ধরলা নদীর তীর, চট্টগ্রামের অক্সিজেন মোড়, ফরিদপুরের আকোটের চরের কাশফুলের সৌন্দর্য যেকোনো পর্যটককে করতে পারে বিমোহিত।

সদুল্লাপুরের গোলাপগ্রাম

সবুজ বাংলার বুকে লাল রঙের কল্পনা আমাদের শিহরিত করে। কিন্তু তা স্বচক্ষে কেমন দেখতে আমরা তা জানি না। হঠাৎ একদিন শিশির ভেজা সকালে চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা সবুজের মাঝে লাল রঙের ছড়াছড়ি দেখলে অনুভূতিটা কেমন হবে কল্পনা করা যায়। ঠিক এমনই এক অনুভূতি পাওয়া যায় ঢাকার অদূরে তুরাগ নদীর পাড়ে অবস্থিত সদুল্লাপুর গ্রামে চাষ করা সারি সারি গোলাপ বাগানগুলোতে। সবুজের মাঝে কী সুন্দরভাবে ফুটে আছে শত শত লাল গোলাপ যেন মনে হয় সেই চিরচেনা সবুজের বুকে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সেই কাল্পনিক লাল

রং। আরও রয়েছে রজনীগন্ধা, গ্লাডিওলাস, অর্কিডসহ নানা ফুলের বাগান যা এর সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তুলে। এখানে কৃষকেরা ফসলের মতো ফুলের চাষ করে থাকে যা দেখতে প্রতিদিন ভিড় জমায় শত শত পর্যটক। ইতিমধ্যেই এই গ্রামটি গোলাপ গ্রাম নামেও ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে।

বাংলার হলুদ সাম্রাজ্য

শীত এলেই হলুদ শাড়ির আঁচলের অবয়বে আবির্ভাব ঘটে সরিষা ফুলের। যখন মৃদু দক্ষিণা বাতাসের আলিঙ্গন এসে আলতো করে দোলা দিয়ে যায় এই হলুদ নক্ষত্র খচিত আচলে, তখন তা যেন সৌন্দর্যের সর্বোচ্চ সীমা পার করে ফেলে। আর ঠিক এমনই এক দৃশ্যের দেখা মেলে ঢাকার অদূরে অবস্থিত মানিকনগর গ্রামে। মানিকনগর থেকে সিংগাইর যাওয়ার পুরো পথ জুড়ে রয়েছে সারি সারি সরিষা খেত, যার অপার্থিব সৌন্দর্য অচিরেই আঁকড়ে ধরবে যে কোনো পর্যটকের চোখ। এছাড়াও ঢাকার অদূরে মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর, সিরাজদিখান আর টঙ্গীবাড়ী, যশোরের অভয়নগর ও চলনবিলে এবং দেখা মিলে হলুদ সরিষা ফুলের এই স্বর্গীয় সৌন্দর্যের।

ফরিদপুরের সূর্যমুখী

শীতের কুয়াশা মুছে দিতে যখন উঁকি দেয় সূর্য ঠিক তখনই আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে সূর্যমুখী ফুল। আর এই হলুদ ফুলের পাপড়ি থেকে নিজের সুখ কুড়িয়ে নিতে হাজির হয় শত শত পর্যটক। ফরিদপুরের শহরতলীর বদরপুর এলাকার বিএডিসির প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কেন্দ্রে গড়ে তোলা সূর্যমুখী ফুলের বাগানে দেখা যাচ্ছে ঠিক এমনই দৃশ্য। প্রায় তিন একর জায়গায় গড়ে তোলা বিশাল আকারের এই হলুদ গালিচার সৌন্দর্য অচিরেই আকৃষ্ট করছে হাজার হাজার ভ্রমণপ্রেমীদের।

নাটোরের কৃষ্ণচূড়া

বসন্তের লালরঙা আগুনের উষ্ণতা নিতে মানুষ ভিড় জমায় ঢাকার চন্দ্রিমা উদ্যানে। সেখানে কৃষ্ণচূড়া ফুলের সৌন্দর্যে পুলকিত হয়, হয় আনন্দিত। কিন্তু কৃষ্ণচূড়ার প্রকৃত সৌন্দর্যের প্রায় সবটুকুই যেন সযত্নে লুকিয়ে রাখা হয়েছে নাটোরে। "সজন সমাবেশ" নামক একটি সামাজিক সংগঠন এবং নাটোর পৌরসভার উদ্যোগে ২০০২ সালে নাটোরের রাজপথের দু'ধারে প্রায় দুই হাজার ফুলের গাছ লাগানো হয় যার বেশির ভাগই ছিল কৃষ্ণচূড়া। আর এই গাছগুলোই যেন সকল সর্বনাশের কারণ। বসন্তের ছোঁয়া পেতেই এখানে মেঘের মতো ফুটতে থাকে কোটি কোটি কৃষ্ণচূড়া যার সৌন্দর্য অচিরেই ক্লান্ত করে ফেলে ভ্রমণপিপাসুদের অসহায় দুই চোখ।

বরিশালের শাপলা বিল

প্রথম দেখায় মনে হবে কোনো এক নক্ষত্র খচিত লাল রঙা চাদর দিয়ে মুড়িয়ে ফেলা হয়েছে গোটা একটা বিল। কিন্তু একটু কাছে যেতেই চোখে পড়বে শান্ত জলের উপর সবুজ পাতা বিছিয়ে মুখ উচিয়ে বসে থাকা হাজার হাজার লাল শাপলার দল। বরিশালের উজিরপুর উপজেলার সাতলা বিলে দেখা মিলবে ঠিক এমনি এক দৃশ্যের। সাধারণত আগস্ট মাসের শেষ থেকে শুরু করে অক্টোবর পর্যন্ত থাকে শাপলার সমারোহ। বছরের অধিকাংশ সময় জলমগ্ন এ বিলে লাল, সাদা ও বেগুনি রংয়ের তিন ধরনের শাপলা জন্মালেও লাল শাপলার অধিক্য বেশি। পর্যটকদের এই লাল স্বর্গ ছুঁয়ে দেখাতে সেখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে নৌকার যা ইতিমধ্যে পর্যটকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

জাপান যেমন সাকুরা বা চেরি ফুলকে ব্যবহার করে নিজেদের পর্যটনকে এক ভিন্নধর্মী আকর্ষণে পরিণত করেছে। আমরাও তেমন আমাদের জবা, গাদা, রজনীগন্ধা, কৃষ্ণচূড়া, লাল শাপলা এবং কাশফুলকে ব্যবহার করে আমাদের পর্যটনকে সাজাতে পারি একদম নতুন রূপে। আর এর জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা যার মাধ্যমে উল্লিখিত স্থানগুলোকে সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা। সেইসঙ্গে এগুলোকে ফ্লোরাল ট্যুরিজমের আদলে ট্যুর প্যাকেজ আকারে তৈরি করে

দেশে-বিদেশে প্রচার করা গেলে আমরা সহজেই দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারব। এছাড়াও সিঙ্গাপুর বা থাইল্যান্ডের মতো ফ্লোরাল ফেস্টিভালের আয়োজনের মাধ্যমেও আকৃষ্ট করা যেতে পারে দেশি বিদেশি পর্যটকদের। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত ইতিমধ্যেই পর্যটক আকৃষ্ট করতে ফুলকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কাশ্মীরের টিউলিপ গার্ডেন, উত্তরাখণ্ডের ভ্যালি অফ ফ্লোরাল ন্যাশনাল পার্কসহ ভারতের বিভিন্ন স্থান ইতিমধ্যে পর্যটকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। আমাদেরও উচিত প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যময় তার লীলাভূমি আমাদের এই রূপসী বাংলাকে ফুলের সাহায্যে পৃথিবীর সঙ্গে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

লেখক : শিক্ষার্থী, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে কৃষি পর্যটন সম্ভাবনা

কৃষিবিদ খোন্দকার মোঃ মেসবাহুল ইসলাম

কৃষিতে একটি ক্রমবর্ধমান এবং জনপ্রিয় ক্ষেত্র হলো কৃষি পর্যটন। এতে বিনোদনমূলক সেবার পাশাপাশি সরাসরি ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ থাকায় কৃষিজ পণ্য উৎপাদনকারী ও পর্যটক উভয়ই লাভবান হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৭ সালে প্রথম কৃষি পর্যটন শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সে সময় কৃষি পর্যটন বলতে পর্যটক কর্তৃক খামার পরিদর্শন, মাছ ধরা, খড় গোছানো ইত্যাদি বিষয়গুলোকেই বুঝাতো। এই সীমিত বিষয়গুলো থেকে ২০০৭ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে ক্রমান্বয়ে প্রায় ৬৭% পর্যন্ত আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেইসঙ্গে কৃষি পণ্যের বিক্রিও দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। কৃষি পর্যটনের এই নতুন ধারা ক্রমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশেও কৃষি পর্যটনে অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য কৃষি পর্যটন সম্পর্কে সম্যক ধারণার প্রয়োজন রয়েছে। সেইসঙ্গে কৃষির মাধ্যমে মানুষকে বিনোদন প্রদান ও ব্যবসায়িক মনোভাবে আর্থিক সমৃদ্ধির মাধ্যমে নিজের ও দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করাও কৃষি পর্যটনের উদ্দেশ্য।

কৃষি পর্যটন ব্যবসার ধরন

সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত: কৃষি সম্পর্কিত পর্যটন ব্যবসা পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা বা প্রচারে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত যে কোনো ব্যক্তি, খামার বা সংস্থাকে কৃষি পর্যটন ব্যবসা হিসেবে ধরা যেতে পারে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. সংগ্রহকারী: এ ধরনের কৃষিখামার বা সংস্থাগুলো পর্যটককে নিজের পছন্দমতো পণ্য বাছাই ও সংগ্রহ করতে এবং ক্রয় করে নিয়ে যেতে আমন্ত্রণ জানায়। যা হাতে-কলমে শেখার বিষয়ে পর্যটককে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। এ ধরনের কৃষিখামারে বা সংস্থায় বিক্রয় উপযোগী ফল, বিভিন্ন ধরনের সবজি, কুমড়াজাতীয় সবজি, ফুল এবং সৌন্দর্যবর্ধনকারী বিভিন্ন ধরনের গাছ ও চারা থাকে।

২. খামার বাজার: খামারের সুবিধাজনক স্থানে খামারে উৎপাদিত পণ্য একত্রে আকর্ষণীয়ভাবে গুছিয়ে রেখে পর্যটকদের ক্রয়ের সুবিধা করে দেওয়া। এটি আবার খামারের বাইরেও সর্বসাধারণের জন্য এমন দোকান বা বাজার তৈরি করা।

৩. ফল বাগান: বড় আকারের একক বা মিশ্র ফল বাগান, যা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা-বেড়া দেওয়া থাকে এবং যার ভেতরে গাইডের সঙ্গে পর্যটকগণ দল বেঁধে বা এককভাবে ঘুরে বেড়ানোর সুবিধা পায়, ফল পাকার মৌসুমে ইচ্ছেমত ফল সংগ্রহ করে খেতে পারে কিন্তু ক্রয়ের সুবিধা থাকে না।

৪. ফুল চাষের খামার: এটি ফুল চাষের খামার, যা দর্শকদের মাঠে ঘুরে ঘুরে ফুল ফসলের সৌন্দর্য দেখতে আমন্ত্রণ জানায়। ফুলের খামারগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুষ্ঠান বা কর্মশালার আয়োজন করতে পারে। এছাড়া পর্যটকদের জন্য ফুল সংগ্রহ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারে।

৫. প্রদর্শনী খামার: একটি বিবিধ ফসলের প্রদর্শনী খামারের চলমান উৎপাদন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য দর্শক বা পর্যটকদের আমন্ত্রণ জানায়। প্রদর্শনী খামারের মধ্যে দুগ্ধ খামার, পোল্ট্রি খামার (মুরগি, কোয়েল, তিতির, হাঁস, কবুতর ইত্যাদি) এবং গবাদি পশুর খামার।

৬. খামারে আতিথেয়তা প্রদান: একটি খামারে বিশেষ করে স্থানীয়ভাবে প্রচলিত বিশেষ ধরনের নির্দিষ্ট কিছু তৈরি

ঘরে রাত্রিযাপন করার জন্য পর্যটকদের আমন্ত্রণ জানায়। দিনে-রাতে স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশে বা প্রচারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্থানীয়ভাবে প্রচলিত উল্লেখযোগ্য খাবারের মেনু দিয়ে লাঞ্চ ও ডিনারের আয়োজন করা যেতে পারে। পাহাড়ের চা বাগানগুলোতে এধরনের কৃষি পর্যটন গড়ে উঠতে পারে।

৭. খামার পরিদর্শন: এটি এমন একটি বড় খামার, যা দর্শক বা পর্যটকগণ বিশেষ ধরনের যানবাহনে চড়ে ঘুরে ঘুরে দেখে থাকেন। এ ধরনের খামারে মাঠ ফসলের পাশাপাশি ফলজ, বনজ ও সুদৃশ্য গাছ, ফুলের বাগানসহ পশু-পাখির ছোট আকারের খামার থাকে।

৮. খামার শিবির: একটি খামারে ছোটদের বা স্কুলের নিচের দিকের ক্লাশের ছাত্রছাত্রীদের খামারের অভিজ্ঞতা ও কৃষি অনুশীলনের উদ্দেশ্যে শিক্ষামূলক সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য খামার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে ছোটবেলা থেকেই কৃষির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে, যা ভবিষ্যতে শুধু যে কৃষি বিষয়ে লেখাপড়া করা তাই-ই নয়, ছোট-খাটো কৃষি কাজ যেমন–ছাদ বাগান, বসতবাড়ির বাগান, বেলকনি বা বারান্দায় ফুল-সবজির গাছ লাগানো ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে সহায়তা করতে পারে।

৯. খামারে খাবার আয়োজন: কোনো একটি খামার পর্যটকগণ ঘুরে ঘুরে দেখার পর তাদের পছন্দ অনুযায়ী অথবা নির্দিষ্ট প্যাকেজ অনুযায়ী খামারে উৎপাদিত ফসল বা পণ্য দিয়ে টাটকা খাবার রান্না করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা রাখা। এসময়ে বিনোদনেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১০. পুকুরে মাছ ধরা: মৎস্য খামার বা বড় খামারে দর্শনার্থী বা পর্যটকগণের জন্য পুকুরে মাছ ধরার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া।

কৃষি পর্যটন ব্যবস্থাপনা

কৃষি পর্যটন ব্যবসার জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থাপনা রয়েছে, যেগুলো অনুশীলন করলে কৃষি পর্যটকদের জন্য সর্বোত্তম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

১. লক্ষ্য অনুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ খামার তৈরি করা
২. খামার তৈরি বা কৃষি পর্যটন সেবা দেওয়ার আগে অভিজ্ঞতা অর্জন করা এবং অর্জিত জ্ঞান নিজস্ব খামারের উপযোগী করে প্রয়োগ করা
৩. সর্বোত্তম গ্রাহক সেবা প্রদানের মানসিকতা তৈরি করা ও চমৎকারভাবে তা উপস্থাপন করা
৪. সবার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা
৫. একটি নিরাপদ ও সহজে প্রবেশযোগ্য পরিবেশ তৈরি করা
৬. উত্তম সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করা
৭. দর্শনার্থী বা পর্যটকদের জন্য সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে কৃষি পর্যটন খাত থেকে সর্বোচ্চ আয়ের পরিকল্পনা করা
৮. নির্দিষ্ট সময় পর পর বিদ্যমান কার্যক্রমগুলোর মূল্যায়ন করে সংযোজন-বিয়োজনের ব্যবস্থা করা
৯. খামারের কার্যক্রমের সঙ্গে বিনোদনমূলক বা আপ্যায়ন জড়িত করলে তার জন্য পৃথক পরিকল্পনা করা এবং মূল পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়ন করা

পূর্ণাঙ্গ খামার বা খামারের অভিজ্ঞতা

কৃষি পর্যটন দর্শনার্থীদের জন্য একটি শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা যা আসলেই বাণিজ্যিক ধারনার বাস্তবায়ন মাত্র। তবে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে একটি খামার কোনো একটি অঞ্চলের বা সম্প্রদায়ের সুনাম ছড়িয়ে দেয় বা মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে। খামারের উৎপাদিত পণ্য থেকে সেবা গ্রহণ বা খামারে রাত্রিযাপন পর্যটকদের জন্য বিরাট অভিজ্ঞতা হতে পারে। কোনো অঞ্চলের স্থানীয় কৃষি পর্যটন ও বিপণন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষির

কোনো কোনো বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেয় সেদিকগুলো সমন্বয় বা বিবেচনা করে নিজস্ব কৃষি পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে।

শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা

খামারগুলো বিভিন্ন বয়সীদের জন্য উপযুক্ত কৃষিভিত্তিক শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা অর্জনের স্থান হতে পারে। বিভিন্ন রকমের খাদ্য ও আঁশ জাতীয় ফসল উৎপাদন, জমির তত্ত্বাবধান, কৃষি ইতিহাসসহ আঞ্চলিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্পর্কে পর্যটকগণকে উপভোগ্য কোনো বিনোদন মাধ্যমে অবহিত করা যেতে পারে (যেমন- গান, আবৃত্তি, নাটিকা, তথ্যচিত্র প্রদর্শন ইত্যাদি)। কার্যক্রমগুলোকে বৈচিত্র্যময় করতে পর্যটকদের হাতে-কলমে শেখানোর আরেকটি উপায় হতে পারে মাছ ধরা, মাঠে কাজ করা, ফল-ফসল সংগ্রহ করা ইত্যাদি। এতে বিনোদনের পাশাপাশি শেখার কাজও হয়।

গ্রাহক সেবা: এটি যে কোনো ব্যবসার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গ্রাহকদের সঙ্গে সঠিকভাবে যোগাযোগ করার বিষয়ে কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ ও সর্বোত্তম সেবার নিশ্চিত করা। এটি একারণে যে একজন পর্যটক বা গ্রাহক আবার আসার ব্যাপারে আগ্রহী হবে এবং তাঁর পরিচিতজনদের সেবার মান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে যাতে অন্যেরাও সেখানে যেতে আগ্রহী হয়।

সবার জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা: কৃষি পর্যটনের জন্য একটি খামারে পার্কিং, পরিবহন বা যানবাহন, দিক-নির্দেশনামূলক সাইনবোর্ড, গ্রাহক সহায়তা, শিক্ষা এবং রাস্তার মতো মৌলিক বা প্রাথমিক সেবাসমূহ প্রদানের সুবিধা বা সক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। সে সঙ্গে পর্যটকদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি ও সাময়িক বিশ্রামের জন্য বিশ্রামাগার ও বিনোদন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন।

নিরাপদ ও উপযোগী পরিবেশ: একটি কৃষি পর্যটন খামারের প্রথম শর্তই হলো– স্বকীয়তা বজায় থাকা। অর্থাৎ নিজস্ব জমি বা লিজ নেওয়া জমি যাই হোক না কেন তার উপর নিজস্ব কর্তৃত্ব থাকা। সেসঙ্গে খামারের ভেতর অঞ্চল ভাগ করা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ওয়াশরুম থাকা এবং পরিবেশগত নিয়ম-কানুন মেনে চলার বিষয়গুলো নিশ্চিত করা। খামারে প্রবেশ ও প্রস্থানের নির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকাও জরুরি।

সামাজিক সম্পর্ক: সবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরিতে মাঝে মাঝে বিভিন্ন সংগঠন (সাংস্কৃতিক বা ব্যবসায়িক) অথবা স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় ব্যক্তিদের এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে খামার পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানানো গুরুত্বপূর্ণ।

আর্থিক পরিকল্পনা: কৃষি পর্যটনের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা জরুরি। নিয়মিতভাবে খামারের পর্যটন ব্যবসার পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বের জন্য খামার, খামারের সেবাসমূহ, উৎপাদিত পণ্যের মান এবং খামার ও পর্যটন থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পুনর্নির্ধারণ করা, যেখানে আর্থিক সুরক্ষা ও বার্ষিক প্রবৃদ্ধির বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচনা করা প্রয়োজন ।

বাজারজাতকরণ

একটি কৃষি পর্যটন খামার তৈরির পিছনের গল্প কি? কীভাবে খামারকে কৃষি পর্যটনে রূপান্তরিত করা হলো বা বাজারজাতকরণ উপযোগী করা হলো তার প্রচার কৃষি পর্যটন ব্যবসার একটি অপিরহার্য অংশ হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত। খামারের গল্প বলার ধরণে পরিষ্কারভাবে কৃষি পর্যটনে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি পর্যটক বা গ্রাহকদের কাছে এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যাতে তারা খামার পরিদর্শনে আগ্রহী হন। তবে মনে রাখতে হবে অতিরঞ্জিত এমন কিছু যুক্ত করা যাবে না, যার উপস্থিতি খামারে নেই। কৃষি পর্যটন ব্যবসায়ীদের এটা বুঝা অত্যন্ত গুরুপূর্ণ যে, খামারের কৃষি পর্যটন বিষয়ক বিষয়াবলি প্রচারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অবশ্যই নিতে হবে।

কৃষি পর্যটন ব্যবসার শুরুতেই একটি বিপণন পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। নির্দিষ্ট গ্রাহক লক্ষ্য করে বিপণন পরিকল্পনা না করে কীভাবে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সেই পরিকল্পনা সাজাতে হবে। এজন্য অনলাইনে বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ওয়েবসাইট, ব্লগ, সামাজিক মাধ্যম, ই-নিউজলেটার বা গুগলের মাধ্যম হতে পারে অন্যতম সেরা উপায়। এক্ষেত্রে এসব মাধ্যমে কৃষি পর্যটন ব্যবসার বিভিন্ন তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগাদ রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিপণনের আরো যেসব মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে সেগুলো হলো, প্রিন্ট মিডিয়া, বিজ্ঞাপন, বিলবোর্ড, লিফলেট, পুস্তিকা ইত্যাদি।

একটি শক্তিশালী বিজনেস মার্কেটিং টুল হলো গ্রাহক তথা কৃষি পর্যটকদের নিকট থেকে পাওয়া সন্তোষজনক পর্যালোচনা। এটি হতে পারে তাদের মুখের কথায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা গুগল পর্যালোচনার মাধ্যমে। ইতিবাচক মন্তব্য যে কোন নতুন কৃষি পর্যটন স্থানের জন্য একটি সম্পদ, যা নতুন পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। অন্যদিকে, কোনো নির্দিষ্ট কৃষি পর্যটন স্থানের বিষয়ে সন্তুষ্ট পর্যটকগণ আবারো সে স্থান পরিদর্শনে আসতে পারে। এতে কৃষি পর্যটন একটি ব্যবসা হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারে।

শুধু খামার গড়ে তুলে সেটিকে কৃষি পর্যটন স্পট হিসেবে পরিচিত করতে হলে কৃষি পর্যটনের সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরকেও এ বিষয়ে অবহিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে তাদের তাদের জন্য আলাদাভাবে সব কিছু প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে তারা কৃষি পর্যটনে আগ্রহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেসব খামারে নিয়ে আসতে পারে। অর্থাৎ খামার মালিক ও পর্যটক বন্দোবস্তকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি সমন্বয় গড়ে ওঠা প্রয়োজন কৃষি পর্যটনের বিকাশের স্বার্থে।

কৃষি পর্যটনে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

কৃষি পর্যটনে যুক্ত কৃষি ও পশুপাখির খামার মালিকগণ তাঁদের কর্মচারী ও পর্যটকগণের নিরাপত্তার জন্য আইনগত ও নীতিগতভাবে দায়বদ্ধ। কারণ ঝুঁকি বিবেচনা করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ ও উন্নয়ন ব্যবসায়িক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

কৃষি পর্যটন ব্যবসা রক্ষার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ করা বা তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঝুঁকি ও অবহেলার বেশ কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– নিরাপত্তা ঝুঁকি, পণ্যের ঝুঁকি, কর্মচারী সংক্রান্ত ঝুঁকি, আর্থিক ঝুঁকি। কৃষি পর্যটন ব্যবসার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কিছু কার্যকলাপ এড়িয়ে চলা, কিছু দায় মওকুফ বা স্বত্ব ত্যাগ করা, বীমার আওতাভুক্ত করা, উত্তম ব্যবস্থাপনা কৌশল অনুশীলন করা, কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং ব্যবসার প্রচলিত আইনি কাঠামোর প্রতি মনোযোগী হওয়া।

কৃষি পর্যটনে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার তালিকা পরীক্ষা

- কৃষি পর্যটন সংস্থা বা পর্যটন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা
- চাহিদা নির্ধারণের জন্য আইনজীবী, বীমা এজেন্ট, আর্থিক ব্যবস্থাপক এবং অভিজ্ঞ হিসাবরক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করা দেশের বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে ধারণা নেওয়া
- কৃষি পর্যটন ব্যবসা শুরুর আগে দেশের প্রচলিত আইন ও প্রবিধানগুলো পর্যালোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- কর্মী নিয়োগ, ট্যাক্স সংক্রান্ত, পশুপাখি পালন, প্রদর্শন এবং মানুষ ও পশু-পাখির স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, খামারের বা ব্যবসার লাইসেন্স ও লাইসেন্স ফি, লাইসেন্স নবায়ন, সর্বোপরি কৃষি পর্যটন ব্যবসার পরিকল্পনা সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ

নির্বাচিত স্থানের নিরাপত্তা

- কৃষি পর্যটনে ব্যবহৃত খামারে এমন কিছু স্থান থাকে যেগুলো থেকে দর্শনার্থী বা পর্যটকদের নিরাপদ দূরত্বে রাখা, বিভিন্ন কার্যক্রম

পণ্যের নিরাপত্তা

- কৃষি পর্যটনে ব্যবহৃত খামারে উৎপন্ন বিভিন্ন পণ্য বিপণনে সতর্ক থাকা। বিশেষ করে স্বাস্থ্য ঝুঁকি নেই এমন পণ্যই বিপণন তালিকায় রাখা।

কর্মীর নিরাপত্তা

- খামারের কর্মীদের ডাটা বেজ তৈরি ও হালনাগাদ রাখা এবং তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখা প্রয়োজন

আর্থিক নিরাপত্তা

- খামারের যাবতীয় কার্যক্রমের রেকর্ড সংরক্ষণ, অর্থ লেনদেন প্রক্রিয়া, সম্পদ ও ঋণ সম্পর্কে তথ্য হালনাগাদ ও সংরক্ষণ করা

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

- কৃষি পর্যটনে ব্যবহৃত খামারের জন্য একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়
- খামারে পর্যটকগণের জন্য নিয়ম সংবলিত লিফলেট প্রদান বা সাইন বোর্ড স্থাপন এবং নিয়মিতভাবে পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখা
- কর্মীদের জন্য নিয়ম ও বিধান বাস্তবায়ন
- দর্শনীয় স্থানগুলো পরিদর্শনে দিক-চিহ্ন সংবলিত বোর্ড ব্যবহার করা
- খামারে উৎপাদিত পণ্য বিপণনে লেবেলিং করা
- খামার বীমার আওতায় আনা এবং একটি ভালো বীমা পলিসি ও পরিমাণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। ব্যবসা, পণ্য ও কর্মীদের বীমা কভারেজের বিষয়ে বীমা এজেন্টের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা প্রয়োজন।

বিগত কয়েক দশকে গ্রামীণ জীবন ও কৃষকদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে তাদের আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে পর্যটকগণের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ কৃষি পর্যটনকে বিশ্বব্যাপী দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে সহায়তা করেছে। প্রাথমিকভাবে, কৃষি পর্যটনের মাধ্যমে খামারে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনা ও আয় বৃদ্ধি করা এবং আর্থিক সমস্যা কমাতে সহায়তা করে। এছাড়া বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে কৃষি পর্যটন গড়ে ওঠার ফলে স্থানীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং একটি টেকসই অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ভিত্তি গড়তেও সহায়তা করতে পারে। সর্বোপরি, কৃষি পর্যটন জাতীয় অর্থনীতিতে নতুন সম্ভনার দুয়ার খুলে দিতে পারে।

লেখক : সরকারি চাকরিজীবী। উদ্যান বিশেষজ্ঞ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নে বিনিয়োগ সম্ভাবনা

সাব্বির আহমেদ আরমান

অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ। সবুজ প্রকৃতির অপরূপ বৈচিত্র্যের এমন দেশ খুঁজে পাওয়া দুরূহ। যুগকে যুগ এই দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিমোহিত করেছে রথী- মহারথীদের। বৃহত্তম ব-দ্বীপ নামের বাংলাদেশের আশ্চর্য সুন্দরতার কারণে কবি 'জীবনানন্দ' লিখতে পেরেছিলেন সহস্র সুন্দর সুন্দর কবিতা। পৃথিবীর অন্য কোনো কবি প্রকৃতি নিয়ে এত কবিতা লিখেছেন কি না সন্দেহ আছে। বাংলার রূপে তিনি অভিভূত হয়ে লিখেছিলেন শ্রেষ্ঠ কবিতার একটি:

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর"

ইকো-ট্যুরিজম যা বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে খুবই প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। ইকো-ট্যুরিজম বিকাশে বাংলাদেশের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। এ দেশের প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্য পৃথিবীর অন্য দেশ থেকে অনন্য ও একক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ষড়ঋতুর দারুণ আবহাওয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ইকো-ট্যুরিজম গড়ে তুলে বৈদেশিক মুদ্রার অর্জনের দুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে।

ইকো-ট্যুরিজমের মাধ্যমে স্থায়িত্বশীল উন্নত অর্থনীতি তৈরি করা সম্ভব। এটি স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। ইকো-ট্যুরিজম বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং প্রকৃতির সংরক্ষণের মধ্যে একটি সুসংহত সমন্বয় তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে।

ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়নে বিনিয়োগ করা এখন যেন উন্নয়নের মাইলফলকে নিজেদের অবস্থান জানান দেওয়া। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে পর্যটন খাতের অবদান ১০ শতাংশের বেশি। অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবেশের সঙ্গে একাত্মতা বজায় রেখে ইকো-ট্যুরিজম খাতে শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছানো এখন সময়ের অপেক্ষা।

ইকো-ট্যুরিজমের বিনিয়োগের স্বার্থে যে জায়গাগুলো হতে পারে বিনিয়োগের অন্যতম স্থান– বৃহত্তম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার, সিলেট চা বাগান, পৃথিবীর একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন, সমুদ্রকন্যা কুয়াকাটা, সেন্টমার্টিন, হাতিয়া বা নিঝুম দ্বীপের মতো দ্বীপগুলো, পার্বত্য চট্টগ্রামের, রাঙামাটির কাপ্তাই লেক ও অন্যান্য স্পট, বান্দরবানের সাজেক ভ্যালি, নীলগিরি, চিম্বুক পাহাড, খাগড়াছড়ির আলুটিলা গুহা, সিলেটের বিছানাকান্দি ও রাতারগুল, সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর, চলনবিল, মহাস্থানগড়, মৌলভীবাজারের লাউয়াছড়া বন, বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, পাহাড়পুর, ময়নামতি, উয়ারী বটেশ্বর, ষাট গম্বুজ মসজিদসহ বিভিন্ন নদ-নদীর উপকূল, পাহাড়-পর্বত, বিভিন্ন জলপ্রপাত, হাওর, বনভূমি, উদ্যান ইত্যাদি পর্যটন এলাকা বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়াও গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা পর্যায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অঞ্চলগুলো হতে পারে বিনিয়োগের খাত।

সুষ্ঠু পরিকল্পনা, দক্ষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দেশের পর্যটনশিল্প উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। পর্যটন ব্যবসায় নিয়োজিত উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী ট্যুর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিতে সরকার, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নানামুখী উদ্যোগ নিতে হবে।

পর্যটন খাত ও ইকো-ট্যুরিজমকে গুরুত্ব দিয়ে একটি বিশেষায়িত ব্যাংক স্থাপন করা যেতে পারে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যদি পর্যটন খাতের জন্য বিশেষ সঞ্চয় স্কিম, ঋণদানের মাধ্যমে হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট,

রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় বিনিয়োগের প্যাকেজ চালুর উদ্যোগ নিতে পারে। সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ পেলে গড়ে উঠতে পারে বিভিন্ন ট্যুরিস্ট স্পট, সেখান থেকে আয় হতে পারে বিপুল পরিমাণ অর্থ।

শুধু সরকারি উদ্যোগ নয় বেসরকারি উদ্যোগ পারে ইকো-ট্যুরিজম বিপ্লবের সঙ্গী হতে। ট্যুর সম্পর্কিত সকল খাত এবং উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা গেলে এ শিল্পের প্রসার ঘটবে। অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইকো-সিস্টেম, আবাসস্থল, মানসম্মত খাদ্য, নিরাপত্তা ও ইমেজ বৃদ্ধি করা হতে পারে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা।

বাংলাদেশে ইকো-ট্যুরিজম বিনিয়োগের সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ সম্মিলিত একটি প্রয়াস। প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণে এবং স্থায়িত্বশীল উন্নত অর্থনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটকদের দর্শনীয় গন্তব্য তৈরি করতে এই প্রয়াস সহায়ক হতে পারে। স্থানীয় জনগণের প্রশিক্ষণ, সহায়তা এবং সামাজিক সম্প্রদায়ের সহায়তা ছাড়াও পর্যটকদের সংরক্ষণ এবং, সম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নত অর্থনীতি বিনিয়োগের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। এই প্রয়াস বাংলাদেশকে বিশ্বময় এবং স্থায়িত্বশীল পর্যটন হিসেবে উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে এবং এ খাত থেকে অধিক রাজস্ব আয় অর্জন সম্ভব হবে।

লেখক : ছাত্র, স্নাতকোত্তর - কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ

মুজিব'স বাংলাদেশ: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে পর্যটন

মো. বেলায়েত হোসেন

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন বাঙালি জাতির সৌভাগ্য, গৌরব এবং অহংকার। অবহেলিত-শোষিত-বঞ্চিত-নির্যাতিত-নিপীড়িত এ জাতির অধিকার আদায়ে তাঁর বজ্রকণ্ঠ এবং নেতৃত্বে তিনি হয়েছেন মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, রাজনীতির কবি, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু। উপমহাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বদরবারেও তাঁর নেতৃত্ব বিশ্ব মোড়লদের কাঁপন ধরিয়ে দেয়। তাঁর স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠন এবং বৈষম্যমুক্ত বিশ্ব রাষ্ট্র ব্যবস্থা। সে লক্ষ্যে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে '৭১-এর যুদ্ধ পরবর্তী বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুর্নগঠনের নতুন যুদ্ধ শুরু করেন। কিন্তু '৭৫ এর ১৫ই আগস্টে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র, কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিপদগামীদের বুলেটে তাঁর দেহকে বিদ্ধ করলেও নীতি-আদর্শকে মুছে ফেলতে পারেনি। তাঁর নীতি-আদর্শে অবিচল হয়ে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে, বাঙালির ভাগ্য বদলে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বাংলার সৌন্দর্য মন ভুলানো। ছাত্রজীবন থেকেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বঙ্গবন্ধু দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করতে পারলে বাংলাদেশকে সুইজারল্যান্ডের মতো নান্দনিক এবং শীর্ষ পর্যটন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা সম্ভব। সে লক্ষ্যে বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, সবুজ সমারোহ, পাহাড়, সমুদ্র, ঝরনা, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, নদী, সুন্দরবন, নৃতাত্ত্বিক সৌন্দর্য, পুরাকীর্তি, হাওর, ইতিহাস-ঐতিহ্যে মুখরিত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপত্যকে বিশ্ব দরবারে পরিচয় করে দিতে, পর্যটন খাতের উন্নয়নে এবং এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে "The Bangladesh Parjatan Corporation Order,1972" নামক ১৪৩ নং President Order (POPO) টি প্রণয়ন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় President Order এর ৩(১) নং ধারা অনুযায়ী ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান "বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন" এবং ১৯৭৩ সালে শুরু হয় এর কার্যক্রম। এটি পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তারপরই বাংলার আকাশে নেমে আসে ঘোর অমানিশা, কালো অধ্যায়। দীর্ঘ সময় অদ্ভুত উটের পিঠে চলে বাংলাদেশ; মুখ থুবড়ে পড়ে সম্ভাবনাময় এ শিল্প।

জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখার মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পর্যটন শিল্প একক বৃহত্তম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশের রূপবৈচিত্র্য বহুমাত্রিক হওয়ায় বিশ্বের যেকোনো দেশের পর্যটককে আকর্ষণ করে। অপার সম্ভাবনাময় এ শিল্পের সেবার সার্বিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও বিকাশ, দেশের অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্পের ক্রমবর্ধমান অবদানকে আরও শক্তিশালী করতে এবং জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালে প্রণয়ন করেন "বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন-২০১০"। এ আইনের ৪(১) নং ধারা অনুসারে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড(বিটিবি) গঠন করেন। এর মাধ্যমে বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে ব্যাপক প্রচার ও বিপণনের কাজ অব্যাহত রয়েছে। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অপরাধ দমনে ২০১৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যাত্রা শুরু হয় ট্যুরিস্ট পুলিশের। এ শিল্পের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে এবং সমৃদ্ধ করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২২ সালের ৭ই জুন "বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

(সংশোধন) বিল-২০২২" সংসদে পাস হয়। প্রথমে ছোট ছোট ৬টি ইউনিট নিয়ে পর্যটন খাতের কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে তার সংখ্যা ৪৬।

রূপবৈচিত্র্যের অনন্য আধার বাংলাদেশ। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমুদ্রসৈকত কক্সবাজারের কথা শুনলেই ভ্রমণ পিপাসুরা চমকে ওঠে। পার্বত্যাঞ্চলের সৌন্দর্য বর্ণনা করলে সবসময় কিছুটা ঘাটতি থেকে যায়। পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি পর্যটন এলাকা; যেদিকে চোখ যাবে শুধু পাহাড়, অরণ্য, ঝরনা আর মেঘের ভেলা। নীলাকাশে সাদা মেঘের ভেলা, তার নিচে সবুজ শ্যামল পাহাড়। একাকার আকাশ, মেঘ আর পাহাড়। কে কার সঙ্গে মিশেছে তা যেন গোলক ধাঁ-ধাঁ। আকাশে হেলান দিয়ে ঘুমন্ত সেই পাহাড়ের বুক চিঁড়ে চলে গেছে পাহাড়ী ঝিরি আর ঝরনা। অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি পার্বত্য তিন জেলা। সাজেক পার্বত্যাঞ্চল তথা বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। এর অবস্থান রাঙ্গামাটিতে হলেও যেতে হয় খাগড়াছড়ি হয়ে। এর দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। প্রতিটি ঋতুতেই এর আলাদা সৌন্দর্য পর্যটকদের বিমোহিত করে। সকালে দরজা খুলে বের হতেই যদি মেঘের ভেলা আসে স্বাগত জানাতে কিংবা মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ার দৃশ্য খুব কাছ থেকে দেখা যায় কিংবা ভরা পূর্ণিমায় তারার মেলায় জোছনার আয়োজন কিংবা সাতসকালে সূর্যের আলোকপ্রভা শিশিরে ভিজে থাকা ঘাসে পড়ে রঙধনুর সাত রঙে চোখ রাঙায় তাহলে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। শহুরের ইট -পাথরের দেওয়ালে আবদ্ধ থেকে বুঝা যায় না বাংলাদেশে এত সুন্দর পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। এখানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী লুসাই পরিবারের বসবাস। আমাদের দেশের লোকজন অবকাশযাপনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যায়। অনুরূপভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোকজনও আমাদের দেশে আসে, তবে দুর্গম এবং ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় নিরুৎসাহিত হয়। খাগড়াছড়ির রিসাং ঝরণা, আলুটিলা গুহা, রাঙ্গামাটির কাপ্তাই লেক, বান্দরবানের নীলাচল, নীলগিরি, বগালেক, দেবতাখুম, রেমাক্রি ফলস, নাফাকখুম, অমিয়খুম, চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সৈকত, ফয়'জ লেক, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, চাঁদপুর মিনি কক্সবাজার উল্লেখযোগ্য। তিন পার্বত্য জেলায় ১০৩৬ কি.মি. সীমান্ত সড়ক নির্মাণাধীন ; যেটি পুরোটাই একটি পর্যটন সড়ক। এতে নতুন নতুন পর্যটন স্পট আবিষ্কার হচ্ছে।

ঢাকায় রয়েছে জাতীয় সংসদ ভবন, আহসান মঞ্জিল, লালবাগ কেল্লা। রাজশাহী বিভাগের যে-সব পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে তার অধিকাংশই ইতিহাস-ঐতিহ্যে মুখরিত পুরাকীর্তি, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। পাহাড়পুর বা সোমপুর বৌদ্ধবিহার, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, বাঘা মসজিদ, মহাস্থানগড়, গোবিন্দ ভিটা, বেহুলার বাসর ঘর গোকুল, পরশুরামের ভিটা, জিউৎকণ্ড, শীলাদেবীর ঘাট, কালীদহ সাগর। রংপুরের রামসাগর, সিলেটের জাফলং, রাতারগুল, ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর, লালা খাল, মৌলভীবাজারের মাধবকুণ্ড, চা বাগান, হাকালুকি হাওর, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওড়, সুন্দরবন, সাগরকন্যা খ্যাত কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত।

অলি–আউলিয়ার দেশ বাংলাদেশ। ইসলাম প্রচারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এ অঞ্চলে আসেন পীর-মাশায়েখ-অলি- আউলিয়া-বুজুর্গগণ। বার আউলিয়ার চট্টগ্রাম ও পুণ্যভূমি সিলেট ছাড়াও সারাদেশে তাঁদের কার্যক্রমকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নান্দনিক নিদর্শন স্বরূপ দরগা, কেল্লা, মাজার। যেগুলো ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন এবং পর্যটন কেন্দ্র। এছাড়া বিশ্বের ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারাদেশে নির্মাণ করেছেন নান্দনিক ৫৬০টি মডেল মসজিদ এবং ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। যেগুলোর সৌন্দর্য পর্যটকদের মোহিত করার মতো। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, নেপাল, ভুটান ধর্মীয় স্থাপনাগুলোতে পর্যটকদের আকর্ষণ করাতে পারায় পর্যটকদের ভীড় দিনে দিনে বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। সুলতানি আমল থেকে শুরু করে মোঘল আমলের অনেক ধর্মীয় স্থাপত্যকীর্তি বাংলাদেশে আছে। বিভিন্ন জরিপে দেখা যায়, বিশ্বে মুসলিম পর্যটকদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। পর্যটন-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ধর্মীয় ঐতিহ্যপূর্ণ স্থানের পর্যটন আগামী কয়েক বছরের মধ্যে হয়ে উঠতে পারে দেশের আয়ের অন্যতম খাত এবং আগামী পাঁচ বছরে এই খাতে বছরে দেড় থেকে দুই হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব। কারণ, দেশে ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থাপনার অভাব নেই। বিশ্বে ৫৭টির মতো মুসলিম দেশে ১৬০ কোটি মুসলমান রয়েছেন। মুসলিম ঐতিহ্য দর্শনে আগ্রহী এ

জনগোষ্ঠীকে ভ্রমণে উৎসাহিত করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে সে-সব দেশের নাগরিকদের কাছে এটি তুলে ধরতে পারলে ইসলামিক পর্যটন দ্রুত বিকশিত করা সম্ভব। সে লক্ষ্যে একটি শহরকে ফোকাস করে বিশ্বব্যাপী ইসলামি কৃষ্টি-সংস্কৃতির গুরুত্ব উপস্থাপন করা যায়। এছাড়া প্রতিবছর মুসলিম উম্মার দ্বিতীয় বৃহত্তম জমায়েত বিশ্ব ইজতেমার আয়োজক বাংলাদেশ। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়েও ইসলামি পর্যটনকে বিকশিত করা যায়।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে পর্যটন খাতের অবদান ছিল ৩.০২% এবং মোট কর্মসংস্থানের ৮.০৭% সুযোগ তৈরি হয়েছে এ খাতে (সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)। ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিলের (ডব্লিউটিটিসি) তথ্য বলছে, ২০২১ সালে বাংলাদেশের জিডিপিতে পর্যটনশিল্পের মোট অবদান ছিল ৭ হাজার ৮৩৩ মিলিয়ন ডলার, যা দেশের মোট জিডিপির ২ দশমিক ২ শতাংশ। অন্যদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র মালদ্বীপে ২০২১ সালে জিডিপিতে পর্যটনশিল্পের মোট অবদান ছিল ২ হাজার ৮৭ মিলিয়ন ডলার, যা দেশটির মোট জিডিপির ৪৪ দশমিক ৬ শতাংশ। ২০১৫ সালে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ শুরু করে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি)। বাংলাদেশের পর্যটন খাত নিয়ে তৈরি করা মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়ন হলে তা জিডিপিতে ১০ শতাংশ অবদান রাখা সম্ভব। মাস্টারপ্ল্যানে গোটা বাংলাদেশকে আটটি রিজিয়ন এবং ৫৩টি ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১৯টি ক্লাস্টারের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে(সূত্র: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড)। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বাণিজ্য সংগঠন ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (টোয়াব) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে পর্যটনের প্রায় ১ হাজার ১০০টি গন্তব্য থাকলেও পর্যটকেরা মূলত কক্সবাজার, কুয়াকাটা, সুন্দরবনের মতো গুটিকয়েক গন্তব্যেই ভ্রমণে যাচ্ছেন। দেশে এ খাতে বর্তমানে প্রায় ৪৫ হাজার শ্রমিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান রয়েছে। এ খাত বিস্তৃতিতে কর্মসংস্থান বাড়ালে বেকারত্ব কমবে বহুগুণে।

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটলেও পর্যটনকেন্দ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনো অপ্রতুল; বিশেষ করে দুর্গম এলাকাসমূহ যেমন পার্বত্যাঞ্চল, হাওরাঞ্চল, সুন্দরবনের যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণে উৎসাহের অন্যতম অন্তরায়। এছাড়াও রয়েছে নিরাপত্তার উদ্বিগ্নতা, অবকাঠামোগত অসুবিধা। 'ছিনতাইকারীর আক্রমণের শিকার পর্যটকরা' খবর এখনো পাওয়া যায়। প্রতারক, ফেরিওয়ালা কিংবা ফটোগ্রাফারদের অহেতুক বাড়াবাড়িতে পর্যটকরা বিব্রতবোধ করেন। বড় এবং ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্রগুলো যেমন কক্সবাজারে বিদেশি পর্যটকদের চাহিদা বিবেচনায় বিভিন্ন সুবিধা ও সেবা দিতে না পারলে বিদেশি পর্যটকরা উৎসাহিত হবেন না। বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে, পর্যটন শিল্প বিকাশে এবং পর্যটনকেন্দ্রিক অর্থনীতির সমৃদ্ধিতে এটি অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের যে দেশগুলো (যেমন প্রতিবেশী রাষ্ট্র মালদ্বীপ) অর্থনীতি পর্যটন নির্ভর তাদের অনুসরণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্নস্থানে যে সকল হোটেল–মোটেল নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলোতে যুগোপযোগী সেবা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ দিতে পারলে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে কয়েকগুণ। এ ছাড়া সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠানকে পর্যটন খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে পারলে এ শিল্পের উৎকর্ষ বাড়বে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পর্যটনের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আছে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন বিষয়ক মন্ত্রণালয়। অর্থাৎ অন্য একটি বড় খাতের সঙ্গে পর্যটনকেও এক করা হয়েছে যার কারণে উন্নয়ন কার্যক্রমে মনোযোগ কিছুটা মন্থর বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। পর্যটন খাতকে সমৃদ্ধ করতে আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন সময়ের দাবি।

লেখক : সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অফিস, রামগড়

পর্যটন নিরাপত্তা

মোছা. ইয়াছমিন খাতুন

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই পর্যটনে নিরাপত্তা সমস্যাগুলি গণপর্যটনের বিবর্তনের মাধ্যমেই সবার সামনে চলে আসে। এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার মূলে নিম্নলিখিত কারণগুলোকে উল্লেখ করা যায় :

(১) পর্যটন এখন আর কেবল উচ্চবিত্ত শ্রেনির অবকাশযাপনের বিষয় নয় বরং মধ্যবিত্তরা ক্রমান্বয়ে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত হয়েছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যবিত্ত শ্রেনির আয় বৃদ্ধি এবং অবকাশযাপনের ইচ্ছা থেকে তারা ভ্রমণে আগ্রহী হয়েছে।

(২) কেবল উন্নত দেশগুলিই নয় বরং তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ বর্তমানে পর্যটন শিল্পে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। তাদের জন্য পর্যটন অর্থনৈতিক বিকাশে অন্যতম একটি কৌশল।

(৩) বিমান এবং অন্যান্য দ্রুতগামী পরিবহন ব্যবস্থা বৃদ্ধির ফলে বৈশ্বিক ভৌগোলিক দূরত্ব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর কারণে পর্যটন বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম বৃহৎ শিল্পে পরিণত হয়েছে যেখানে নিরাপত্তা ইস্যু একটি বড় গুরুত্ব বহন করে। নিরাপত্তার বিষয়টি মনে রেখেই পর্যটকগণ তাদের গন্তব্য নির্বাচন করেন। নিরাপত্তা ও সুরক্ষার অভাব শুধু কোনো ব্যক্তির অবকাশযাপনকেই বাধাগ্রস্ত করে না বরং এটি একটি দেশের পর্যটন শিল্পকেও ধ্বংস করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে পর্যাপ্ত সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার মিলিতরূপই একটি গন্তব্যকে আকর্ষণীয় করে তোলে। কোনো একটি ছোট অপরাধই পর্যটন গন্তব্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে যথেষ্ট। পর্যটন স্পটে অপরাধ সংঘটিত হলে তা পর্যটকদেরকে শঙ্কিত করে এবং ঐ স্পট সম্পর্কে তার মনে নেতিবাচক ধারণার জন্ম নেয়। তাই পর্যটন কেন্দ্রে যে কোনো অপরাধ রোধকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বব্যাপী পর্যটনের যুগে নিরাপত্তা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে? নিরাপত্তা সমস্যার মূল উপাদানগুলি কী কী? পর্যটকরা যখন তাদের গন্তব্য বেছে নেয় তখন নিরাপত্তা সমস্যাগুলি কীভাবে তাদের প্রভাবিত করে? পর্যটনে নিরাপত্তাকর্মীদের কাজ এবং দায়িত্ব কী? এসব বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার এখনি সময়।

নিরাপত্তা একটি জটিল বহুমাত্রিক ধারণা। এর কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তি, স্থান, বস্তু, খ্যাতি বা অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকারক যে কোনো কার্যকলাপ (ব্যক্তি)–এর বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাকে নিরাপত্তা হিসেবে অভিহিত করা যায়। পর্যটন নিরাপত্তা বলতে পেশাদার, অভিজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকদের দ্বারা গঠিত একটি পরিকল্পনাকে বুঝায় যা গন্তব্যস্থল ও পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য গঠিত হয়। বর্তমানে পর্যটন নিরাপত্তায় অর্ন্তগত উপাদানগুলির সঙ্গে জননিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, ব্যক্তিগত ডেটা নিরাপত্তা, পর্যটকদের আইনি সুরক্ষা, ভোক্তা সুরক্ষা, যোগাযোগ নিরাপত্তা, দুর্যোগ সুরক্ষা, পরিবেশগত নিরাপত্তা, খাঁটি তথ্য পাওয়া ও সেবার গুণগতমানের নিশ্চয়তা ইত্যাদি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং এটি বলার অবকাশ রাখে না যে, নিরাপত্তা ক্রমান্বয়ে একটি প্যাসিভ ফ্যাক্টর থেকে পর্যটনের একটি সক্রিয় উপাদানে পরিণত হয়েছে যা একইসঙ্গে পর্যটক এবং তাদের সম্পদের পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের সমস্ত অর্জনগুলিকে রক্ষা করার জন্য অপরিহার্য। নিরাপত্তা পর্যটকদের হোস্ট করার একটি মৌলিক শর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এখন "Safety sells in tourism" পর্যটন শিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্লোগান।

অপরাধ প্রতিরোধেই নিহিত রয়েছে পর্যটনের নিরাপত্তার সাফল্য। পর্যটন নিরাপত্তায় থাম রুল হলো মানুষের দ্বারা তৈরি যে কোনো কিছু মানুষের দ্বারা ধ্বংস হতে পারে। সুতরাং শতভাগ নিরাপত্তা প্রদান সম্ভব নয়। পর্যটনে নিরাপত্তা হলো সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা। নিরাপত্তাকর্মীদের কাজ হলো পর্যটন খাতের ঝুঁকিকে একটি সহনীয় পর্যায়ে অথবা পরিচালনা পর্যায়ে রাখা। গৃহীত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শতভাগ নিরাপত্তা প্রদান সম্ভব না হলেও অনেকাংশে ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব। পর্যটন নিরাপত্তায় নিয়োজিত বাহিনী শুধু অপরাধ/অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থাই গ্রহণ করবে না পাশাপাশি তাদেরকে অবশ্যই অপরাধ প্রতিরোধে মনোনিবেশ করতে হবে।

পর্যটন হলো একটি জাতির পার্লার (অর্থাৎ এটি একটি জাতির স্বচিত্র আইকন এবং ইতিহাসের রক্ষক)। পর্যটন কেন্দ্রগুলি একটি জাতির সাংস্কৃতিক সম্পদের জীবন্ত জাদুঘর। একটি দেশের পর্যটনের উপর আক্রমণ/আক্রোশের মোটা দাগে নিম্নলিখিত কারণগুলো উল্লেখ করা যায়:

- পর্যটন একটি বড় ব্যবসা যা একটি দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে এবং সন্ত্রাসবাদ/দুষ্কৃতকারী অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে চায়
- পর্যটন পরিবহন কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে আন্তঃসংযুক্ত, তাই পর্যটনের উপর আক্রমণ বিশ্ব পরিবহনকে প্রভাবিত করে
- পর্যটন একাধিক শিল্পের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কিত তাই পর্যটন শিল্পের উপর আক্রমণ অনেকগুলো গৌণ শিল্পকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে
- পর্যটন অত্যন্ত মিডিয়াভিত্তিক এবং সন্ত্রাসী/দুষ্কৃতকারীরা প্রচার চায়
- পর্যটনকদের সুনির্দিষ্ট কোনো ডাটাবেজ থাকে না তাই সন্ত্রাসীদের পক্ষে পর্যটকদের ভিড়ে মিশে যাওয়া সহজ
- পর্যটনকে অবশ্যই নতুন লোকদের স্বাগত জানাতে হয় তাই সন্ত্রাসীদের খুব কমই সন্দেহ করা হয়

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবর্তন নিরাপত্তা সমস্যাসহ পর্যটনের উপরে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। এ সময়ে বিশ্বের বিস্তৃত পরিবর্তন এবং চ্যালেঞ্জ পর্যটনে নিরাপত্তা ধারণার বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করেছে।

পর্যটকদের নিরাপত্তার পাশাপাশি তাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য আলাদা নিরাপত্তা ইউনিটের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। সে আলোকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে পর্যটন নিয়ে কাজ করার জন্য বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট গঠন করা হয়েছে। এই বিশেষায়িত ইউনিটগুলো শুধু আইন প্রয়োগকারী সংস্থাই নয় বরং এটিকে পর্যটন শিল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মনে করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে পর্যটন পুলিশ TOPPs নামে পরিচিত। যার পূর্ণ রূপ হলো 'Tourism Oriented Policing and Protection Services'. ল্যাটিন আমেরিকাতে এটি "politur" নামে পরিচিত। এই ইউনিটগুলি পর্যটক এবং পর্যটন এলাকা সুরক্ষিত করার পাশাপাশি পর্যটনের একটি ইতিবাচক প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। একটি পর্যটন এলাকার জনসাধারণ আইনের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল তা ঐ এলাকায় কর্মরত নিরাপত্তাকর্মীদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে তা বোঝা যায়। ট্যুরিজম ওরিয়েন্টেড ইউনিটে যেসকল অফিসার কাজ করে তাদের কিছু বিষয় সম্পর্কে বিশেষ ধারণা থাকতে হয়। তারা পর্যটন শিল্পের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশদ ধারণা রাখে। তারা তাদের এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, তারা শুধু পর্যটক অথবা দর্শনার্থীদের নিরাপত্তাই প্রদান করবে না একইসঙ্গে স্থানীয় পর্যটন শিল্পকে রক্ষা করবে। পর্যটন কেন্দ্রে অপরাধ প্রতিরোধ করাই শুধু তাদের দায়িত্ব কতর্ব্য নয় পর্যটকদের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করবে সেটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পর্যটন পুলিশ গতানুগতিক পুলিশ হতে স্বতন্ত্র। একজন পর্যটন পুলিশের পোশাক পরিচ্ছদ, দক্ষতা, পর্যটন সম্পর্কিত জ্ঞানে তারা আলাদা। তারা দর্শনার্থীদের জন্য প্রশিক্ষিত এবং তারা স্থানীয় সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও সুনামের প্রতি যত্নশীল। একজন পর্যটন নিরাপত্তাকর্মীর বৈচিত্র্যময় অনেক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। যেমন:

- ভাষা দক্ষতা
- আন্ত:সাংস্কৃতিক যোগাযোগ দক্ষতা
- সংবেদনশীলতা
- লিঙ্গ সংবেদনশীলতা
- শ্রবণ দক্ষতা
- স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পেশাদারী মনোভাব নিয়ে তারা পর্যটন শিল্পে নিরাপত্তা প্রদান করবে এবং একইসঙ্গে পর্যটনে নিরাপত্তা প্রদান হবে তাদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব। পর্যটন পুলিশই বিশ্বব্যাপী পর্যটন শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করবে।

লেখক : পুলিশ সুপার (ট্রেনিং এন্ড ওরিয়েন্টেশন), ট্যুরিস্ট পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

বাংলাদেশের পর্যটন ও পর্যটক আকর্ষণে ট্যুর গাইডিং

শিকদার নূরুল মোমেন

দেশে দেশে কত নগর রাজধানী
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবন ও জীবিকার অন্বেষণে ক্লান্ত-অবসন্ন মানুষ একটু অবসর চায়, চায় খানিকটা বিশ্রাম। এই অবসর ও বিশ্রামের জন্যেই মানুষের বোহেমিয়ান মন ছুটে যায় প্রকৃতির কোলে। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধের সান্নিধ্যে এসে জুড়ায় তাপিত জীবনের সব ক্লান্তি। সৌন্দর্যপিয়াসিরা অবলোকন করতে চায় প্রকৃতির অপ্সরী রূপ, অনুসন্ধিৎসু মন সব অজানাকে জানতে সহজাত তাড়নায় ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে। অন্যদিকে লীলাবতী প্রকৃতি অপার সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে প্রতিনিয়ত মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ভ্রমণবিলাসী মানুষ সেই অজানা সুদূরের আহবানে বেরিয়ে পড়ে পৃথিবীর সৌন্দর্য-রোমাঞ্চিত মুক্তাঙ্গনে।

বেড়ানো বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থান কিংবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ করার কার্যাবলিই পর্যটন আর যিনি আমোদ-প্রমোদ বা বিনোদনের উদ্দেশ্যে অন্যত্র ভ্রমণ করেন তিনি হলেন পর্যটক। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পর্যটন একটি অর্থনৈতিক শিল্পরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। পর্যটন ব্যবস্থাপনা বলতে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানকে বোঝায়। এটি একটি বহুমুখী শিল্প যা মানুষকে পর্যটন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়, দক্ষতা বৃদ্ধি করে। ট্যুর অপারেটররা পর্যটন পণ্যের পরিকল্পনা, উন্নয়ন, প্রচার, প্রশাসন এবং বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত। ট্যুর অপারেটর ট্রিপ/ট্যুর প্যাকেজের পরিকল্পনা করে এবং ট্র্যাভেল এজেন্ট ট্যুর প্যাকেজ বিক্রির কাজে নিয়োজিত থাকে। ট্যুর অপারেটর, ট্র্যাভেল এজেন্ট, ট্যুর গাইড, পর্যটন সংস্থা প্রভৃতি সেবা খাত পর্যটনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই জড়িত।

পর্যটন শিল্প বিশ্বের এক অন্যতম বৃহৎ শিল্প। পর্যটক আকর্ষণের প্রধান উপায় হচ্ছে প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক এবং পৌরাণিক উপাদান ও নিদর্শনসমূহ তুলে ধরা। একটি দেশের পর্যটন শিল্প বিকাশের মধ্যে দেশের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়। পর্যটন এলাকায় অধিবাসীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে একটি মানবিক পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে। কোথাও কোথাও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান কিংবা তীর্থস্থানে দর্শনার্থীদের গমনাগমনকে কেন্দ্র করেও পর্যটন শিল্প গড়ে ওঠে। একদিকে বিদেশি পর্যটকদের আগমনে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়ে, অন্যদিকে দেশীয় পর্যটকদের ভ্রমণ সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। সুদূর অতীতকালে খেয়াল কিংবা শখের বশে মানুষ বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করলেও বর্তমানে পর্যটন একটি অনন্য শিল্পে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীতে অনেক দেশেরই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে পর্যটন শিল্প। করোনার সময় সবচে' ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই পর্যটন শিল্প। করোনা পরবর্তী সময়ে অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম যে পাঁচটি সেক্টর চিহ্নিত করেছে, তার মধ্যে পর্যটন খাত উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য অন্যান্য শিল্পের পাশাপাশি পর্যটনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনা-সমৃদ্ধ দেশ। ছবির মতো সুন্দর বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি। দিগন্তজোড়া সবুজের সমারোহ, শ্যামল-শোভন বন-বনানী, উঁচু-নিচু পাহাড়, সুকণ্ঠি পাখির কলকাকলি, দেশ জোড়া রুপালি নদীর বিস্তার, ঋতুতে ঋতুতে রং আর রূপের অপরূপ বর্ণিল শোভা– সবকিছু মিলে এদেশ সৌন্দর্য মহিমায় অনন্য। দেশ-বিদেশের ভ্রমণকারীদের পর্যটন সুবিধা দিতে সরকার বাংলাদেশে গড়ে তুলেছে সম্ভাবনাময় পর্যটন খাত। পর্যটন শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বেকারত্ব দূরীকরণ, কুটির শিল্প ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, সরকারি রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন, বৈদেশিক বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ শিল্প নানা কারণে পিছিয়ে থাকলেও এর সম্ভাবনা প্রচুর, উন্নয়নও অপরিহার্য। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যাত্রায় অনন্য অবদান রাখতে পারে এই পর্যটন শিল্প।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পর্যটন খাতে নানামুখী ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনায় পর্যটন শিল্পকে আগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখা, ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করা, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পর্যটন পুলিশ গড়ে তোলা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দুর্নীতি রোধ, পর্যটন নগরী গড়ে তোলা, পর্যটন স্থানসমূহের পরিবেশ দূষণ রোধ, দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগ অতীব প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে পর্যটন মেলার আয়োজন, বিদেশে বাংলাদেশের ট্যুরিজম প্রমোশনে রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারের উদ্যোগ গ্রহণ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা, পর্যটন বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ, ব্র্যান্ডিং ও প্রচারণা চালানো, ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালুকরণ, পর্যটন এলাকা জুড়ে লোকজ সংস্কৃতি মেলা ও উৎসবের আয়োজন, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক রুচি ভেদে পর্যটন সুবিধার ভিন্নতা তৈরি, পর্যটন কেন্দ্রসমূহে পর্যটকদের জন্য অত্যাধুনিক আয়োজন, বিদেশি পণ্যের বদলে দেশীয় পণ্য ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বাজার সৃষ্টি, পর্যটকদের প্রতি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক মনোভাবের সম্পৃক্ত ঘটিয়ে এই খাতকে আরও জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব। পর্যটন স্থানগুলোর জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো একান্ত আবশ্যক। পর্যটন স্থানগুলোয় উন্নতমানের হোটেল ও রেস্টুরেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণসহ উন্নত সেবাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ শিল্পে কর্মরত পর্যটক গাইড সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং দক্ষ ও পেশাদার জনবল তৈরি করা জরুরি। পর্যটকদের এতটাই সম্মান দেখাতে হবে যেন তারা নিজ দেশে ফিরে গিয়েও আবারও বাংলাদেশে ভ্রমণে আগ্রহী হন।

মানুষ বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বেছে নিচ্ছে বেড়ানো বা ভ্রমণকে। বাংলাদেশে একদিকে যেমন মানুষের মধ্যে ভ্রমণপ্রবণতা বাড়ছে, তেমনি বিদেশি পর্যটকদের এ দেশে বেড়াতে আসার পরিমাণও বাড়ছে। যে ব্যক্তি সমস্ত ট্যুর পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন তিনি হলেন ট্যুর গাইড। যে প্রতিষ্ঠান ট্যুর পরিচালনা করেন সেই প্রতিষ্ঠানটি ট্যুর অপারেটর। ট্যুর পরিচালনার ক্ষেত্রে যাতায়াতের জন্য যানবাহন সেবা, থাকার জন্য আবাসন সেবা, খাবারের ব্যবস্থা, ভ্রমণ গন্তব্যের বিস্তৃত বিবরণ, আশেপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ, শিল্প-সংস্কৃতি, জীব বৈচিত্র্য, ইতিহাসের বিবরণ ও সফলভাবে ভ্রমণ পরিচালনা ইত্যাদির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে ট্যুর গাইডিং ম্যানেজমেন্ট বলা হয়। ট্যুর গাইডের চাহিদা বাংলাদেশে দিন দিন বাড়ছে। তবে বাংলাদেশে দক্ষ ট্যুর গাইডের অভাব রয়েছে। কিন্তু পর্যটন শিল্প বিকাশে ট্যুর গাইডের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যারা প্রকৃতিকে ভালোবাসেন, ঘুরতে পছন্দ করা এবং জীবনের প্রতি পরতে পরতে রোমাঞ্চ পেতে চান তারাই পেশা হিসেবে এই পেশাটিকে বেছে নিতে পারেন। পর্যটন শিল্পের চলমান উন্নতির ফলে দিন দিন ট্যুর গাইড একটি অপার সম্ভাবনাময় পেশা হিসেবে গড়ে উঠছে।

পর্যটকদের উদ্দেশ্য থাকে কোনো স্থানে ভ্রমণ উপভোগ করা, সেই স্থান সম্পর্কে জানা, নতুন অভিজ্ঞতা নেওয়া এবং সর্বোপরি যেকোনো ধরনের ঝামেলামুক্ত থেকে ভ্রমণ উপভোগ করা। একজন পর্যটক বেড়াতে যাওয়ার আগে সাধারণত সেই স্থান সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। ট্যুর গাইড সাধারণত পর্যটকদের ভ্রমণে সাহায্যকারী

হিসেবে কাজ করে থাকেন। তাই একজন গাইডের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে পেশাগতভাবে পর্যটকদের এসব চাহিদা নিশ্চিত করা। এ জন্য সব সময় একজন গাইডকে আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে যাতে পর্যটকদের মনে একটা আস্থা তৈরি হয়। হুজুকের বশে কেউ ট্যুর গাইড হতে পারে না। পেশা হিসেবে শুরু করার আগে কাজটিকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। ট্যুর গাইড কী কাজ করেন, তাদের কী গুণ থাকা প্রয়োজন, তাদের কী দক্ষতা অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। ট্যুর গাইডিং-এর উদ্দেশ্য হলো সঠিকভাবে ট্যুর পরিচালনা, অল্প সময়ে দক্ষতার সঙ্গে ট্যুরের ব্যবস্থাপনা, পর্যটকদের ট্যুর সম্পর্কে গাইড করা, ট্যুরিজম গন্তব্যের তথ্য উপাত্ত জানানো, ট্যুরের শুরু থেকে শেষ অব্দি পর্যটকদের নিরাপত্তা প্রদান, সফলভাবে ট্যুর পরিচালনার জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। নানা ক্ষেত্রে ট্যুর গাইডিং-এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যেমন, কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়া, দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ, দেশ-বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধা, নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে ভ্রমণ, ইতিহাস-ঐতিহ্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ এবং ভ্রমণ নিয়ে মানুষকে সচেতন করা।

একজন গাইডকে তার পেশায় সফল হতে হলে বেশ কিছু বাড়তি যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। ট্যুর গাইড তখনই সফল হবেন যখন তিনি এই পেশাসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে সমর্থ হবেন। বিশেষ দক্ষতা অর্জনে বেশ কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। সেগুলো হলো, পর্যটকদের সঙ্গে দ্রুত মিশতে পারার ক্ষমতা, বন্ধুসুলভ আচরণ, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সুন্দর ও স্পষ্টভাবে কথা বলা, কাজের প্রতি আগ্রহী, সব সময় ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেওয়া, সৎ ও সাহসী হওয়া, যেকোনো পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উপস্থিত বুদ্ধি খাটানো, পর্যটকদের সব কথা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা, পর্যটকের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান, কম্পিউটারের বিভিন্ন দিক ও ছবি তোলার দক্ষতা থাকা। একজন ট্যুর গাইডকে দেশের আইন-শৃঙ্খলা, সরকার প্রদত্ত পর্যটকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও বিধিনিষেধ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। এছাড়াও ইংরেজি ভাষাসহ অন্যান্য ভাষার ওপর বিশেষ দখল থাকলে বিদেশি পর্যটকদের সঙ্গে কাজ করতে সুবিধা হয়। ট্যুর গাইডকে অবশ্যই সময় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং ট্রিপের অন্য সদস্যদের সময়ানুবর্তি হতে উৎসাহিত করা। তাদের নতুন কিছু শেখার ক্ষেত্রে প্রবল আগ্রহ থাকা উচিত। পর্যটন স্থানে যাওয়ার আগে অন্তত উইকিপিডিয়া থেকে ওই স্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে নেওয়া জরুরি। একজন দক্ষ গাইড হয়ে ওঠার আগে অবশ্যই সেই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিকল্প নেই। শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করলে হবে না, ব্যবহারিক জ্ঞানও প্রয়োজন। এ জন্য তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তা বাস্তবে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে প্রথম প্রথম স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করা যেতে পারে। বাজারে ট্যুরিস্ট গাইড বিষয়ক বিভিন্ন বই পাওয়া যায়। এসব বই পড়েও এ পেশা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে। দক্ষ ও সময়োপযোগী ট্যুর গাইডের মাধ্যমে একটি দেশের পর্যটন শিল্পে উন্নয়নের গতি আরও সমৃদ্ধ ও বেগবান হতে পারে।

সর্বোপরি অর্থনৈতিক অবদানের পাশাপাশি সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পর্যায়ে ভ্রাতৃত্ব ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় পর্যটন শিল্পের অবদান অপরিসীম। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, নৈসর্গিক দৃশ্য সবই পর্যটন শিল্পের অনুকূলে। এখন শুধু প্রয়োজন এই নিসর্গ-সমৃদ্ধ সুন্দর দেশটাকে পর্যটনের জন্য আকর্ষণীয় করে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। বাংলাদেশের সৌন্দর্যে যুগে যুগে বহু পরিব্রাজক ও ভ্রমণকারী মুগ্ধ হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা অপরিসীম। সুবিশাল সমুদ্রসৈকত, পাহাড়, জলপ্রপাত, প্রত্নতত্ত্বের প্রাচুর্য, ঐতিহাসিক নিদর্শনসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থান এই বাংলাদেশ; যা পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ ইতিহাস, বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি বাংলাদেশকে পরিণত করেছে একটি বহুমাত্রিক আকর্ষণসমৃদ্ধ অনন্য পর্যটন গন্তব্যে।

লেখক : গল্পকার ও সম্পাদক, শৈল্পিক ও হিসাব কর্মকর্তা, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

মুজিব'স বাংলাদেশ : সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে পর্যটন

আশুতোষ সাহা

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের এই দেশ। নয়নাভিরাম প্রকৃতি, অবারিত মাঠ, সবুজ অরণ্য, ঐতিহ্য, বৈচিত্রপূর্ণ সংস্কৃতি, গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, মানুষের স্বতন্ত্র জীবনাচার; পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, দিনেমার আর ইংরেজদের করেছে বিমোহিত। '৪৭–এর দেশ বিভাগের পর থেকেই চলতে থাকে পাকিস্তানিদের শোষণ আর নিপীড়ন। ভাষা, রাজনীতি, অর্থনীতি এমনকি সমাজ নীতিতে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বাঙালির প্রাণের ভাষা বাংলা। আজন্ম লালিত বাংলা ভাষাকে নিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর গভীর ষড়যন্ত্র। বাঙালি তা মেনে নিতে পারেনি। তাইতো তারা করেছে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ছিষট্টির বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান। বাঙালি জাতি সংগ্রাম করেছে ভাষার জন্য, সংগ্রাম করেছে স্বাধীনতার জন্য। প্রথমত স্বায়ত্তশাসন, তারপর স্বাধিকার আন্দোলন। এ থেকেই জন্ম নেয় মুক্তিযুদ্ধের। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ সমগ্র জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে জুগিয়েছে প্রেরণা। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফলে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা, অর্জিত হয়েছে প্রিয় স্বদেশ বাংলাদেশ।

স্বাধীনতাত্তো বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। দেশের অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, কৃষি, শিল্প ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের নিয়েছিলেন নানামুখী পরিকল্পনা। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ছোঁয়া লেগেছে পর্যটন খাতে। তিনি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার মূল লক্ষ্য ছিল এ দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করা। সেই থেকে এই করপোরেশন বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণে কাজ করে চলেছে। সমৃদ্ধ বলতে আমরা বুঝি ঐশ্বর্যশালী, প্রাচুর্যযুক্ত সম্পদশালী, উন্নতি, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। সমৃদ্ধ বলতে সামগ্রিক অগ্রগতিকে বুঝি। যখন দেশের অর্থনীতি, যোগাযোগ, কৃষি, শিল্প, প্রযুক্তি, মানুষের জীবনযাত্রার মান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় পর্যটনসহ সামগ্রিক অগ্রগতি সাধিত হয় তখন তাকে আমরা সমৃদ্ধ দেশ বলতে পারি। আর বঙ্গবন্ধু সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এজন্য তিনি আমৃত্যু নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণে তার অবদান অপরিসীম। পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট বাঙালি জাতির কলঙ্কজনক অধ্যায় বঙ্গবন্ধুর এই হত্যাকাণ্ডের পর উন্নয়নের ধারা স্থবির হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন রাষ্ট্রক্ষমতায়, তখন উন্নয়নের ধারা চলতে থাকে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে পর্যটন খাতের ভূমিকা অপরিসীম।

এদেশের অপার ঐশ্বর্য আর অপরূপ সৌন্দর্যপ্রিয়তায় মুগ্ধ হয়েছেন অনেক পরিব্রাজক। জগত বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা এদেশে এসেছিলেন নদী পথে, নৌকায় চড়ে। সমগ্র বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলো দেখেছিলেন। গ্রাম-বাংলার শ্যামল প্রকৃতি তাকে করেছিল মুগ্ধ। বাংলাদেশ বিনির্মাণে পর্যটন কর্পোরেশন বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ঐতিহ্যগতভাবে দর্শনীয় স্থানগুলোকে করা হয়েছে ব্যাপক সংস্কার।

২০২৫ সালের মধ্যে পর্যটন শিল্পের সর্বোচ্চ বিকাশে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। পুরো দেশটাকে আটটি পর্যটন জোনে ভাগ করে প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়ন করা হবে। এসব প্রকল্পে সরকারি ও বেসরকারি ভাবে যৌথ বিনিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পর্যটন অবকাঠামো নির্মাণে ২৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে কক্সবাজার বিমানবন্দরের উন্নয়নের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। মোটেল নির্মাণ, মহেশখালীতে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ, সোনাদিয়াকে বিশেষ পর্যটন এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা, ইনানী সৈকতের

উন্নয়ন, টেকনাফের সাবরাংয়ে ইকো ট্যুরিজম পার্ক নির্মাণ, শ্যামলাপুর সৈকতের উন্নয়ন, চট্টগ্রাম -কক্সবাজার রেলপথ নির্মাণ সমাপ্তির পথে। আগামী ডিসেম্বর ২০২৩ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যা উদ্বোধন করা হবে। কুতুবদিয়ায় বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পের সম্প্রসারণ, চকরিয়ায় মিনি সুন্দরবনে পর্যটকদের গমনের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডুলা হাজরা সাফারি পার্কের আধুনিকায়ন ইত্যাদি। তাছাড়া আরও নতুন চারটি প্রকল্প নিতে যাচ্ছে সরকার। এসব বাস্তবায়ন হলে আগামীতে দেশের পর্যটন খাত আরও চাঙ্গা হবে বলে আশা করা যায়।

২০১৭ সালে বাংলাদেশের জিডিপিতে পর্যটনশিল্পের মোট অবদান ছিল ৮৫০.৭ বিলিয়ন টাকা বর্তমানে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে । আর এই খাতে কর্মসংস্থান ছিল ২৪,৩২,০০০। জনপ্রিয় পর্যটন স্থান কক্সবাজার, এটি দেশের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। বিলাসবহুল হোটেল রিসোর্টের বিনোদনের নানা আয়োজন সম্ভব হয়েছে সৈকত পারের নিরিবিলি সময় কাটাতে, দেশি-বিদেশি পর্যটকের ছুটে আসেন কক্সবাজারের পাটওয়াটেক সৈকতে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত, যা সাগরকন্যা নামে পরিচিত। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত অবলোকনের অপূর্ব স্থান। এটি নৈসর্গিক সমুদ্র সৈকত। দুটি পাতা একটি কুড়ি, সবুজ চা বাগান নয়নাভিরাম দৃশ্য সিলেটের মালনিছড়া চা বাগান। এখানে রয়েছে আদিবাসীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি, আচার অনুষ্ঠান খাদ্যাভ্যাসের রয়েছে ভিন্নতা।

সিলেটের জাফলং, মাধবকুণ্ড, হাম হাম জলপ্রপাত, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। রাতারগুল, কোমড় পানিতে ডুবে আছে একটি পুরো সবুজ বন। সিলেটের সাদা পাথর দাঁড়িয়ে দূরে নীল পাহাড়। বঙ্গোপসাগরের উপকূলের কোল ঘেঁষে রয়েছে প্রশস্ত বন – সুন্দরবন। তিন নদীর অববাহিকায় যা অবস্থিত। যা এখন বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। এটি খুলনা, বাগেরহাট ও বরগুনা জেলায় অবস্থিত। বনের সবুজ অরণ্যে আপন খেয়ালে হরিণের দল ঘুরে বেড়ায়। বনের ভিতরে রাজ্যের নীরবতা।

পাহাড় নদী ঝরনার মিলনে অপূর্ব সুন্দর বান্দরবান জেলা। দিগন্ত জুড়ে সবুজ পাহাড় আর মেঘের লুকোচুরি যে কাউকে এর রূপে বিমোহিত করে। নীলাচল, নীলগিরি, স্বর্ণ মন্দির, চিম্বুক পাহাড় এসবই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা। রাঙ্গামাটির ঝুলন্ত ব্রিজ পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ। খাগড়াছড়ির অপূর্ব পাহাড়, নীল আকাশ মনোরম প্রকৃতি। কাপ্তাই লেক, সুবলং ঝরনা অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থান। দেশের একমাত্র প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্টিন দ্বীপ। নদীর মোহনা, নীল জলরাশি, আর সারি সারি বিশাল জাহাজ। এখন সেন্ট মার্টিনে যাতায়াতের সুবিশাল জাহাজ আছে। যাতে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

উত্তরাঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা অপরিসীম

কিশোরগঞ্জের হাওর, নিকলী বেড়িবাঁধ হাওর বেশ চিত্তাকর্ষক। ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে সোনারগাঁ, লালবাগ কেল্লা, ময়নামতি, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর এগুলো পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ করে থাকে। সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত টেকেরহাট। বিশাল জলরাশি, সুনীল আকাশ, আকাশে সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়। দূরে মেঘালয়ের পাহাড়। প্রাচীন মসজিদ ও অসংখ্য মন্দির দেশের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। এসব স্থাপনার স্থাপত্য শৈলীর অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায়। যা পর্যটন শিল্পের ব্যাপ্তি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। বিশেষ করে কান্তজিউ–এর মন্দিরের টেরাকোটার কাজ প্রশংসনীয় । বাগেরহাটের খান জাহান আলীর ষাট গম্বুজ মসজিদ, নওগাঁর কুসুম্বা মসজিদ, টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ – এখনো ইতিহাস ঐতিহ্যে ভাস্বর।

পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্র এখন বেশ সম্প্রসারিত হয়েছে। সমৃদ্ধ উপকূলীয় চর, ভোলার চর কুকরিমুকরি, মেঘনা নদী এখানে সাগরের সঙ্গে মিশেছে। এই দ্বীপ দেশের অন্যতম সুন্দর পর্যটন স্থান। কৃষি পর্যটনের জন্য নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে সিলেট, ভোলাগঞ্জ পতিত টিলা। এখানে আনারস আবাদ করে সুফল পাচ্ছেন বাগান মালিকেরা। আনারস ছাড়াও মালটা, কফি, কাজু বাদামের আবাদ হচ্ছে। পাশাপাশি গড়ে উঠেছে কৃষি পর্যটন। ফুলের রাজ্য হিসেবে খ্যাত যশোর জেলা। গদ খালীতে দেশ বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের আবাদ ব্যাপকভাবে হচ্ছে।

এখানে বাংলাদেশের বড় ধরনের ফুলের বাজার। এটি হতে পারে বাংলাদেশের অন্যতম বড় পর্যটন স্থান।

পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্র এখন বিস্তৃত হয়ে কৃষি ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এতে গ্রামীণ তরুণ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। অনেক বিরল প্রজাতির ফুলও বিদেশে রপ্তানির একটি সুযোগ রয়েছে। সিলেট, চট্টগ্রাম, পঞ্চগড় এলাকায় চা বাগান, হাওর, বিল শেরপুরের গজনী, নেত্রকোনার বিরিশিরি পর্যটনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এসব পর্যটন স্থান আরও আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার সম্ভাবনা প্রচুর। পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারে বাংলাদেশ। এশিয়ায় এটি একটি মডেল হতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরও বাড়াতে পারে। গতিশীল করতে পারে, ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরিতে এই শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হবে এটি প্রত্যাশিত। কৃষি ও শিল্পখাতের পাশাপাশি পর্যটন খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হোক–এই আমাদের প্রত্যাশা। তবেই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা সম্ভব বলে আশা করা যায়।

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্প বাংলাদেশের জন্য হয়ে উঠতে পারে অন্যতম হাতিয়ার। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে পর্যটন খাতের ভূমিকা অপরিসীম। পর্যটন স্থানসমূহের যোগাযোগ আরও অত্যাধুনিকভাবে গড়ে তুলতে হবে। হোটেল ও মোটেলের সুযোগ-সুবিধা আরও আরামদায়ক করতে হবে। এইসব স্থানে বিনোদনের ক্ষেত্র বাড়াতে হবে, এতে করে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পর্যটক, পর্যটন সেবায় সন্তোষ প্রকাশ করবে। ভাবমূর্তি বিশ্বের নাগরিকদের কাছে সমুজ্জ্বল হবে বলে আশা করা যায়। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে যৌথ বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। হোটেল মোটেল রেস্তোরাঁর পাশাপাশি আরও রিসোর্ট নির্মাণের পরিকল্পনা নিতে হবে। এসব হোটেল ও মোটেল ও রিসোর্ট অনেক তরুণ যুবকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বাড়াতে হবে। শিক্ষিত ও যুব মহিলাদের পর্যটন স্থানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তাদেরকে আরও স্মার্টভাবে গড়ে তুলতে হবে। সর্বক্ষেত্রে স্মার্ট বাংলাদেশের আইডিয়া বাস্তবায়ন করতে হবে।

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে পর্যটন খাতকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে হবে। দেশের উন্নয়নের প্রতিটি সেক্টরে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটাতে হবে। পর্যটন খাত আরও লাভজনকভাবে গড়ে তুলতে হবে। দেশি ও বিদেশি পর্যটকদেরকে বাংলাদেশ স্থানসমূহ ভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

পর্যটন সেবা বাড়িয়ে নতুন নতুন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমৃদ্ধ স্পট যেগুলো অজানা রয়েছে তার উন্মোচন ঘটাতে হবে। পর্যটনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান সুরক্ষা করে পর্যটন খরচ কমিয়ে আনতে হবে। তখনই পর্যটকদের সংখ্যা বাড়িয়ে এ খাতের আয় জাতীয়ভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সহায়ক হবে। তবেই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে পর্যটন খাত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। এবারের বিশ্ব পর্যটন দিবসে এই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নে বিনিয়োগ সম্ভাবনা

বীরমুক্তিযোদ্ধা আলী আহম্মদ দেওয়ান

সিঙ্গাপুরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নেই বললেই চলে তবুও দেশেটির সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় পর্যটন খাত থেকেই। থাইল্যান্ডেরও একই অবস্থা। এই দুইটি দেশ টিকে আছে পর্যটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে। পয়সা খরচ করলে বাংলাদেশকেও পর্যটক আকর্ষণীয় করা যায়। বাংলাদেশ মূলত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ নয়, যা আছে তা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা- রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান এলাকায়। তিন জেলায়ই ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আমি গিয়েছি। যখনই বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বিকাশের কথা ভাবি তখনই মনে হয় সরকার চাইলে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলাকে কেন্দ্র করে আলাদা আলাদাভাবে ইকো-ট্যুরিজম পার্ক গড়ে তুলতে পারে। বাংলাদেশের মাননীয় সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ইচ্ছা করলে পাকিস্তানের মারী বা ভারতের কাশ্মীরের ন্যায় পার্বত্য তিন জেলায় ইকো-ট্যুরিজম পার্ক গড়ে তুলতে পারেন। তার ইচ্ছা শক্তি প্রবল এবং সাহসও দুর্বার। ইকো-ট্যুরিজম'র অপার সম্ভাবনার বিষয়টি তাকে ভালোভাবে বুঝাতে পারলে বাংলাদেশে নিশ্চয়ই পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে এবং পর্যটক আকর্ষণীয় দেশে পরিণত হবে। পাকিস্তানের মারীর ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার ভালো ভালো ট্যুরিস্ট স্পটগুলি চিহ্নিত করে আলাদাভাবে ক্যাবল কার বা চেয়ার লিফ্ট'র মাধ্যমে সংযুক্ত করে যদি কয়েকটি নেটওয়ার্কের মধ্যে আনা হয় তখন পর্যটকদের সংখ্যা দ্বিগুণ-তিনগুণ বেড়ে যেতে বাধ্য।

আমরা যদি বান্দরবানের কথাই প্রথমে ভাবি তখন ক্যাবল কারের নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকতে পারে নীলাচল, চিম্বুক পাহাড়, নীলগিরি, কিউকার্ডং, বগা লেক, সাঙ্গু নদী, নাফাখুম, আয়মাখুম, শৈলপ্রপাত, রুমা, থানচি এবং আরও অনেক ভালো ভালো স্পট। প্রত্যেকটি স্পটে স্টপেজ বা স্টেশন থাকতে হবে যাতে পর্যটকরা নেমে ঘুরাঘুরি করে পুনরায় ক্যাবল কারে ফিরতে পারে। ক্যাবল কারের ডাবল ওয়ে একটি টিকেট থাকবে প্যাকেজ ট্যুরের মতো। সবগুলি পয়েন্টের জন্য আপ এন্ড ডাউন টিকেট মূল্য একই থাকবে। কেউ সবগুলি পয়েন্টে নামবে, আবার কেউ ২-৪ টি পয়েন্ট ঘুরে ফিরে আসবে। ডাবল ওয়ে ও নির্ধারিত মূলের টিকেটের সুবিধা এই যে, মাঝ পথে কোনো চেকিং থাকবে না, কে কয়টি পয়েন্টে নামল-উঠল তা পর্যটকদের ব্যক্তিগত বিষয়।

রাঙ্গামাটিতেও ক্যাবল কার সিস্টেম করা যেতে পারে। ক্যাবল কারটি হতে পারে রাঙ্গামাটি সদর থেকে সুভলং পর্যন্ত, মাঝে যে সব পাহাড় বা হিল পড়বে সেগুলিতে নামার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কাপ্তাইয়ের পাহাড়ী বনভূমিকেও ক্যাবল কারের নেটওয়ার্কে আনা সম্ভব। কাপ্তাইয়ের জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পটি বর্তমানে বন্ধ। কাপ্তাই জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে নতুন একটি ট্যুরিস্ট স্পট গড়ে তোলা যেতে পারে। কাপ্তাই লেকে ছোট-বড় হস্তচালিত নৌকা ভ্রমণের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সঙ্গে সাতার কাটার 'জোন' গড়ে তুললে ভালো সাড়া পাওয়া যাবে। বাচ্চাদের জন্য আলাদা কিছু রাইডিং থাকলে ভালো। প্রত্যেকটি রাইডিংয়ের জন্য আলাদা আলাদা প্রবেশ মূল্য নির্ধারিত থাকবে। শুকনা মৌসুমে লেকের পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

খাগড়াছড়ির 'সাজেক' বর্তমানে ভালো ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে গড়ে উঠছে। বর্তমানে সাজেকের আশ-পাশে অনেক রিসোর্ট গড়ে উঠছে। এর ফলে সাজেক ধীরে ধীরে পর্যটক আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সাজেক ছোট জায়গা, আশে-পাশের পাহাড় ও বনভূমি ক্যাবল কারের নেটওয়ার্কের মধ্যে এনে সাজেককে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব। এর ফলে সেখানে দর্শক সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে। আমি প্রাথমিক আবস্থায় একবার এবং বর্তমানে সাজেকে গিয়েছি, পূর্বের অবস্থান এবং বর্তমান অবস্থার মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। এই ব্যবধান তৈরি করেছে ভালো

মানের হোটেল ও রিসোর্টগুলি, তবে রিসোর্টগুলি সেবার মানের তুলনায় ভাড়া আকাশ ছোঁয়া। এ ব্যাপারে পর্যটন কর্তৃপক্ষকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

এতবড় মেগা প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারের একার পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে যে সব দেশ পর্যটন শিল্পে এগিয়ে রয়েছে সে সব দেশের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে কিংবা তাদেরকে অংশীদার করে ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নও করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গ ওঠলে প্রথমে নাম আসবে থাইল্যান্ড ও সিংগাপুরের। থাইল্যান্ড সরকারের সঙ্গে পার্টনারশিপে পার্বত্য তিন জেলায় ইকো-ট্যুরিজম পার্ক গড়ে তোলা সম্ভব।

মৌলভীবাজার জেলার, বড়লেখা থানায় অবস্থিত মাধবকুন্ড ঝরনাকে কেন্দ্র করে ইকো-ট্যুরিজম পার্ক গড়ে তোলা সম্ভব। এ ঝরনা দেখতে প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক গিয়ে থাকে। যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল হলে পর্যটকের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে নিঃসন্দেহে। আমি বেশ কয়েক বছর আগে একবার গিয়েছিলাম, তখন যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই খারাপ ছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক এবং দুলাহাজারা সাফারী পার্ক দুইটি ক্যাবল কারের নেটওয়ার্কের মধ্যে আনা গেলে সাফারী পার্কে দর্শক সংখ্যা বেড়ে যাবে। সাফারী পার্কের বনভূমির উপর দিয়ে ক্যাবল কার চললে দর্শকরা ক্যাবল কারে চড়ে পার্কের জীবজন্তু সহজেই দেখতে পারবে। তাছাড়া ক্যাবল কারে চড়ে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দও কিন্তু কম নয়।

ইকো-ট্যুরিজমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু পরামর্শ নিম্নে তুলে ধরা হলো। যেমন;

১) বান্দরবানসহ পার্বত্য জেলার রাস্তা-ঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন হবে। বিশেষ করে পর্যটন স্পটে যাতায়াতের রাস্তা গাড়ি চলাচলের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

২) পার্বত্য তিন জেলা সদরে পর্যটকদের থাকার জন্য মানসম্মত হোটেল নেই। পর্যটন কর্পোরেশনের মাধ্যমে নূন্যতম 4-star standard হোটেল বা রেস্ট হাউজ গড়ে তুলতে হবে।

৩) পর্যটন এলাকাগুলিতে বিদেশি পর্যটকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাদের চলা-ফেরায় যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে সে দিকটা খেয়াল রেখে পর্যাপ্ত ট্যুরিস্ট পুলিশ মোতায়েন রাখতে হবে।

৪) বিমানবন্দরে বিদেশি পর্যটকদের জন্য আলাদা immigration desk থাকতে হবে এবং তাদের dispatch system দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

৫) প্রতিটি প্রাইম পয়েন্টে উন্নতমানের ওয়াশরুম কাম টয়লেটের ব্যবস্থা থাকতে হবে। Foreign Tourist দের জন্য আলাদা washroom ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬) দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকার ০৫.০৮.২০২৩ একটি আকর্ষণীয় খবর প্রকাশিত হয়েছে, " হোটেলেই পকেট ফাঁকা পর্যটকদের"। এ খবরটি কোনো ফেব্রিকেটেড খবর নয়। প্রকৃত সত্য ঘটনা। বিদেশি পর্যটকরা বাংলাদেশে ঘুরতে আসলে সাধারণত তারা গুলশান-বনানীর হোটেলগুলিতে ওঠে। হোটেল ভাড়া ও খাবারের বিল মেটাতেই তাদের পকেট খালি হয়ে যায়, তখন আর ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ থাকে না। সিংগাপুর, থাইল্যান্ড, বালী ও ভারতের থ্রি-স্টার/ ফোর-স্টার হোটেলে থাকার অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। ঢাকার গুলশান-বনানীর হোটেলগুলির তুলনায় ঐ সব দেশের সমমানের হোটেল ভাড়া ও খাওয়া খরচ খুবই কম। পর্যটন কর্পোরেশনকে এ দিকটা ভালোভাবে যাচাই করে দেখতে হবে। বিদেশি পর্যকটকরা সব সময়ই সাশ্রয়ী মূল্যে ভালো মানের হোটেল পছন্দ করে থাকে।

৭) ঢাকা শহরের জন্য ছাদ খোলা ট্যুরিস্ট বাস এবং অন্যান্য জেলা শহরের ট্যুরিস্ট স্পটে যাতায়াতের জন্য সরকারি উদ্যোগে বিলাসবহুল এসি ট্যুরিস্ট বাস চালু করলে ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে নতুন একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হবে।

৮) বাংলাদেশের উন্নয়ন খাতগুলির মধ্যে এখন কেবল 'ট্যুরিজম খাতই' বাকি রয়েছে। এ খাতকে সম্মৃদ্ধ করলে দেশও সমৃদ্ধ হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হবে।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত ব্যংকার

সিলেটে পর্যটকদের আকর্ষণ

মীর লিয়াকত আলী

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ট্যুরিস্ট বাংলাদেশে এলেই সবাই সিলেট ঘুরে যাবার আশা বাদ দিতে অক্ষম। সবার তালিকায়ই সিলেট উঠে আসে সর্বাগ্রে। কিন্তু দুঃখের বিষয় নানা অবহেলা ও সুদৃষ্টির অভাবে অপরূপ এই সিলেটের সৌন্দর্যের হানি হতে চলেছে। অতি দ্রুত এদিকে সুদৃষ্টি না দেয়া হলে সিলেটকে এক সময় আর হয়তো এই রূপে চেনা দুস্কর হয়ে দাঁড়াবে। হযরত শাহজালাল (র)ও অগণিত অলি–আউলিয়ার স্মৃতিধন্য সিলেটকে বলা হয় বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী। অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে অগ্রসর অঞ্চল সিলেট। জৈন্তিয়া পাহাড়ের অপরূপ দৃশ্য, জাফলং–এর মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য, ভোলাগঞ্জের সারি সারি পাথরের স্তুপ, বিছনাকান্দির স্বচ্ছ জলরাশি পর্যটকদের টেনে আনে বার বার।

সিলেটাঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করে দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। সিলেটের পাথর ও বালুর গুণগতমান দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখানকার প্রাকৃতিক গ্যাস সারা দেশের সিংহভাগ চাহিদা পূরণ করে থাকে। স্বাধীনতা যুদ্ধে এ জেলার ভূমিকা অপরিসীম। জেনারেল এমএজি ওসমানী এ জেলারই কৃতী সন্তান। হযরত শাহজালাল (র:) ও হযরত শাহ পরান এর পবিত্র মাজার শরীফ এ জেলায় অবস্থিত। প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মানুষ মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগমন করে। আসে বিপুল সংখ্যক পর্যটক। সিলেটের স্থানীয় ভাষা 'সিলটি ভাষা'র একটি বিশেষত্ব রয়েছে যা অন্য অঞ্চল থেকে আলাদা। এ ছাড়া নাগরী বর্ণমালা নামে সিলেটের নিজস্ব বর্ণমালাও রয়েছে, যা একটি অসাধারণ বিষয়। শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিকভাবে সিলেট দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম ধনী জেলা।

সিলেটকে বলা হয় প্রকৃতির রূপসী কন্যা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'মমতাময়ী'! রঙে রূপে গন্ধে রসে এ আদুরে কন্যার যেন কোনো জুড়ি নেই। কি মাটির নীচে কি মাটির উপরে সিলেট অঞ্চলকে প্রকৃতি অকাতরে দিয়েছে। তাই প্রকৃতিপ্রেমীরা এখনও সিলেট অঞ্চলকে বেড়ানোর জন্য পছন্দের তালিকায় রাখেন প্রথমে। কেন না সবুজে আচ্ছাদিত এই এলাকাটি টিলা-পাহাড়, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, ক্ষেত-খামার, ফল-ফসল, বাগান-উদ্যান আর ফলজ-ভেষজ উদ্ভিদ বেষ্টিত হয়ে আছে। তার সঙ্গে রয়েছে উঁচু ও সমতল ভূমির মানুষের জীবনাচারের বৈচিত্রতা যা যুগ যুগ ধরে আলাদা এক স্বকীয়তার বৈশিষ্টে বৈশিষ্টমণ্ডিত। তাই এখানকার মাটি টেনে নিয়ে এসেছে দূর দেশের বিখ্যাত পীর-আউলিয়া-দরবেশ এমন কি ব্যবসায়ীদেরও।

সিলেটের মাটি, মানুষ আর নির্ভেজাল প্রকৃতি মিলে-মিশে একাকার হয়ে আছে। যেজন্য এখানকার সবকিছুরই কদর ব্যতিক্রমী এবং মর্যাদায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য বিশ্ব এখন বেহুঁশ। এজন্য প্রকৃতি প্রদত্ত না থাকলে মানব সৃষ্ট পর্যটক আকর্ষণ সৃষ্টি করে হলেও পর্যটক টানার জন্য চেষ্টার কোনো শেষ নেই। অথচ সিলেটের রয়েছে প্রকৃতি প্রদত্ত ও পর্যাপ্ত পর্যটক আকর্ষণ যা স্বাভাবিক নিয়মেই পর্যটক নিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো এসব পর্যটক আকর্ষণ যুগ যুগ ধরে কেবল অবহেলা-অযত্নে পড়ে আছে তা নয় অনেকটা অভিবাবকহীনও বটে। কেন না সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের অভাবে মনে হয় পর্যটকদের যেন দায় ঠেকেছে এসব আকর্ষণ পরিদর্শনের। তা নাহলে অন্তত মোটা দাগের পর্যটক গন্তব্য যেমন জাফলং, তামাবিল, রাতারগুল, বিছনাকান্দি, পানতুমাই, লালাখাল, ভোলাগঞ্জ, টেকেরহাট, টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইলহাওর, শ্রীমঙ্গলের চাবাগনের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য, সুনামগঞ্জের হাওরাঞ্চল, হবিগঞ্জের রিসোর্টও প্রাকৃতিক নৈসর্গ, বড়লেখার মাধবকুণ্ড, কুলাউড়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কমলগঞ্জের হাম-হাম, গলফ ও

লেক, (শমশেরনগর) মাধবপুর লেক, লাউয়াছড়া, রেমাকেলাঙ্গা, সাতছড়ি ইত্যাদি যেগুলো প্রকৃতিপ্রেমীদের ভীষণভাবে কাছে টানে সেগুলো যত্নহীন হয়ে পড়ে থাকতো না।

অথচ এসব পর্যটক গন্তব্য দেশে-বিদেশে সব ধরনের পর্যটকের কাছে কদর পাচ্ছে এবং তাদের আগ্রহও বাড়ছে। কেন না বর্তমান বিশ্বে প্রকৃতি ও সংস্কৃতিপ্রেমীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ইকো-ট্যুরিজম বা পরিবেশ পর্যটন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে রয়েছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সিলেট অঞ্চল হচ্ছে দেশের মধ্যে পরিবেশ পর্যটনের এক স্বর্ণখনি যা দিন দিন আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং আরও হবে। তার সঙ্গে রয়েছে গ্রামীণ পর্যটন, সবুজ পর্যটন, কৃষি পর্যটন, চা পর্যটন, রোমাঞ্চ পর্যটন এবং জনগোষ্ঠী পর্যটনের ব্যাপক সম্ভাবনা।

তবে এগুলোকে ছাপিয়ে অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান ধর্মীয় পর্যটন কিংবা সংস্কৃতি পর্যটনের যে সম্ভাবনা তাও খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারছে না শুধু প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবে। কেন না সিলেটের মাটি স্বনামধন্য সাধক, পীর, আউলিয়া, দরবেশ ও ওলিকুল শিরোমণিদের পুণ্যস্মৃতি বহন করে চলেছে গর্বের সঙ্গে। তেমনি লালন করছে পাঁচটি ভাষার মিলন স্থল হিসেবে শক্তিশালী ভাষা এবং বিভিন্ন জাতি-উপজাতির জীবনাচার সংমিশ্রণে গড়ে উঠা সংস্কৃতির অপূর্ব এক স্বকীয়তা। অথচ সিলেটকে শুধু আধ্যাত্মিক শহর কিংবা শ্রীমঙ্গলকে চায়ের রাজধানী ঘোষণা দিয়েই আমরা খালাস। সাড়া জাগানো ধর্মীয় পর্যটন, ইসলামি পর্যটন কিংবা হালাল পর্যটনকে কাজে লাগাতে পারছি কই?।

পর্যটনকেন্দ্রের অন্যতম হচ্ছে আবাসন, যানবাহন, খাবার ও পানীয় এবং বিনোদন। অর্থাৎ এসব সুযোগ-সুবিধা না থাকলে একটি পর্যটক আকর্ষণ তথা গন্তব্য পর্যটকদের জন্য পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। এছাড়া অবকাঠামো নির্মাণ, সুসজ্জিতকরণ, হোটেল, রেস্তোরাঁ, বিশ্রামাগার, বনভোজনের জন্য এলাকা নির্ধারণ, প্রচারণা, থিয়েটার, বিনোদন পার্ক এবং পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। পর্যটনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের জন্যে নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

তাই পর্যটক সেবা নিশ্চিত করা গেলে একদিকে পর্যটক আগমন এবং অন্যদিকে আয়-উপার্জন বৃদ্ধি পেয়ে পর্যটন উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। কমলগঞ্জের হামহাম পড়ে আছে । কিন্তু সেখানে যাতায়াতের পথ কোথায় ? যেতে হয় লাঠি ভর দিয়ে! সড়কের চিহ্নও নেই। মৌলভীবাজারের ইকো পার্কের এ দুর্দশা কেন? মনে হয় একটি ছাড়াবাড়ির ছাড়া অঞ্চল। হাকালুকি হাইল হাওরে অবাধে বিদেশি পাখি শিকার কি বন্ধ হয়েছে? এটা চলছেই। তাই থাকছে না পরিযায়ী পাখিদের দল।

সিলেটের বিদ্যমান যে পর্যটক সেবা তা একদিকে অপ্রতুল ও অপর্যাপ্ত এবং অন্যদিকে গুণগতভাবে মানহীন ও নিয়ন্ত্রণহীন। তবে পর্যটক সেবা এবং এই সেবার মান বৃদ্ধির আগে পর্যটককে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া অপরিহার্য। এজন্য সাধারণ অবকাঠামো যেমন রাস্তা-ঘাট, বিদ্যুৎ-গ্যাস, পানি-পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হয় সরকারি খাতকে। আবার পর্যটন অবকাঠামো যেমন হোটেল-মোটেল, গেস্টহাউজ-রিসোর্ট, রেস্তোরাঁ-ফাস্টফুড, পার্ক-থিমপার্ক ইত্যাদি নিশ্চিত করা সাধারণত বেসরকারি খাতের কাজ। তবে, যেসব জায়গায় পর্যটন অবকাঠামো অপ্রতুল সেখানে সরকারি খাতকে তা পূরণে এগিয়ে আসতে হয়। অবশ্য বিষয়টি যে উভয় খাতের বোদ্ধাদের জানা নেই তাও নয়।

সিলেট অঞ্চলের এসব পর্যটক আকর্ষণ কেন অবহেলিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত? কেন একজন পর্যটক তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে পারছে না? কেন পর্যটক আকর্ষণগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নেই? কেন পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন পর্যটক সেবা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না? কেন প্রয়োজনীয় প্রচার-প্রচারণার অভাব? এসব প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় পর্যটন উন্নয়নে, একাগ্রতা, জবাবদিহিতা এবং নিশ্চয়তা দরকার তার অনুপস্থিতি সুস্পষ্ট। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে, পরিকল্পনাহীনতার মতো উন্নয়ন বিনাশী উপসর্গগুলো। তবে, সরকারি খাত তার দায়িত্ব পালন না করে থাকলে তাকে দিয়ে তা করানোর দায়িত্ব স্থানীয় জনগোষ্ঠী হিসেবে প্রথমে সিলেটবাসীর এবং পরে অন্যদের। আবার

বেসরকারি খাতের দায়িত্ব পালনেও অন্যদের আগে এই সিলেটবাসীকেই উদ্যোগ নিতে হবে। পর্যটন এমন একটি শিল্প যার উন্নয়নের অংশীদার শুধু সরকারি-বেসরকারি খাতই নয় ব্যাপকভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীও। স্থানীয় জনসাধারনের সম্পৃক্ততা ও সচেতনতা ছাড়া যতো উদ্যোগই নেওয়া হোক না কেন কোনো ফলোদয় সম্ভব নয়। অথচ এই সিলেট হতে পারে এই দেশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল। সিলেটের এই সৌন্দর্যহানি অবশ্যই দূর করতে হবে কোনো বিলম্ব ছাড়াই। মনে রাখতে হবে এই দূর করার দায়িত্ব সরকারের কাঁধে চাপিয়ে বসে আঙ্গুল চুষলে হবে না, জনসাধারণকে সজাগ ও সচেষ্ট হতে হবে এ কথা বলাই বাহুল্য।

লেখক : সব্যসাচী লেখক

কৃষিভিত্তিক পর্যটন প্রান্তিক পর্যায়ে বৃহৎ অর্থনীতির সহায়ক

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ মজুমদার

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পারিবারিক স্বনির্ভরতার হাতিয়ার কৃষি ধীরে-ধীরে একটি অনন্য শিল্পে রূপ নিয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি এখন দেশের চাহিদা পূরণ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে এসে নোঙর ফেলতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প একটি উদীয়মান সম্ভাবনাময়ী শিল্প। পর্যটন শিল্পকে পর্যটন নগরী থেকে বের করে যদি বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক এলাকাগুলোতে সম্প্রসারণ করা যায় তাহলে কৃষিশিল্প পর্যটন শিল্পের হাত ধরে এগিয়ে যেতে সহায়তা পাবে। পর্যটনের উন্নয়নে কৃষিকে সম্পৃক্ত করা এখন শুধু সময় উপযোগী উদ্যোগের দাবি রাখে। কারণ একদিকে যেমন পর্যটকদের জন্য ভ্রমণ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ জড়িত তেমনি দেশের কৃষিজ পণ্য ও বাজার সম্প্রসারণে পর্যটন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এর মাধ্যমে শুধুমাত্র পর্যটন কেন্দ্র বা কৃষি ক্ষেত্র সম্প্রসারণ নয়, এটি কৃষিতে জনসাধারণের বিনিয়োগ ও আগ্রহ বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবেও রূপ নিতে পারে। কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দেশের কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রেও কৃষিভিত্তিক পর্যটন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক পর্যটন একটি নতুন ধারণা মনে হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহুল ব্যবহার শুরু হয়েছে আরও আগে। বিভিন্ন দেশে পর্যটনের সম্প্রসারণে পাশাপাশি কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের পদক্ষেপ চোখে পড়ে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইউক্রেন, ব্রাজিল, চীন, রাশিয়া নিউজিল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, পর্তুগাল, নেপাল, জ্যামাইকা, উগান্ডা, আয়ারল্যান্ড, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলো উল্লেখযোগ্য। যেমন প্রাচীন মিশরে নীলনদের অববাহিকায় গড়ে ওঠা কৃষি সভ্যতা এখন বৈশ্বিক পর্যটনের এক অনন্যনিদর্শন। বাংলাদেশেও যশোর, বান্দরবানের লামা, পঞ্চগড়সহ বিভিন্ন এলাকায় বেশকিছু কৃষি ও পরিবেশ রক্ষা বিষয়ক পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। কৃষি ও পর্যটন শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো একটি শিল্পের ব্যবসায়িক মন্দাভাব থাকলে অন্য শিল্পটি সহায়তা করতে পারে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন নগরীতে বসবাসকারী মানুষরা ভ্রমণ ও গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার আনন্দ একসঙ্গে উপভোগ করার সুবিধা শুধুমাত্র কৃষিভিত্তিক পর্যটনেই রয়েছে। পর্যটকরা অন্তত ভ্রমণকালীন সময় তাজা এবং জৈব প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত খাদ্যগ্রহণের সুযোগ নিতে পারেন।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের যেকোনো মৌসুমেই সবুজ আর সজীবতা অসীম। প্রকৃতির সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংমিশ্রণ ও নিবিড়ভাবে মানবমনের সখ্যতা গড়ে তুলতে কৃষি পর্যটন হতে পারে অন্যতম মাধ্যম। কৃষিভিত্তিক পর্যটন হলো অবকাশযাপনের এমন এক মাধ্যম, যেখানে খামারগুলোতে আতিথেয়তার পাশাপাশি পণ্য প্রদর্শনীরও আয়োজন করা করা যেতে পারে। অবকাশকালীন কর্মকাণ্ডের মধ্য থেকে কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান আহরণ, ফল ও সবজি চাষ, ফল ও সবজি ক্রয়, মধু আহরণ এবং স্থানীয় আঞ্চলিক বিভিন্ন পণ্য অথবা হস্তশিল্প সামগ্রীর তৈরি শৈলী দেখা ও কেনার সুযোগ তৈরি হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও ফিলিপাইন বৈশ্বিক কৃষি পর্যটনে সবচেয়ে এগিয়ে আছে। ফ্রান্সের প্যারিস থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত লাকুলুয়ে দো সারজি এলাকায় গড়ে তোলা উঠেছে এক খামার। সেখানে বিভিন্ন রকমের শাকসবজি, ফলমূল, ফুল ও ফসল উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত সব ফসল শহরে বিক্রি করে স্থানীয় অভিবাসী ও শহর থেকে অনেক পর্যটক এখানে আসেন। খামারটি মূলত কৃষিভিত্তিক পর্যটনের ধারণা মাথায় রেখে গড়ে তোলা হয়। এখানে পর্যটকরা ভ্রমণ করেন ইচ্ছামতো, নিজের পছন্দের ফলটি খেতে পারেন, আবার প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রয় করতে পারেন। কৃষি যে কতটা মুগ্ধকর হতে পারে সে খামারে গিয়ে উপলব্ধি করা যায়। সেখানে আরও রয়েছে

রেস্তোরাঁ, বাজার, দোকানপাট ইত্যাদি। খামারটিতে রয়েছে শিক্ষার্থীদের সহজলভ্য ভ্রমণের সুযোগ এবং প্রকৃতির উন্মুক্ত খোলা দরজা, যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা কৃষি সম্পর্কে জানতে পারে এবং কৃষির জ্ঞানে নিজেদের সমৃদ্ধ করে পর্যটন ও কৃষির সমন্বয়ে এক অভিনব অর্থনৈতিক উন্নয়নের আবির্ভাব ঘটাতে পারে। যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এরূপ কৃষি পর্যটন আমাদের বাংলাদেশেও গড়ে তোলা সম্ভব। এমন কৃষি পর্যটন ক্ষেত্র পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয়ও বটে। কারণ প্রতিটি মানুষ প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকতেই পরিকল্পিত নগরায়ণের সঙ্গেও কৃষিকে সম্পৃক্ত করে নেয়। ছাদবাগান, পোষাপাখি ও কবুতর পালন এবং চৌবাচ্ছায় মাছ চাষ এর অনন্য উদাহরণ।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ এবং শ্রমশক্তির ৬০ শতাংশ কৃষিকে বুকে ধারণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। দেশের জিডিপির প্রায় ১৪ দশমিক ১০ শতাংশ আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে। প্রায় ২ কোটি কৃষক খাদ্য সরবরাহের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী গ্রামগুলোয় বসবাস করছে। কিন্তু আমাদের জিডিপিতে কৃষির অবস্থা বর্তমানে তেমন আশানুরূপ নয়। তাই বিদ্যমান কৃষিতে অতিরিক্ত উপার্জনমূলক কার্যক্রম যুক্ত করতে পারলে অবশ্যই জিডিপিতে কৃষির অবদান বাড়বে। এক্ষেত্রে কৃষি পর্যটন হতে পারে এমন জাতীয় কার্যক্রমের একটি বিশেষ ক্ষেত্র। আবার বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পে অপার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিশ্ব পর্যটন বাজারে বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব মাত্র এক দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ, যেটা হতাশাজনকও বটে। পর্যটন যেখানে ১০৯টি শিল্পকে সরাসরি প্রভাবিত করে, চালিত রাখে এবং প্রসারিত করে।

একজন পর্যটকের আগমনে সেবা খাতে প্রত্যক্ষভাবে ১১ জন ও পরোক্ষভাবে ৩৩ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সুযোগকে আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছি না, ফলে পিছিয়ে থাকছে আমাদের দেশের পর্যটন, পিছিয়ে থাকছে আমাদের দেশ। যে পর্যটনশিল্প আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের অন্যতম উৎস হতে পারত, কিন্তু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপায় হিসেবে পর্যটনশিল্পকে আমরা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছি বার বার। এর অন্যতম কারণ রাজনৈতিক সদিচ্ছা, পরিকল্পনা ও প্রতিজ্ঞা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের অভাব।

কৃষিভিত্তিক পর্যটনে ব্যক্তিপর্যায়েও আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি। এটা বেকারত্ব দূরীকরণের অন্যতম পন্থা হতে পারে। পর্যটনের সঙ্গে কৃষিকে সম্পৃক্ত করলে একদিকে যেমন পর্যটকেরা ভ্রমণ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবে, সেইসঙ্গে কৃষিজ পণ্য ও বাজার সম্প্রসারণে কৃষি পর্যটন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কৃষি পর্যটন হতে পারে বাংলাদেশের অন্যতম একটি চমৎকার আয়ের উৎস। কারণ আমাদের আছে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, আছে উর্বর ভূমি, রয়েছে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার সামর্থ্য। এরই মধ্যে আমাদের দেশে অপরিকল্পিতভাবে কিছু কৃষি পর্যটন গড়ে উঠেছে, যেমন রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম বাগান, দিনাজপুরের লিচু বাগান, স্বরূপকাঠির পেয়ারা বাগান, যশোরের ফুলের বাগান, নরসিংদীর লটকন বাগান, কিশোরগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের হাওরসহ এমন আরও অসংখ্য কৃষি পর্যটন। দেশীয় পর্যটকদের কাছে ভ্রমণের জন্য এই জায়গাগুলো এরই মধ্যে বেশ পরিচিতি লাভ করেছে। যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রগুলো আরও প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করা সম্ভব।

সকল শ্রেণি-পেশা ও সব বয়সি মানুষের মধ্যেই গ্রাম ও প্রকৃতির প্রতি আলাদা আকর্ষণ থাকে। তাছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে কৃষির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকনের স্পৃহা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইট-পাথরের শহর ছেড়ে, যান্ত্রিকতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সবাই এখন শিকড়মুখী হতে চায়। পুকুরে সাঁতার কাটতে, নিজ হাতে মাছ ধরতে এবং নিজ হাতে ফল-ফলাদি আহরণ করারও অন্যরকম আনন্দ রয়েছে। কৃষি পর্যটন এমন ক্ষেত্র, যেটি শান্ত, নিরিবিলি আর সবুজে আচ্ছাদিত একটি জায়গা, যেখানে মানুষ দূষণমুক্ত হাওয়ায় তৃপ্তিসহকারে প্রশান্তি অনুভব করতে পারে। মানুষের জৈব প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত ও বিষমুক্ত কৃষিপণ্যের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কৃষি পর্যটনের বদৌলতে আমরা এমন সুযোগ পেতে পারি। এতে একদিকে যেমন ভোক্তার কাছে কৃষক তার পণ্য বিক্রি করে ন্যায্যমূল্য পেতে পারে, অন্যদিকে ভোক্তাও বিষমুক্ত পণ্য ক্রয় করে জীবনমানের উন্নতি করতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে কৃষি উদ্যোক্তাদের হাতে বা কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের ফলে অনেকে বেসরকারি

পর্যায়ে বিনিয়োগ করছে। তারা অনেকে খামার করছে নিজেদের বিনোদনের জন্য। নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে এগুলো তারা গড়ে তুলছে। কিন্তু তারা যদি খামারগুলোয় নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি বাড়তি পর্যটকদের জন্য পরিকল্পনা করে, তাহলে এটি আমাদের দেশের জন্য অন্যতম একটি আয়ের উৎস হবে। এমন উদ্যোগ আমাদের যানজট ও দূষিত কোলাহল থেকে বের হওয়ারও একটি জায়গা হতে পারে। যেসব পরিবার মনে করে যে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাইরে বেড়াতে যাবে, সতেজ শাকসবজি ও ফল কিনবে, তাদের প্রজন্মকে কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত করবে, কৃষিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করবে–তাদের জন্য কৃষিভিত্তিক পর্যটন হবে অন্যতম ক্ষেত্র। এছাড়া আমাদের দেশের কৃষি উদ্যোক্তা ও সরকারি কৃষিসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোরও বিপুল বিস্তৃত আবাদযোগ্য জমি রয়েছে। তারাও এমন পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে পারে কৃষি পর্যটন খামার। বাণিজ্যিক দিক থেকেও এমন উদ্যোগ অবশ্যই লাভজনক হবে। কৃষি পর্যটন যে প্রতিপাদ্যটির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, তা আর বলার বাকি রাখে না। আমরা যদি এই সম্ভাবনাময় সুযোগকে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে কৃষি ও কৃষকের অবস্থার যেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে পারে, তেমনি পর্যটনশিল্পের গতিও ত্বরান্বিত হবে আরও বহুগুণে।

বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধশালী। আমাদের আবহমান কালের গ্রামবাংলা, সংস্কৃতি ও উৎসব অনেক রঙিন এবং অনেক আমোদ-প্রমোদে পরিপূর্ণ। এরই ধারাবাহিকতায় কৃষিভিত্তিক পর্যটন হতে পারে একটি অন্যতম মাধ্যম যা সভ্যতার শুধুমাত্র বিকাশই ঘটাবে না, বরং আরো শক্তিশালী করবে এবং এর ব্যাপক চর্চা হবে আমাদের উদ্যোক্তা মহলে, পর্যটন নির্ভর এলাকায় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে। আমাদের দেশের এই অভাবনীয় সম্পদকে সুপরিকল্পিত কর্ম-কৌশল ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে উপভোগ্য ও সহজতর করতে কৃষিভিত্তিক পর্যটন শিল্পের আরও বিকাশ, প্রসার প্রয়োজন। অমিত সম্ভাবনাময় এ ধরনের পর্যটন শিল্পের আকর্ষণ বিশ্বজনীন জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে। এতে অন্যান্য দেশের মতো বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পে পরিণত করে এই পর্যটন সেবা খাত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আরও বেশি অবদান রাখতে পারে। কৃষিভিত্তিক পর্যটনকে সাধারণ মানুষের বিনোদনের মূল উৎসে পরিণত করতে প্রকল্পে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার আয়োজন ও অভিনব ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন আয়োজন সংযোজন করায় বিনোদনের পাশাপাশি এই প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে নির্ভেজাল উপায়ে বাণিজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব। দেশের শহরাঞ্চলে বসবাসকৃত নাগরিককে বাংলার গ্রাম ও কৃষির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে অপরিসীম ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন পর্যটকগণ নিজেদের সবজিক্ষেত থেকে তুলে নিয়ে নিজেরা রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা রাখা, গাছের চারা রোপণ, ধান লাগানো বিভিন্ন অনুষ্ঠানও এক্ষেত্রে যোগ করা যায়।

কৃষিকে আরও বিস্তৃতি করার মাধ্যমে একটি কৃষি সাংস্কৃতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করা, উন্নত জাতের বীজ ও প্রযুক্তি সংগ্রহ ও এর যথাযথ প্রয়োগ, কৃষি বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে বিনিয়োগ লাভজনক ও হালাল করা, কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে বিনিয়োগ সহজ করা, উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানির লক্ষ্যে সহজ ও সুন্দর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনে জৈবিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যাপারে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সচেতনতা তৈরি করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কৃষিভিত্তিক পর্যটন ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

এমন উৎপাদনমুখী উদ্যোগের সঙ্গে পর্যটকদের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোও নিশ্চিত করতে হবে। তার মধ্যে রয়েছে- রাত্রিযাপনের জন্য নাগালের মধ্যে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ বাসস্থান, রেঁস্তোরা, স্পা, সুইমিং পুল, ইন্টারনেট সুবিধা, এটিএম বুথ, ট্রাইবাল শপ, লন্ড্রি ও ক্লিনিং, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা, উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ২৪ ঘণ্টা রিসিপশন, কনফারেন্স রুম, আইসক্রিম পার্লার ইত্যাদি। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় বিশেষ পর্যবেক্ষণের সুব্যবস্থা রাখা অত্যন্ত জরুরি। কৃষি ও পর্যটন উভয় শিল্পকে একসঙ্গে সমন্বয় করে পরস্পর সহযোগিতায় উভয় শিল্পের আরও বেশি প্রসার সম্ভব হবে। যার ফলে বিনোদন ও মানসিক প্রশান্তির পাশাপাশি উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে উচ্চতর থেকে একটি বৃহত্তম অর্থনীতির রাষ্ট্রে রূপান্তর হওয়ার পথ আরও সুগম হবে।

লেখক : বিশেষ প্রতিবেদক, প্রতিষিদ্ধ

এগ্রো ট্যুরিজম ও বাংলাদেশ

সামিয়া আফরোজ ইভা

"পাকা পাকা সোনা ধান
কৃষকের মুখে গান
মেঠো পথে যায় শোনা যায়
বাউলের সুরের তান
এ আমার জন্মভূমি
এ আমার জন্মভূমি বাংলাদেশ।"

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা আমাদের এ বাংলাদেশকে নিয়ে গর্বের কোনো শেষ নেই। এদেশের মাঠ-ঘাট, সাগর-নদী-পাহাড়-ঝরনা, হাওর-বাঁওড়, পাহাড়-টিলা আর ছায়া সুনিবিড় গ্রাম; একসঙ্গে সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ যা পত্রপত্রিকা বা বই পড়ে জানা সম্ভব নয়। তাই এই জানার আগ্রহে পর্যটক ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তর। বাংলাদেশে যে কয়েক ধরনের পর্যটন রয়েছে তার মধ্যে এগ্রি ট্যুরিজম বা এগ্রো ট্যুরিজম উল্লেখযোগ্য। আমাদের গ্রামীণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচয় হচ্ছে এই এগ্রো ট্যুরিজম। বিশ্বে এগ্রো ট্যুরিজম বা কৃষি পর্যটনে এগিয়ে আছে যুক্তরাষ্ট্র ও ফিলিপাইন। তাছাড়া ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, পর্তুগাল, নেপাল, আয়ারল্যান্ড, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এমনকি আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতও এরই মধ্যে এগ্রো ট্যুরিজমে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও এর অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

এগ্রো ট্যুরিজম বলতে আমরা কী বুঝি

এগ্রো ট্যুরিজম হলো অবকাশ যাপনের এমন এক ধরন, যেখানে খামারগুলোয় আতিথেয়তার আয়োজন করা হয়। অবকাশকালীন কর্মকাণ্ডের মধ্যে থেকে কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান আহরণ হয়। এছাড়াও ফল ও সবজি চাষ, ফল ও সবজি ক্রয়, ঘোড়ায় চড়া, নৌকায় চড়া, মধু আহরণ এবং স্থানীয় আঞ্চলিক বিভিন্ন পণ্য অথবা হস্তশিল্প সামগ্রী দেখা ও কেনার সুযোগ তৈরি হয়। কৃষকরা তাদের কৃষি জমিগুলোকে একটি গন্তব্যে পরিণত করে এবং তাদের পদ্ধতিগুলো লোকজনদের সঙ্গে শেয়ার করে।এক কথায় কৃষির আদ্যোপান্ত জানার সুযোগ তৈরি হয় এই এগ্রো ট্যুরিজমের মাধ্যমে।

কৃষি পর্যটন, পর্যটন শিল্পের সর্বশেষতম ধারণা যা সাধারণত খামারে ঘটে। ভ্রমণকারীরা নতুন গন্তব্য আবিষ্কার করেন তখন মন্থর করতে চান। তারা তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানীয়দের সঙ্গে দেখা করতে এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চান এই বিষয়টি মাথায় রেখেই এগ্রো ট্যুরিজমের বিকাশ হয়। এগ্রো ট্যুরিজমের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ট্যুরিজম জড়িত যেমন:

১. **খাদ্য পর্যটন:** ফুড সাফারি সারা বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় পর্যটন আকর্ষণ। পর্যটকরা কোনো স্থানে ভ্রমণে গেলে সেই এলাকার ঐতিহ্যবাহী খাবার চেখে দেখতে চায়। খাবার ও রন্ধনশৈলী এক একটি এলাকার ঐতিহ্য।

২. **আয়ুর্বেদিক পর্যটন:** ভারত ও শ্রীলংকাসহ আমাদের প্রতিবেশী অনেক দেশেই আয়ুর্বেদিক পর্যটন জনপ্রিয়। উদ্ভিদ, প্রাণী ও খনিজ উপাদান থেকে হিতকর এই চিকিৎসা পদ্ধতি পর্যটন গ্রামে সূচনা করতে পারলে পর্যটকদের তা সহজেই আকৃষ্ট করবে এবং চিকিৎসা গ্রহণের জন্য পর্যটন গ্রামে যাবেন।

৩. **জলাভূমি পর্যটন:** নদীমাতৃক আমাদের দেশ বাংলাদেশ। কৃষি ও নদী একে অপরের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। তাই জলক্রীড়া, নৌ–ভ্রমণ, নৌযানে রাত্রি যাপন ইত্যাদি এগ্রো ট্যুরিজমে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

৪. **সংস্কৃতি পর্যটন:** কৃষিভিত্তিক গ্রামীণসমাজে অনেক ধরনের সংস্কৃতি-রীতিনীতি রয়েছে। যেমন-পৌষে নবান্ন উৎসব, পিঠা উৎসব, পালা গান, ঘাটু গান, লালন গান, ভাটিয়ালি গান, পুতুল নাচ, বৃষ্টি না হলে ব্যাঙের বিয়ে ইত্যাদি কৃষিভিত্তিক পর্যটনে ভূমিকা রাখে।

৫. **জীবনযাত্রা পর্যটন:** কৃষক, মাঝি, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমোর কীভাবে জীবন যাপন করে তা দেখার জন্য উৎসুক পর্যটকরা যাবেন।

এগ্রো ট্যুরিজম কেনো গুরুত্বপূর্ণ

দেশের কয়েক হাজার গ্রাম পর্যটন বান্ধব হলে, সামাজিক, ভূ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন সাধিত হবে। আধুনিক পর্যটনের উদ্দেশ্য হলো পর্যটনকে সাশ্রয়ী ও জীবনমুখী করা। পর্যটনের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে জীবনের উৎকর্ষ সাধন করে মানুষের বিশ্রাম, বিনোদন ও শিক্ষার জায়গাকে নিশ্চিত করা সম্ভব। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হলে, আমাদেরকে কৃত্রিম পর্যটন সেবা থেকে সরিয়ে এনে প্রাকৃতিক পর্যটন সেবার দিকে ধাবিত করতে হবে। আর এগ্রো ট্যুরিজম হচ্ছে সেই উপায়। পর্যটন ১০৯টি শিল্পকে সরাসরি প্রভাবিত করে , চালিত করে ও প্রসারিত করে। একজন পর্যটকের আগমনে সেবাখাতে প্রত্যক্ষভাবে ১১ জন ও পরোক্ষভাবে আরো ৩৩ জন মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এগ্রো ট্যুরিজম এমন একটি খাত যেখানে একজন কৃষক তার ফসল উৎপাদন ছাড়াও তার আবাসস্থল ও শস্যক্ষেতকে কৃষি পর্যটন বান্ধব করে সারাবছরের আয়ের উৎসে পরিণত করতে পারেন। ধরা যাক, বাংলাদেশে ২ কোটি কৃষক জনপ্রতি ন্যূনতম দুইহাজার টাকা পর্যটনের মাধ্যমে আয় করেন তাহলে এক সপ্তাহে আয় দাঁড়ায় চারহাজার কোটি টাকা, মাসিক আয় ষোলহাজার কোটি টাকা,বছরে ১ লাখ ৯২ হাজার কোটি টাকা। এতেই বোঝা যায় এগ্রো ট্যুরিজম কীভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশের এগ্রো ট্যুরিজম স্পট

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, মসলা গবেষণা ইনস্টিটিউট, আম গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নয়নাভিরাম ক্যাম্পাস, জার্মপ্লাজম সেন্টার, জিন ব্যাংকসহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও সর্বশেষ উদ্ভাবিত কৃষি কলাকৌশল ও জাতের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। আমাদের দেশে ছড়িয়ে আছে ৪৫০-এর বেশি হাওড়-বাঁওড়, বিল-ঝিল, দিঘি-জলাশয়। এসব জলাশয়ে আধুনিক জলযানে ঘুরে বেড়ানো, পাখি দেখার ব্যবস্থা, মাছ ধরার সুবিধা, নৌকা বাইচের ব্যবস্থা, নৌকা চালানো এসব; মৌমাছি পালনকারীদের মধু সংগ্রহ দেখা ও টাটকা মধু খাওয়া ইত্যাদি পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে। ফল ধরার মৌসুমে ফুল ফোটা ও মুকুল ধরা দেখা, পাকা ফলের বাগানে ঘুরে বেড়ানো এমনকি মৌসুমের একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে বাগানে যত খুশি ফল খাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া।

আম বাগান

কমলা বাগান

রাজশাহীর গোদা গাড়ি উপজেলার পলাশবাড়ি গ্রামে গড়ে উঠা ড্রিমার্স গার্ডেন যেখানে ১৩ বিঘা জমিতে বিভিন্ন প্রজাতির সাড়ে ৩০০ আম গাছ সঙ্গে ছয় রঙ্গের টিউলিপ, গাঁদা, গ্ল্যাডিওলাস, পিটুনিয়া সহ ষোল প্রজাতির ফুল রয়েছে যা দেখতে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ ভিড় জমাচ্ছে। এরকম আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে ঠাকুরগাঁয়ের অরেঞ্চ ভ্যালি।

আমরা পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন জায়গায় কৃষি পর্যটন গড়ে তুলতে পারি। যেমন: পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতির নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। গোপালগঞ্জ ও বরিশাল জেলার অববাহিকায় প্লাবনভূমিতে ভাসমান বাগানে কৃষি পর্যটন প্রতিষ্ঠার সুযোগ রয়েছে। ভাসমান বাগান UNO FAO দ্বারা ২০১৬ সালে গ্লোবালি ইমপর্টেন্ট এগ্রিকালচার হেরিটেজ সিস্টেমস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সিলেটের জলাভূমি-রাতারগুল, খুলনার সুন্দরবন, পাহাড়ি কৃষি, চা বাগান, দেশের বিভিন্ন এলাকায় হলুদে ভরপুর সরিষা জমি, দিনাজপুরের লিচু বাগান,যশোরের ফুলের বাগান, নরসিংদীর লটকন বাগান, রাজশাহী, সাতক্ষীরা, রংপুরের আম বাগান সম্ভাব্য কৃষি পর্যটনের ভালো কিছু উদাহরণ। এছাড়াও ঐতিহ্যগতভাবে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে জুম চাষ, গ্রামীণ নারীদের উৎপাদিত ফসল, হাঁস মুরগির খামার, ঢেঁকিতে ধান ভাঙা এগুলোর প্রতি বিদেশি ট্যুরিস্টদের আগ্রহ অনেক বেশি এবং তারা উপভোগ করে।

এগ্রো ট্যুরিজম উন্নয়নের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের নীতি কাঠামোতে কৃষি পর্যটন স্বীকৃত। জাতীয় কৃষি নীতিমালা ২০১৮ এবং জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালা ২০২০ কৃষি পর্যটনকে উন্নত করার জন্য পরামর্শ দিয়েছে। সরকার কৃষি বিনিয়োগের পাশাপাশি কৃষি পর্যটনে কীভাবে কৃষকদের সম্পৃক্ত করা যায়, তাদের কৃষিভিত্তিক পর্যটনের উপর ট্রেনিং দিয়ে জাতীয়ভিত্তিক প্রচারণার মাধ্যমে কৃষি পর্যটনকে জিডিপি আয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

এগ্রো ট্যুরিজমের একটি ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা যেতে পারে। কোন জায়গায় কি ভালো হয়, রাজশাহীতে কবে আম পারা শুরু হবে, বিল বা হাওরে কোনো দিন মাছ ধরার উৎসব হবে, কোনো মাসে বা সময়ে পদ্মায় ইলিশের ভরা মৌসুম থাকবে এসব তথ্য আগেই ওয়েবসাইটে আপলোড করা থাকবে। অন্যদিকে পর্যটন মন্ত্রণালয় ওই এলাকায় কীভাবে কম খরচে স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ যাবে, কোথায় থাকার ব্যবস্থা আছে, ভাড়া কত ইত্যাদি তথ্যাদি ওয়েবসাইটে লিপিবদ্ধ করতে পারেন।

কৃষির প্রতি সম্মান ও কৃষির ঐতিহ্যকে নিজেদের মধ্যে লালন করতে কৃষি পর্যটন হতে পারে অন্যতম মাধ্যম। তাছাড়া কৃষি পর্যটনের মাধ্যমে টেকসই উৎপাদন করার সঙ্গে সঙ্গে বহুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, বিনির্মিত হবে বাংলাদেশের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।" One village, one tourist destination" -এ স্লোগানটি কার্যকর করলে, কৃষিপ্রধান এদেশ অনেক এগিয়ে যাবে। তাই এগ্রো ট্যুরিজমের বিকাশ এখন সময়ের দাবি।

বাংলাদেশের এগ্রো ফার্ম

লেখক : শিক্ষার্থী (ফ্যাকাল্টি অব এগ্রিকালচার), হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

পর্যটন সংরক্ষণ ও উন্নয়নে ইকো-ট্যুরিজম এবং ট্যুর গাইডিংয়ের ভূমিকা

মো. সাইফুল্লার রাব্বী

একজন ট্যুর গাইডকে সুন্দরভাবে ট্যুর পরিচালনার করার জন্য যতগুলো কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে হয় তাকেই আমরা ট্যুর গাইডিং বলে থাকি। যে ব্যক্তি সমস্ত ট্যুর পরিচালনার দায়িত্বে থাকে তিনি হলেন ট্যুর গাইড। যে প্রতিষ্ঠান ট্যুর পরিচালনার করেন সে প্রতিষ্ঠানটি ট্যুর অপারেটর। ট্যুর পরিচালনার জন্য যাতায়াতের জন্য যানবাহন সেবা, থাকার জন্য আবাসন সেবা, খাবারের ব্যবস্থা, ভ্রমণ গন্তব্যের বিস্তৃত বিবরণ, আশেপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ, শিল্প–সংস্কৃতি, জীব বৈচিত্র্য, ইতিহাসের বিবরণ ও সফলভাবে ভ্রমণ পরিচালনা ইত্যাদির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে ট্যুর গাইডিং ম্যানেজমেন্ট বলা হয়।

ট্যুর গাইডিংয়ের উদ্দেশ্য ঃ

১. সঠিকভাবে ট্যুর পরিচালনা

২. অল্প সময়ে দক্ষতার সঙ্গে ট্যুর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

৩. ট্যুরিস্টদের ট্যুর সর্ম্পকে গাইড করা

৪. ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন নিয়ে তথ্য উপাত্ত শেয়ার করা

৫. ট্যুরের শুরু থেকে শেষ অবধি ট্যুরিস্টদের নিরাপত্তা প্রদান

৬. সফলভাবে ট্যুর পরিচালনার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ করা

ট্যুর গাইডিংয়ের গুরুত্ব

১. কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে।

২. দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ

৩. দেশ-বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ–সুবিধা

৪. নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে ভ্রমণ

৫. ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি নিয়ে জানার সুযোগ

৬. ভ্রমণ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা

International Ecotourism Society (১৯৯১)-এর মতে ইকো-ট্যুরিজম হলো প্রাকৃতিক অঞ্চলে দায়িত্বশীল ভ্রমণ যা পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্থানীয় মানুষের মঙ্গল সাধন করে। হেক্টর সেবালাস ল্যাসকুরেন (Hector Ceballas Lascurain, 1987) এর মতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং সর্বোপরি বিদ্যমান সংস্কৃতির (অতীত ও বর্তমান) উপভোগের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত শান্ত বা অনিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে পর্যটনকে ইকো-ট্যুরিজম বলে। হেটজার (Hetzer, 1965) ইকো-ট্যুরিজমের চারটি স্তম্ভের কথা বলেন:

১. ন্যূনতম পরিবেশগত প্রভাব।

২. স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি সর্বাধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও স্থানীয় সংস্কৃতিকে প্রভাবিত না করা।

৩. ভ্রমণকারী দেশের সর্বনিম্ন স্তর থেকে আর্থিক বিকাশ সাধন।

৪. পর্যটকদের সর্বাধিক বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া।

ইকো-ট্যুরিজমের উদ্দেশ্য

১ . সুসংগত ও টেকসই পর্যটন সরবরাহ করা।

২. পর্যটকদের ভিন্ন ভিন্ন বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি এবং স্থানীয় বাসিন্দা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা প্রদান।

৩. সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে পর্যটকদের সচেতন করা।

৪. ইকো-ট্যুরিজমকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য পরিকাঠামোর সুব্যবস্থা করা।

৫. কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ইকো-ট্যুরিজমের গুরুত্ব

১. ইকো-ট্যুরিজম পিছিয়ে থাকা প্রত্যন্ত এলাকার অর্থনৈতিক বিকাশে সাহায্য করে।

২. বিভিন্ন বন্য পশু ও উদ্ভিদ সম্পর্কে মানুষ জানতে শেখে।

৩. কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে।

৪. ইকো-ট্যুরিজমের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার মানুষের সমাগম ঘটায় সংস্কৃতির মিলন ঘটে।

৫. প্রকৃতির মধ্যে থেকে মানুষ বিনোদনের সুযোগ পায়।

৬. স্থানীয় এলাকার পরিকাঠামোগত বিকাশ ঘটে। যেমন- রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ, আবাসন প্রভৃতি।

৭. স্থানীয় মানুষদের মধ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রতি মনোনিবেশ দেখা যায়।

৮. মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম হয়।

৯. সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটে।

ইকো ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করা এখন সময়ের দাবি। টেকসই পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ইকো-ট্যুরিজম। ইতিমধ্যে আমাদের অনেক প্রতিবেশী দেশ ইকো-ট্যুরিজমের মাধ্যমে টেকসই পর্যটন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করছে। আমাদের দেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় আনতে হলে ইকো ট্যুরিজম ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা, কক্সবাজারের বিভিন্ন গন্তব্য স্থান, সিলেট, সুনামগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, সুন্দরবন, নিঝুম দ্বীপসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক পর্যটন কেন্দ্রগুলো ইকো-ট্যুরিজমের আওতাভুক্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই পর্যটন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব।

লেখক : এসিস্টেন্ট ম্যানেজার, কাস্টমার সাপোর্ট এন্ড ট্রেনিং ডিপার্টমেন্ট, সেবার বাংলাদেশ (Sabre Travel Network Bangladesh Limited)

পর্যটন শিল্প ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন

ড. মোহাম্মদ আবু তাহের

চির অপরূপ বাংলার রূপ দেখে যাও এসে বিশ্ব

জলে সমতলে সাজানো এরূপ বিধাতার আঁকা দৃশ্য

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে হারিয়ে যাওয়া পর্যটন শিল্পের পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলাদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ২৭ নভেম্বর তারিখে জারিকৃত মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১৪৩ নং আদেশ বলে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পর্যটন সম্ভাবনাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন নামে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৭৫ সালে পর্যটন করপোরেশনকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেওয়া হয়। ১৯৯৯ সালে পর্যটনকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জাতীয় পর্যটন সংস্থার মূল উদ্দেশ্য

১. বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশ।

২. পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

৩. পর্যটন শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা।

৪. পর্যটকদের সেবা প্রদানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ

৫. বিদেশে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা।

বাংলাদেশ সরকারের একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো গ্রাম হবে শহর। অথবা শহর এবং গ্রামের সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের গ্রামাঞ্চলে থাকা পর্যটন কেন্দ্রগুলোর কারণে এলাকার উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে দেশে বেকার সমস্যা দূরীকরণে নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হচ্ছে। করোনাভাইরাসজনিত মহামারির কারণে দীর্ঘ সময় ধরে থমকে ছিল বিশ্ব। বিধিনিষেধের কারণে পর্যটন খাতগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশি। ২০২০ সালে করোনার প্রভাবে বাংলাদেশের পর্যটনেও বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। ২০২০ সালে জিডিপিতে পর্যটনের অবদান প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছিল। যে কারণে পর্যটন শিল্পে বিশেষ সহায়তা জরুরি। পর্যটন খাতে সরকারি বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পর্যটন খাতকে আকর্ষণীয় করে তুলতে বিদেশি বিনিয়োগের উপরও জোর দিতে হবে। মালদ্বীপ একটি ছোট দেশ হলে ও পর্যটন শিল্প দেশটির আয়ের প্রধান উৎস। মালদ্বীপের আয়ের প্রায় ৭০ শতাংশ আসে পর্যটন খাত থেকে । ২০১৯ সালে মালদ্বীপ সেরা পর্যটন গন্তব্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় বিশ্ব পর্যটন সংস্থার নিকট থেকে। মালদ্বীপ যেভাবে তার দ্বীপগুলোকে পর্যটকদের অবস্থান ও থাকার সুবিধা দিয়ে আর্কষণীয় করেছে একইভাবে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী দ্বীপগুলোকে সাজিয়ে পর্যটন সমৃদ্ধ করা যেতে পারে। দেশের পর্যটনস্থল সহ বিভিন্ন শহর ও নগরীতে ফাইভস্টার, থ্রিস্টার হোটেল নির্মাণে পর্যটন খাতে বিনিয়োগে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সিঙ্গাপুরের জাতীয় আয়ের ৭০ শতাংশ আসে পর্যটন থেকে, তাইওয়ানের ৬৫ শতাংশ, হংকংয়ের ৫৫ শতাংশ, ফিলিপাইনের ৫০ শতাংশ এবং থাইল্যান্ডের ৩০ শতাংশ। বাংলাদেশেও দিন দিন পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে। পর্যটকদের চাহিদা ও বিশ্বমানের সুযোগসুবিধা এবং বাস্তবতা অনুধাবন করা সময়ের দাবি। দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার ও সাগরকন্যাখ্যাত কুয়াকাটায় সৌন্দর্যবৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। সরকার এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কক্সবাজারের পর্যটন সম্ভাবনাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মাতারবাড়ী তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র, গভীর সমুদ্রবন্দর দ্বীপভিত্তিক পর্যটন পার্ক, আন্তর্জাতিক শেখ কামাল স্টেডিয়াম, সমুদ্র গবেষণা ইন্সটিটিউট, রামুতে দ্বিতীয় বিকেএসপি, টোলবিহীন ঢাকা কক্সবাজার মহাসড়কসহ ৩ লাখ কোটি টাকার মোট ৭৭ টি মেগা প্রকল্পের কাজ চলেছে। এগুলো সম্পন্ন করা গেলে কক্সবাজার বিশ্বের পর্যটনভিত্তিক দেশগুলোর মতো আকর্ষণীয় পর্যটনের দেশ হবে বাংলাদেশ। পাশাপাশি বেকারত্ব দূর হবে। উন্নত দেশ হতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বাংলাদেশের পর্যটনখাত। দিন দিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা আকৃষ্ট হচ্ছে আমাদের দেশে। যে কারণে বাংলাদেশের ট্যুরিজম বোর্ড ধারাবাহিকভাবে পর্যটন বান্ধব বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই বর্তমানে পর্যটনকে একটি অন্যতম লাভজনক খাত হিসেবে বেছে নিয়েছে। পর্যটনের মাধ্যমেই অর্থনীতি, সামাজিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়। পর্যটন খাত এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় খাত। দেশের মানুষও এক জেলা থেকে অন্য জেলার ঐতিহাসিক দৃষ্টিনন্দন স্থানসমূহ দেখতে যায়। এ জন্য পর্যটকদের থাকা খাওয়া ও নিরাপত্তার সুব্যবস্থা দরকার। পাশাপাশি আমাদের দেশের সড়ক মহাসড়ক ও নিরাপদ করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

বিশ্ব পর্যটন খাত এখন সবচেয়ে গতিশীল খাত। বাংলাদেশের পর্যটন খাতকে আরও গতিশীল করতে হবে। বাংলাদেশে নদী,সমুদ্র, হাওর টিলা, পাহাড়ী অঞ্চলসহ বিস্তির্ন এলাকা রয়েছে যা পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। তবে যাতায়াত, থাকার অসুবিধা, পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাবের কারণে অনেকে এ দেশে আসতে আগ্রহী হয় না । দেশের পর্যটনস্থলগুলোতে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ করতে হবে। সিলেটের অনেক পর্যটন স্থলে যাওয়ার জন্য যানবাহন ভাড়া কমানো দরকার। সিলেট বিভাগের উল্লেখযোগ্য আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলো হলো মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত, হামহাম জলপ্রপাত, লাউয়াছড়া রির্জাভ ফরেস্ট, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, প্রকৃতিকন্যা জাফলং, ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর, বিছানাকান্দি, লালাখাল, মিঠাপানির রাতারগুল জলাবন, টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, জাদুকাটা নদী, শহীদ সিরাজ লেক, শ্রীপুর, তামাবিল, খাসিয়াপুঞ্জি রাজবাড়ী, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান ইত্যাদি।

হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত এক সমৃদ্ধ জনপদ হলো বাংলাদেশ। পর্যটন শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি সম্ভাবনাময় অধ্যায়ের নাম। এই শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করাও প্রয়োজন। পর্যটন শিল্প বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশ কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় পর্যটন শিল্প আর্থসামাজিক উন্নয়নে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

পর্যটনে এগিয়ে চলছে মৌলভীবাজার জেলাও। মৌলভীবাজার জেলায় রয়েছে শতাধিক পর্যটন স্পট। মৌলভীবাজার জেলা বহু ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। গণমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় প্রতিবছর দেশি বিদেশি প্রায় ৫ লাখ পর্যটক এ জেলায় দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে আসেন। পর্যটনকে কেন্দ্র করে গত দুই দশকে জেলায় ব্যক্তি উদ্যোগে প্রায় ০৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। এ জেলায় রয়েছে পাঁচ তারকা মানের দুসাই রিসোর্ট ও গ্র্যান্ড সুলতান রির্সোট, এছাড়াও ছোট বড় হোটেল ও কটেজ গড়ে ওঠেছে । বাংলাদেশের ১৬৬ টি চা বাগানের মধ্যে ৯২ টি চা বাগান রয়েছে মৌলভীবাজার জেলায়। বছরে প্রায় সাড়ে চার কোটি কেজি চা উৎপন্ন করে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে চা বাগানগুলো। বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের স্মৃতিসৌধ রয়েছে এই জেলায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ২৮শে অক্টোবর পাকসেনাদের একটি বাঙ্কারে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে ফেরার পথে

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় ধলাই সীমান্তে পাক সেনাদের গুলিতে শহিদ হন বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান। পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য মৌলভীবাজার জেলায় অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে, এখানে রয়েছে বাংলাদেশের চা গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিটিআরআই) চা জাদুঘর, মাধবপুর লেক, হরিণছড়া লেক, সাতগাও লেক, রাবার বাগান, রাজঘাট লেক, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর, খাসিয়া পানের বাগান, লাওউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, কমলা রানীর দীঘি, দেওয়ান দীঘি ইত্যাদি। এছাড়া নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির মধ্যে রয়েছে খাসিয়া, গারো, সাওঁতাল, হাজং, ননিয়া, পবর, মাথালি, কিষাণ ইত্যাদি। মনিপুরি, খাসিয়া, সাওতাল টিপরা গারো সম্পদায়ের রয়েছে স্বতন্ত্র জীবনধারা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন। বিদ্যমান পর্যটন স্পটের সংখ্যা, আবাসন, দৃষ্টিনন্দন মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবেচনায় মৌলভীবাজার জেলা নিঃসন্দেহে পর্যটনের ক্ষেত্রে এক অনন্য অবস্থানে রয়েছে।

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই দেশ, এজন্যই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছিলেন এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি বাংলাদেশের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ও পর্যটকদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। পৃথিবীতে এমন আবহাওয়ার দেশ খুঁজে পাওয়া কঠিন। এ দেশে সারা বছরই বেড়ানোর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান। সৃষ্টিকর্তা আমাদের দেখার জন্য উপভোগ করার জন্য অনেক কিছু দিয়েছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন:

বহুদিন দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দু পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের বাংলাদেশ। সারা বছর জুড়েই মনোমুগ্ধকর দৃষ্টিনন্দন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিরাজমান। সারাদেশেই দেশিবিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার মতো অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে বাংলাদেশে। বৃহত্তর সিলেটের ৪ টি জেলায় রয়েছে আসাধারণ পর্যটন সম্ভাবনার মনোরম জনপদ। নৈর্সগিক সৌন্দর্যের ভরপুর বৃহত্তর সিলেটের পর্যটন। সারা পৃথিবীতে সিলেটের চা বাগানের সুনাম রয়েছে। মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার কয়েকটি উপজেলার বিশাল জায়গা নিয়ে সিলেটের বৃহত্তম হাওর হাকালুকি। বর্ষা মৌসুমে এই হাওরকে সাগরের মতই মনে হয়। আমাদের দেশের জন্য হাওর আমাদের সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ। আমাদের দেশের জন্য হাওর পর্যটন একটি সম্ভাবনাময় খাত। এই খাতে সরকারি বেসরকারি পরিকল্পিত বিনিয়োগ হলে পর্যটনের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। দেশের সত্যিকারের উন্নয়ন করতে হলে গ্রামীণ পর্যায়ের উন্নয়ন দরকার। গ্রামীণ উন্নয়নের ওপরই দেশের জাতীয় উন্নয়ন নির্ভরশীল। হাওরকে পর্যটকদের জন্য আর ও আর্কষণীয় করতে পারলে হাওর জনপদের মানুষই নয় গ্রামীণ মানুষের ও উন্নয়ন হবে। বাংলাদেশের গ্রামই হতে পারে পর্যটন শিল্পের প্রাণকেন্দ্র।

সারা বিশ্বে এটি প্রমাণিত সত্য পর্যটনের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়। বাংলাদেশে যত বেশি পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ঘটবে ততই গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

আমাদের দেশে অর্ধশতাধিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হস্পিটালিটি এবং ট্যুরিজম নিয়ে উচ্চতর অধ্যয়নের সুযোগ থাকলেও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যভিত্তিক পর্যটন নিয়ে কোনোধরনের

বিষয় এখন পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হয়নি। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত পাঁচ শতাধিক প্রত্নস্থল রয়েছে। প্রত্নতত্ত্বকে ঘিরে বৃহৎ পরিসরে আর্কষণীয় এবং টেকসই পর্যটন শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব। দেশের সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যভিত্তিক পর্যটন বিষয়ে কোর্স চালু করা যেতে পারে। শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যভিত্তিক পর্যটন নামক বিষয় প্রর্বতন করা গেলে গবেষণার উন্নয়নের পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটবে।

১৯৮০ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে ২৭শে সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশেও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপন করা হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড দেশের পর্যটন সক্ষমতাকে তুলে ধরার লক্ষ্যে বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে চমৎকার স্মরণিকা প্রকাশ করে থাকে, যা ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের আকৃষ্ট করে। এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে; তাদের ধারাবাহিক সাফল্য কামনা করি।

লেখক : প্রাবন্ধিক, আইনজীবী ও গবেষক

Rural Tourism including Community, Homestay, Farm, Islamic, Gastronomy, Sports, Shopping, River and Ecotourism: Partnerships among Various Government Agencies

Dr. Moslehuddin Chowdhury Khaled

Introduction

Bangladesh government has been taking many initiatives to improve various forms of tourism. In this essay, rural tourism is the focal form of tourism but one that may weave other forms of tourism as well. Examples include Community-based tourism, Homestay, Farm or agriculture, tea, and hill tourism, Islamic, River and Ecotourism. Bangladesh is predominantly a rural and riverine country and we should be proud of it. Additionally, we have a 720 km sea coastline and twenty-one percent (21%) are uplifted or hilly areas. So as part of national development strategy and in line with SDG (sustainable development goals), we should focus more on capitalizing these existing natural endowments rather than building physical establishments for tourist attractions. This article discusses some of these alternatives in the context of rural tourism.

Different Forms of Tourism in the broader context of Rural Tourism

Tourism is a multifaceted sector. People travel places for many different reasons. It takes a complex network of so many actors and things to understand tourism issues. Following is a brief idea of different established forms of tourism relevant to our article.

Rural tourism

UNWTO (United Nations specialised Agency for Tourism) defined Rural Tourism as "a type of tourism activity in which the visitor's experience is related to a wide range of products generally linked to nature-based activities, agriculture, rural lifestyle/culture, angling and sightseeing. Rural Tourism activities take place in non-urban (rural) areas with the following characteristics: i) low population density, ii) landscape and land-use dominated by agriculture and forestry and iii) traditional social structure and lifestyle" (UNWTO).

So we can see Bangladesh is well suited for such rural tourism with farming and forestry embedded in it. Additionally, it may include other forms of tourism like Islamic, gastronomy, sports, shopping, river and ecotourism. Together with all these, rural tourism offers travellers the opportunity to immerse themselves in the local culture, traditions, and way of life while contributing to the economic development of rural communities.

Community Tourism

Rural tourism combines 'community tourism', emphasizing the interaction between travellers and local communities. It aims to empower rural residents by involving them in the tourism experience. Tourists engage in activities such as participating in local festivals, workshops, and community projects. The goal is to create a symbiotic relationship where visitors gain insights into rural life, and locals benefit economically.

Homestay Tourism

Another popular trend overlapping with community tourism is 'Homestay' tourism. Many travelers want to stay in the homes of local families, immersing themselves in the daily routines and traditions of the region. This form of accommodation offers an authentic experience and

fosters cultural exchange, understanding, and friendships between hosts and guests.

Farm Tourism

Farm tourism, also known as 'Agritourism' or 'Agrotourism' involves any agriculturally based operation or activity that brings visitors to a farm or ranch. This form of tourism allows tourists to experience rural life by participating in farming activities, harvesting crops, fishing, dairy, poultry and other agro-farming processes. This form of tourism educates visitors about the importance of sustainable farming practices. Tourist can see firsthand the food supply and processing rooted in Mother Nature. Farm tourism boosts local economies by diversifying income sources for farmers.

Islamic Tourism

Islamic tourism involves visiting rural areas with historical significance to the Islamic faith. These sites might include mosques, religious schools (madrasas), and ancient tombs of revered figures. This form of tourism caters to Muslims exploring Islamic heritage in rural settings.

River Tourism

River tourism engages the tourists, in activities such as kayaking, fishing, and riverfront picnics. This form of tourism showcases the natural beauty of rural river regions and supports local economies by providing various services like boat rentals, guided tours, and accommodation.

Ecotourism, Forest, and Mountain tourism

Ecotourism promotes environmentally responsible travel while educating tourists about local ecosystems and conservation efforts. Rural areas often feature diverse ecosystems, wildlife, and natural landscapes that attract eco-tourists. Activities might include hiking, bird-watching, and wildlife observation, all while emphasizing minimal environmental impact.

Cultural tourism - Gastronomy, Shopping, Sports

Cultural tourism has a definite attractions globally weaving together the allure of diverse traditions, art, and heritage. It offers an immersive experience that transcends surface attractions, going beyond visiting landmarks. Travellers engage with local customs, languages, cuisine, and rituals and let tourists to interact with local customs, languages, cuisine, and rituals.

Our point is that all these different forms of touristic aspirations can be combined in the broader umbrella of rural tourism within our unique Bangladeshi natural and socio-cultural context.

Proposed model of Integrated Rural Tourism – Viability and Sustainability

Rural tourism can overlap and mix with various other forms of tourism, creating unique and diverse visitor experiences. Now the first thing is tourist accommodation at rural destinations. Then comes food and other things to do.

How can we develop such a business model? Here are some propositions:

1. Rent/ lease the empty houses: many people have their village homes empty as they live in cities or abroad. These houses can be turned into accommodations with some interior work, bringing income for the house owners.

2. Homestay with locals: Local people's houses may be selected for hosting tourists bringing income for the rural households. Households will compete to serve tourists, if we can connect tourists with these households.

3. Build dedicated accommodations: According to my opinion, the previous two options are more preferred. But in some cases, we can construct tailor-made village huts and houses for

tourists if the investment makes business sense having enough tourist flow.

4. Utilizing Government housing quarters: In Bangladesh, there are government establishments having unutilized facilities and spaces. Some of it can effectively turned into rural tourism accommodations.

Depending on the particular local geography, flora and fauna, and tourists' preferences, the accommodations may take different established names and forms like guesthouses, eco-lodges (eco-friendly construction, renewable energy sources), farmstays, village huts or cottages, tented camps, heritage homes, floating Houses, treehouses etc.

Other things will follow once we can arrange such safe rural tourism accommodations. Such as culinary or gastronomy tourism where tourists would love to taste 'local food' by the 'local hosts'. The tourists, particularly from other places of Bangladesh, being mostly Muslims, may take an interest to visit local old, historical, or beautiful, or big model mosques and shrines (Islamic tourism). There are always local festivities and sports in rural areas. Tourists can enjoy local haat bazar, fairs, and enjoy shopping local goods (cultural tourism).

Bangladesh is blessed with rivers and canals - large and small, everywhere. This can be the basis of river tourism integrated with rural tourism. Agriculture, fishing, farming, poultry etc. are part and parcel of everyday rural life of Bangladesh. Some of areas close to forest and hilly areas. So rural tourism can effectively be tied with agri-tourism, farm tourism, forest tourism, mountain tourism, all of which can be termed under the umbrella name of 'ecotourism'.

Apart from foreign tourists, local tourists from different areas of Bangladesh, particularly those living in cities may be a huge untapped market. These tourists can be guided by local guides. The accommodations, food, and other logistics will create local employment and human resources (tourism employment / HR development) also.

Enabling Environment - Partnerships among Government Agencies

SDG Goal 17 is all about partnerships for achieving all other SDGs. Now tourism agency of government also should develop effective partnerships to make the model work. Also, the tourism agency can take the lead in integrating all forms of tourism into the broader context of rural tourism. District and upazila administration can help develop a list of interested local hosts. Police stations can provide hotline for safety and security of tourists and their hosts. Upazila-level offices of other agencies of different ministries can support with their respective part in facilitating the process of tourist attractions and accommodations.

As a whole, if government can create the right enabling environment through right kind of policy and incentives, private sector will come up with right kind of motivation and models for business. If rural tourism can be triggered to a sizable scale, it can contribute to rural economy significantly across the whole rural industry supply chain covering a wide range of goods and services.

Conclusion

Smart Bangladesh needs smart regulations and smart agency. Tourism agency of the Bangladesh government should be smart enough to put all pieces together. Rural tourism has a huge potential as it encompasses a range of experiences, from engaging with local communities and staying in their homes to exploring agricultural practices and immersing oneself in nature. This provides economic opportunities for rural communities. Government through its tourism agency can take an integrative role in implementing the proposed tourism model.

Writer : Associate Professor Dept. of General Management and HRM, Chittagong Independent University (CIU)

Endless opportunities to build a career in food and beverage services in the hospitality industry

Mohammad Badruddoza Talukder

The tourism and hospitality industry is known as one of the major economic activities of almost every country in the world. Today this industry is becoming a major tool for the socio-economic development of the world. Bangladesh is one of the most enduring countries in the world in terms of tourism and hospitality, whose natural diversity is unique from other countries of the world. Bangladesh has huge potential opportunities for tourism and hospitality development.

According to the World Travel and Tourism Council (WTTC), the contribution of the tourism sector to global GDP in 2019 was 10.4 per cent or 9.16 trillion dollars. The following year, it dropped to 5.5 per cent or 4.6 trillion dollars. Whereas in 2019, the employment of 330 million people in the global tourism sector, due to corona pandemic was reduced to 260 million in 2020. This means that 6 crores 17 people have lost their jobs in the global tourism sector. Even then, 1 out of every 11 people is employed in the tourism and hospitality industry. According to several hospitality researchers, Bangladesh's hospitality sector, like that of other major emerging countries, has become one of the most important foundations for socio-economic development. The hospitality industry contributes 4.4 per cent of total GDP in 2019-2020. The hotel and restaurant sub-sectors grew by 7.13 per cent 2018 compared to 6.98 per cent the year 2019, demonstrating that the hospitality business contributed a major contribution to GDP growth. According to the Ministry of Civil Aviation and Tourism Bangladesh, there are 17 five-star hotels, 06 four-star hotels, and 20 three-star hotels in Bangladesh in 2020.

Due to a shortage of trainers and institutions, Bangladesh's hotel and catering business is unsuccessful to create competent, skilled, and experienced food service professionals. One of the most important departments for generating large amounts of revenue in the hotel industry is the food service department. This department provides food and beverages with highly skilled and professional service to guests directly. A food service employee can start to earn between Tk 8000 to Tk 40000 per month, and depending on their skills and experience, they can advance to positions such as restaurant manager, bar manager, banquet manager, room service manager, food and beverage manager, hotel general manager with a salary exceeding Tk 1 lac. After training, a food service trainee can start working according to individuals interests in hotels and restaurants, catering organizations, hospitals, welfare catering, clubs, industrial catering, residential catering, transport catering, and outdoor catering. There are also several opportunities to travel worldwide and see the nations of individual’s choice by land, sea and airline as area or group manager; air stewards; first-class steward on cruise ships or public transportation, and so on. Like other industries, food and beverage professionals have a wide range of job opportunities similar to those of any other commercial organization, including primary and secondary catering establishments. Anyone can start a career in the hotel sector in Bangladesh or abroad by studying food service skills.

The goal of learning food and beverage service is to teach a trainee who has decided to pursue a career in the hotel and catering industry from the fundamental stages of hospitality service. For this reason, the trainee must be ambitious and enthusiastic about work, possess initiative, the

ability to embrace change, and stay up with unique ideas. Grooming, etiquettes, manners, serving foods to guests, mise-en-place, mise-en-scene, hygiene and sanitation, knowledge of a wide variety of food and beverage, alcoholic beverage serving styles, knowledge of accompaniments and garnishes, food gastronomy, menu planning & costing, portion management, food waste management, customer-staff interactions, staff training and many other topics are covered during food and beverage service training. Food service personnel play a role in the development of such positive relationships.

The food and beverage service course offers as much information as possible for the trainee to gain a better understanding of the food and beverage service industry and establish a solid basis for their chosen vocation. By seeing modern food and beverage service procedures in different nations, a wealth of experience can be gained. Anyone interested in working as a trainee in the food and beverage industry can contribute to a country's economic development.

Writer : Assistant Professor and Head, Department of Tourism and Hospitality Management
Daffodil Institute of IT (Under National University), PhD Scholar, Lovely Professional University, India

Agro-tourism a new dimension of tourism sector in Bangladesh

Kaiser uddin Ahammad

Bangladesh is a young and developing nation with a long history and culture and over the last 30 years, Bangladesh has been consistent GDP growth of above 6.5%. Our youthful 160 million people are extremely resilient and prepared to take on many challenges of life. It is a country of fertile land and 70% of the people are depends on agriculture. Bangladesh has been putting tremendous efforts to develop its agriculture for the last few decades and subsequently acquiring world's top position in producing many agricultural produce including Rice (3rd), Jute (2nd), Jackfruit (2nd), Potatoes (7th), Tropical fruits (6th), Mangoes (8th), Tobacco (12th) and farmed fish (5th). Being an agricultural country Bangladesh embraces all these achievements with the hard work of our farmers along with the support of the government. Bangladesh has three sectors of generating revenue. Those are industry, agriculture and services. Tourism is a part of the service sector. Tourism can be classified in a number of ways based on the nature of activity, location type or duration of stay. Such as heritage tourism, cultural tourism, historical tourism, geo-tourism, adventure tourism, eco-tourism, agro-tourism. Agro-tourism is one of the fast growing travel trends in the world as well as in our country. We might be curious to learn more about agro-tourism. While not an entirely new concept Agro-tourism plays an increasingly important role in diversifying and revitalizing rural economics, connecting people with rural culture and tradition and fostering sustainable tourism. Thus it is a rural-urban relationship which can bridge the gap between farmers and city dwellers for the benefit of both. According to fortune business insight the global agro-tourism market size was valued at $ 69.24 billion in 2019and projected to reach $ 117.37 billion by 2027 with a compound annual growth rate of 7.42% during the forecast period of 2020-2027.

What is Agro-tourism means?

Agro-tourism is an integrated farming based business and intersection of tourism and agriculture for the purpose of education, entertainment and rest. Rural landowner or entrepreneurs invites visitors to engage in activities like camping, tasting, picking or harvest crop, ranches, orchards, fishing, milking, horse riding, feed farm animals, enjoy plantation, swimming in the lake or ponds etc. that helps foster a deeper understanding of farming process through hands on experience. Agro- tourism in a way of involve education and be educated mindfully to connect visitors with good agriculture practice , organic farming, rural culture, participating in traditional

and modern agricultural practice without damaging the surrounding natural environment. By paying to engage various events and activities that helps in economics and staying overnight at farm house, bed and breakfast, playing in unused land interacting with the owners and workers in exchange for cultural and educational experience that connect urban people to food sources that contribute to the socio-economic condition.

Importance and Benefits

Tourism proving itself as a global economic power house, the merger between tourism and agriculture seems like a practical path forward to diffuse mass tourism and support agriculture business. Beyond the economic importance, agro-tourism plays a vital role in cultural preservation by providing value to traditional lifestyles and customs and it offers numerous benefits including the following:

- Supports eco-farming practices and follows an eco-friendly farming ethos that considers the environment by avoiding chemical pesticide, engaging in regenerative community based practices and growing food that aligns with the local ecology and seasonal climate.
- Learns to visitors to be respectful to the environment and helping to the exploring of nature like insight and nearby landscapes and scenic beauty.
- Having a socio-economic impact by engaging with the owners and workers on the farm that learned lots about unique geology and climate, economic vitality of the region, cultural significance of farm produce and agriculture, information and farm staff to help educate and their livelihood craftsmanship.
- Provides an additional income source to the farmers and generates employment opportunity to the family members and rural youth.
- Additional income source protects farmer against income fluctuations and enhances their socio-economic dignity as well as standard of living.
- Enhance cultural transformation between urban and rural people and enrich social and moral values.
- Supports for rural and agricultural development process and prevents local people to migrate to cities in search of employment.
- People get a chance to re-connect with their soil by offering a 'hands on experience' with the agricultural techniques and methods.
- The stimulating economic growth, valuing cultural heritage and raising the standard of living encourage positive attitudes and behaviors of the communities towards agro-tourism.
- Agro-tourism improves the community infrastructure and assists in revitalizing the flagging economies of rural areas. Encouraging the development of farm stays to diversify farm income is an effort to retain farmers in business, attract new entrants to agriculture, and promote countryside's development.
- Provide an opportunity to educate people both holistic and modern methods of farming and the risks involved in everyday agriculture and improve people’s understanding local food system.

Why people love Agro-tourism and scopes?

There is lots of scope and reasons will make you fall in love with Agro- tourism like.

- Learning tools and training videos for student and farmers group
- Boost agricultural revenue.
- Support economic diversification.
- Revitalize rural communities.
- Value trading and culture.
- Support diverse people in business.
- Support year-round employment.
- Connect with the Origins of Your Food.
- Engage in cultural exchange.
- Get some fresh air.
- Stock up on fresh, local products.
- Enjoy slow travel.
- Party at a festival.
- Stay in amazing accommodation.
- Expanded market.

Facilities and Services

A piece of land with something different it's natural and charming environment, provides the nourishment of one's mind and gives a relief from the busy and monotony life.

- Eco-cottage may provide you very natural feelings and enjoy lovely nights.
- A Farm shop which may satisfy your needs of local handicrafts, organic fruits, different types of fishes, Organic dry fish, dairy milk, yogurt, chicken & eggs, coffee and green tea, local spices, juice & drinks, readymade seedlings for roof and homestead gardening
- Hilly and plain walk-way that touches the lake or river and green hills with huge guest birds and animals.
- Place of amusement with fresh air, hilly greenery and natural beauty that may enjoyable to all for the children, for the young and for the old, for the near and dear ones. The calm, quiet and green environment will obviously refresh your mind within a blinking of your eyes.
- Boating, fishing and angling may be your first choice in the farm with kid's zone.
- Organic fruits and farm fresh fruit Juice, green Tea and fresh coffee along with café and restaurant service may refresh your mind and thoughts.
- BBQ with fish and sweet corn may give added enjoyment.
- Transport and catering services of Farm may ease your anxiety.
- Very good road communication, electricity, internet and transportation facilities.

Challenges of Agro-tourism

- Provides low financial return at first and a poor farmer cannot effort
- Can be hard work for you and your family members or partners to develop agro-tourism
- May require developing new skills for tourism and integration of work.
- Require more effort to keep clean the farm, safe and presentable, which can sometimes affect primary and regular operation.
- Can create staffing issues and increase paperwork.
- Time-consuming and complicated to learn about and comply with a host of applicable laws and regulations.
- Often requires spending money upfront to improve facilities for visitors and meet regulatory requirements.
- Not familiar terms for most travellers and thus the market are not well defined. Need for education to make visitors aware of Agro tourism experience as a viable option.
- No insurance coverage in integrated farming and agro-tourism.
- Security for home stay visitors.

I would like to inform about one agro-tourism based integrated farm in Cox's Bazar that starting since 2017 with vision to establish Integrated Organic Agro Park. The Farm covers total 75 acres of hilly forest area of Naikhongchori and Ukhiya, Cox's Bazar, rounded by the scenic beauty, river, walk way, lake, orchards, eco-cottage, restaurant, juice bar, playground along with Integrated farming. They receive about average 150-200 number of local and foreign visitors every day in the farm. Specially, in holyday huge visitors (500 to 1000) make gathering in the organic agro park. It was very difficult initially to establish the farm as agro-tourism but now days it is running very smoothly and getting healthy return from investment. The aim of the concern is to give the highest level of satisfaction maintaining a high standard of business ethics and trying to offer facilities and services like, family groups enjoy a day out picking fruits, fishing, enjoy the regular agriculture work, a petting and butterfly zoo, food tasting events or attending a wedding on a farm for couples checking into a bed and breakfast for a long anniversary weekend and enjoy slow travel and slow food. The Philippines is now among the world's top agro-tourism destinations. Bangladesh government has been implementing the master plan to promote tourism sector in Bangladesh. Today the demand continues to grow for agro-tourism worldwide as well as Bangladesh.

Writer : Chairman, Organic Farm and Eco Park PLC. Cox's Bazar. Bangladesh

Safety and Security of Tourism and Tourists Attraction

Sajnin Dewan Ria

In today's fast-paced world, tourism has become an integral part of our lives. People likes to exploring new places, cultures, and attractions to find peace, speed up mental satisfaction and to create memories. However, as travelers embark on these journeys, it's crucial to prioritize safety and security. Both tourists and the destinations they visit must work together to ensure a safe and enjoyable experience. According to the United Nations World Tourism Organization (UNWTO), international tourist arrivals surpassed 1.4 billion in 2019, highlighting the ever-increasing popularity of travel.

Understanding the Significance

Tourism not only contributes significantly to the economy but also fosters cultural exchange and mutual understanding. Yet, without adequate safety and security measures in place, these benefits can be overshadowed by potential risks and challenges. Threats ranging from natural disasters and health emergencies to criminal activities and political unrest can disrupt the tranquility of tourist destinations and deter travelers. Thus, ensuring the safety and security of tourists becomes paramount to upholding the reputation and sustenance of tourism industries worldwide.

Challenges to Safety and Security

Tourist destinations can face a plethora of safety and security challenges, each requiring unique solutions. Natural disasters such as hurricanes, earthquakes, and tsunamis pose a significant threat to popular vacation spots, necessitating the development of robust evacuation plans, emergency shelters, and communication systems. Health crises, exemplified by the global COVID-19 pandemic, highlight the need for adequate healthcare infrastructure, disease surveillance, and effective crisis management.

Criminal activities, including theft, scams, and even terrorism, can tarnish a destination's reputation and leave tourists feeling unsafe. Effective law enforcement, community engagement, and information dissemination are essential tools in mitigating such risks. Additionally, political instability and civil unrest can quickly transform peaceful areas into potential danger zones. Political leaders, law enforcement agencies, and local communities must collaborate to create stable environments conducive to safe tourism experiences.

Preventive Measures

Proactive measures are crucial in maintaining the safety and security of tourism. A multi-pronged approach involving governments, businesses, communities, and tourists themselves can significantly enhance the resilience of tourist destinations.

1. Infrastructure and Planning: Developing and maintaining proper infrastructure, including transportation networks, emergency response facilities, and communication systems, can expedite disaster recovery and ensure visitor safety. This includes understanding the local

customs, laws, and potential risks. It's essential to be aware of any travel advisories issued by government authorities.

2. Crisis Management: Creating comprehensive crisis management plans that outline protocols for various can help destinations respond swiftly and effectively to emergencies.

3. Law Enforcement: Ensuring a visible and capable law enforcement presence can deter criminal activities and provide tourists with a sense of security.

4. Health Preparedness: Investing in healthcare systems and resources enables destinations to handle health crises while maintaining the well-being of tourists and residents alike.

5. Community Involvement: Engaging local communities in tourism planning and safety initiatives fosters collective responsibility for maintaining secure environments.

6. Information Dissemination: Providing accurate and up-to-date information to tourists about potential risks and safety measures can empower them to make informed decisions.

7. Perimeter Control: Establishing clearly marked boundaries and controlled entry points can help regulate visitor flow and prevent unauthorized access.

8. Lighting and Signage: Well-lit areas and informative signage contribute to both safety and security. Proper lighting reduces the risk of accidents, while clear signs guide visitors and prevent confusion.

9. Maintenance: Regular maintenance of attractions not only enhances their appeal but also eliminates potential hazards that could compromise visitor safety.

10. Personal Belongings: Tourists should be cautious with their personal belongings, such as wallets, passports, and electronics. Using anti-theft bags and keeping valuable items locked in the hotel safe can minimize the risk of theft.

11. Transportation Safety: Whether using public transport or renting a vehicle, tourists should prioritize transportation safety. Using licensed and reputable transportation services can reduce the chances of accidents and scams.

12. Health Precautions: Health and safety go hand in hand. Tourists should be informed about any necessary vaccinations, local health risks, and safety protocols, especially during times of pandemics.

13. Emergency Contacts: Having a list of emergency contacts, including local authorities, embassy numbers, and the nearest medical facilities, is essential in case of unforeseen circumstances.

14. Tourist Education: Providing visitors with guidelines on appropriate behaviour and safety protocols can help prevent accidents and ensure respectful interactions with the surroundings.

15. Emergency Response Plans: Developing comprehensive emergency response plans that outline procedures for different scenarios, such as natural disasters or security threats, is crucial for the swift and organized management of crises.

Technological Advancements

In the modern age, technology plays a pivotal role in enhancing the safety and security of tourism. Here are a few ways technology is revolutionizing the industry:

1. Digital Platforms: Travelers can access real-time information about local conditions, weather

updates, health advisories, and safety tips through websites, apps, and social media.

2. Geolocation Services: GPS-enabled devices and apps help tourists navigate unfamiliar terrain and locate nearby emergency services.

3. Communication Tools: Instant messaging, video calling, and social media platforms enable travelers to stay connected with loved ones and seek help in emergencies.

4. Surveillance and Monitoring: Advanced surveillance technologies, including CCTV cameras and aid in monitoring tourist areas and identifying potential security threats.

5. Data Analytics: Analyzing data on tourist behavior, crime patterns, and environmental conditions allows authorities to implement targeted safety measures.

6. Biometrics and Identification: Biometric technology enhances security at airports and border checkpoints, ensuring the accurate identification of travelers.

7. Smart Access Control: Biometric authentication and digital access control systems can provide secure and controlled entry to sensitive areas, reducing the risk of unauthorized access.

8. Geofencing and Location Tracking: These technologies can help tourists stay within designated safe zones and allow authorities to track their movements in case of emergencies.

9. Drone Surveillance: Drones equipped with cameras and sensors can monitor large areas, helping to detect any unusual activities or threats.

10. Predictive Analytics: By analyzing data from various sources, predictive analytics can help authorities anticipate potential security risks and take preventive measures.

11. Cybersecurity Measures: As tourism becomes more reliant on digital platforms, cybersecurity measures become crucial to protect tourists' personal and financial information.

12. Health Monitoring and Screening: With the ongoing pandemic, technologies like temperature screening devices and health tracking apps have become important for ensuring the safety of tourists.

13. Virtual Reality (VR) Training: Security personnel can be trained using VR simulations to handle various scenarios and emergencies effectively.

14. Biometric Identification: Biometric systems like fingerprint or iris scanning can enhance security at entry points and verify the identity of tourists.

15. Robotics and Automation: Robots can be deployed for tasks such as baggage screening, crowd control, and patrolling, reducing the need for human intervention in potentially risky situations.

These advancements collectively contribute to creating a safer and more secure environment for tourists and tourist attractions, while also ensuring a positive travel experience.

Promoting a Culture of Safety

Creating a culture of safety and security within the tourism industry requires collaboration between stakeholders. Governments, industry associations, businesses, and tourists all have roles to play:

1. Government Initiatives: Governments must establish clear regulations and standards for tourism safety. They can incentivise businesses to adhere to safety protocols and invest in

training programs for hospitality staff.

2. Industry Responsibility: Tourism businesses should prioritize guest safety and train their staff to handle emergencies. Certification programs for safety practices can be developed to raise industry standards.

3. Public Awareness: Educating tourists about the importance of adhering to local laws, respecting cultural norms, and taking personal safety precautions can contribute to a safer travel experience.

4. Collaborative Efforts: Industry associations can facilitate knowledge sharing, best practice exchange, and collaborative efforts to address safety challenges.

5. Tourist Precautions: Travelers should research destinations before visiting, stay informed about local conditions, and take necessary precautions, such as purchasing travel insurance.

6. Community Engagement: The local community plays a vital role in ensuring tourist safety. Encouraging a sense of responsibility and ownership among residents can lead to a safer environment for visitors.

7. Public-Private Partnerships: Establishing partnerships between private businesses, such as hotels and tour operators, and public authorities can lead to more coordinated safety measures.

8. Training and Capacity Building: Providing training to hospitality staff, tour guides, and law enforcement personnel equips them with the skills needed to handle various safety and security situations effectively.

9. Regular Audits: Conducting regular safety audits of tourist attractions and accommodations helps identify potential vulnerabilities and areas for improvement.

10. Crisis Communication: Developing clear communication strategies for emergencies ensures that accurate information reaches tourists promptly, reducing panic and confusion.

As tourism continues to grow, ensuring the safety and security of both tourists and tourist attractions remains a fundamental responsibility. By working together, tourists, local communities, businesses, and authorities can create an environment where people can explore, enjoy, and appreciate the wonders of the world without compromising their well-being. Prioritizing safety and security not only protects individual travelers but also contributes to the overall prosperity and growth of the tourism industry.

Writer : Student; Rajshahi University, Department of Tourism and Hospitality Management.

Tourism Transportation System in Bangladesh: Prospects and Challenges

Md.Mahamudun Noby Rupok

The natural beauty of Bangladesh is similar to an artist painter's flawless artwork. Bengal is a delta-like region with a diverse landscape and an extensive, close-to-the-sea coastline. Seashores and mangrove Sundarbans attract every one local and foreign tourists. The tourism sector in this nation has enormous possibilities. Parallel lands, mountains, waterfalls, incredible views of tea gardens, green carpets of crop fields, rivers and lakes can all be found there. Especially the silvery rivers are dispersed like a web of spiders.

Bangladesh can earn a lot of profits from the tourism sector due to the development of Bangladesh's poor communication infrastructure. A modern transportation system is needed to provide modern transportation services. The planned development of modern transportation systems can play a role in enriching the country's tourism industry. For this, building the necessary infrastructure for internal modern roads, railways and airways is necessary. All can avail the benefit of this. Modern connectivity will improve the quality of life of the people along with the expansion of trade and commerce. The country's citizen benefits will also be ensured for sustainable development. However, the development of communication infrastructure must be planned, sustainable and environmentally friendly otherwise the country's environmental disaster may occur which will be detrimental to Bangladesh. The development of the tourism industry in Bangladesh requires multi-faceted initiatives. Initiatives to develop the tourism industry should be such that domestic and foreign investors are more interested in investing in tourist centers. Developing the planned tourism industry will create many employment opportunities and eliminate the country's unemployment problem.

Modern rail communication can be used as a comfortable and safe transportation for tourists. Therefore, it is necessary to establish rail connectivity with every part of Bangladesh. Many countries of the world have made the travel of tourists comfortable by replacing the attractive rail communication system, which is attracting travel-loving people to visit those countries. Various countries of the world including India, Sri Lanka, Switzerland, Japan, have introduced different types of rail services for tourists so that tourists can enjoy the natural beauty of those countries and get hotel services inside the train. If a special tourist train service is introduced in Bangladesh to attract tourists, it will bring a new revolution in the tourism industry of Bangladesh.

The main challenge of rail connectivity in Bangladesh is not having a double rail line, but the government of Bangladesh has taken a plan to set up a double line. And if this plan is implemented, rail transport facilities will be ensured for tourists. The government of Bangladesh has already implemented many projects to improve the country's road, rail and air connectivity and some projects are on the way to be implemented. The Padma Bridge, a long-standing dream of Bangladesh's people, has become a reality. With the implementation of the Padma Bridge, uninterrupted road connectivity has been established between the capital Dhaka and the southern and southwestern districts of the country. As a result, a new mode of transportation was

introduced. People can now easily travel to the south and south-western parts of the country through the Padma Bridge, where people used to waste hours on ferries. It is expected that the Padma Rail Link Bridge will be completed by the end of 2023, making the transportation of tourists more seamless. There are numerous tourist spots in 20 districts of southern and southwestern Bangladesh, including the Sundarbans, the Sixty Dome Mosque, Benapole Land Port, Mongla Port, Kuakata Beach etc. With the implementation of the Padma Bridge, domestic and foreign tourists will be able to visit these places in a very short time and the number of tourists will increase relatively. As a result, new opportunities will be opened for developing the country's tourism industry. On the other hand, the work on the double-line Bangabandhu Railway Bridge over the Jamuna River is progressing quickly. Once the Bangabandhu Railway Bridge is implemented, a new direction of Bangladesh's transport system will be unveiled. Once completed, the bridge will provide modern rail connectivity between Dhaka and 16 districts of the northern part of the country. As the people of 16 districts of the northern region will benefited, domestic and foreign tourists will be able to take the rail service smoothly. The 16 districts of the northern region have numerous sightseeing destinations and are accessible by road, rail and air. However, the two operational airports in the northern region Rajshahi and Saidpur airports, as well as Cox's Bazar, Sylhet, Chittagong and Jessore airports do not have any direct flight service with Rajshahi and Saidpur as a result tourists are not able to take air travel advantages in these areas in a short time. On the other hand, the abandoned Bogura and Thakurgaon airports will play an important role in developing the tourism industry in the northern part of the country if these airports are made operational again. The northern part of Bangladesh is an agrarian region with immense potential for agro-based tourism industry. The tea gardens of the plains of Panchagarh can be one of the most spectacular agro-based tourist destinations. Apart from this, in winter, Panchagarh meets the Kanchenjunga mountain situated near the lap of the Himalayas and many tourists cannot go there easily due to the lack of a better transport system. On the other hand, the Dhaka-Rangpur 6-lane highway is showing a new ray of hope for the development of the tourism industry in the northern region. Once the project is implemented, tourists will be able to easily travel to Mahasthangarh in Bogura, Paharpur Buddhist Bihara, Uttara Gana Bhawan in Natore, Kantajew Temple in Dinajpur, Ramsagar, Taj Hat Zamindar Bari, Teesta Barrage and other tourist destinations.

At the same time there is a need for better road connectivity. For better bus services modern roads are needed as well as modern bus terminals. An example of this can be the Sylhet Central Modern Bus Terminal where all the arrangements for modern passenger services have been taken. Such modern bus terminals should be set up in every district of Bangladesh to ensure modern tourist transportation services. The northeastern part of Bangladesh is one of the focal points of natural beauty with innumerable hills, rivers, haors, lakes, tea gardens and vast green fields. It is a heavenly place for any tourist. Moulvibazar, Habiganj, Sunamganj and Sylhet are some of Bangladesh's most visited tourist destinations. Some of the most attractive tourist spots in the region are the Tanguar Haor, Jaflong, tea gardens, Ratargul Swamp Forest and numerous small hills and waterfalls. But there is no modern road or transport system to travel there, but there is a huge potential for the tourism industry. Roads are one of the most important aspects of modern connectivity and a developed road system is essential for developing the tourism industry.

The construction of the Bangabandhu Tunnel under the Karnaphuli River is one of the initiatives of the government of Bangladesh to expand the development of the country's transportation system. The project is expected to be completed by December 2023. With the construction of the

Bangabandhu Tunnel, people will be able to travel to Chattogram Shah Amanat International Airport, bypassing Chittagong city, as well as to Chittagong Hill Tracts and Cox's Bazar along with the capital. As a result, the Chittagong seaport will play an important role in the country's economy and will significantly contribute to developing the tourism industry.

Cox's Bazar Marine Drive is a tourist attraction that plays an important role in tourist transportation. On the other hand, establishing a direct rail link between Bangladesh's tourist city Cox's Bazar and the capital Dhaka is progressing rapidly, which will play an important role in developing Bangladesh's tourism industry. Through rail connectivity from the capital Dhaka to Cox's Bazar, tourists will be able to take modern transportation services, which will improve the country's tourism industry. The tourist hubs of Bangladesh are Chattogram, Khagrachhari, Rangamati, Bandarban and Cox's Bazar districts in the south-eastern part of the country. Most of the tourists in Bangladesh flock to the tourist centers in these districts. In this area of Bangladesh, Cox's Bazar, the longest beach in the world, is also the center of attraction of St. Martin's Island. Millions of foreign and domestic tourists visit the spot annually. Some of the most popular tourist destinations in the south-eastern part of Bangladesh are Kaptai Lake, Nilachal, Sajek Valley, Inani Beach, Patenga Beach, Kutubdia Lighthouse, Chittagong Port, Golden Temple, Chandranath Hill and numerous hills, rivers, springs and lakes. People of different ethnic groups of Bangladesh living in this region have their own traditions and culture, attracting tourists. This region is very mountainous. But at the initiative of the government of Bangladesh and with the support of the Bangladesh Army, new roads and bridges have been established, due to which the road transport system in the Chittagong Hill Tracts has improved a lot. Chittagong Hill Tracts still has immense potential to create new tourist destinations, so it is necessary to have an environmentally sustainable development plan so that the development plan can be implemented while maintaining the balance of the natural environment there.

As the tourism sector in Bangladesh has the potential to be of great economic benefit, there are many environmental challenges. For example, Bangladesh is a densely populated country. But a lot of land is needed for the development of infrastructure. Many agricultural land is wasted in constructing these roads, bridges and highways. Therefore, an environment-friendly sustainable development plan is needed through which the infrastructure will be developed as well as safe roads will be provided for tourists. Unbalanced development can never strengthen the country's economy, but a balanced development plan is possible only by keeping the country's environment and nature's beauty intact.

Writer : Student; Bangladesh University of Professionals (BUP)

Mujib's Bangladesh: The Role of Tourism in Building a Prosperous Bangladesh

Zahid Hasan Akash

Preface

Bangladesh, in the center of South Asia, is a nation shaped by history, culture, and the enduring spirit of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Within these pages, we begin on a trip to celebrate the importance of tourism in achieving Mujib's vision of a flourishing Bangladesh. We honor Mujib's legacy and commitment to unity and progress as we explore the fabric of Bangladesh's heritage, natural beauty, and economic success. This keepsake is an invitation to learn more about tourism's significant impact, a force that empowers communities, preserves culture, and develops worldwide connections. We welcome tourists to travel through the landscapes, hear the tales, and witness the transformation that occurs when visionary leadership meets the power of tourism. Join us in celebrating Mujib's Bangladesh as a light of hope, resilience, and prosperity.

Introduction: A Visionary Legacy

Mujib is the name of the 'Iron man' of Bangladesh. His glory and ideology have an aesthetic dimension. He gave us the 'Iron lady' Prime Minister Sheikh Hasina. The contribution of the tourism sector of 'iron man' Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman or Mujib is memorable. Because he wanted that Bangladesh would be the best according to the tourism sector. We know that few leaders in history have had such an indelible impact on their country's future as Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. His foresight established the groundwork for a sovereign Bangladesh. This country now invites the rest of the world to enjoy its rich cultural history and awe-inspiring landscapes through the lens of tourism. As we embark on this journey, we discover the critical role of tourism in fostering a flourishing Bangladesh that reflects Mujib's enduring principles.

Mujib's Bangladesh: A Tapestry of Diversity

Mujib's vision for Bangladesh was based on unity in diversity, a philosophy evident in the country's cultural tapestry. Every region of the country tells a different story, from the hectic streets of Dhaka to the quiet villages along the great rivers. Tourism connects these stories by immersing visitors in the bright colors, flavors, and traditions that constitute Mujib's Bangladesh.

Economic Prosperity through Tourism

Tourism is becoming an economic powerhouse, driving growth and prosperity. The tourist industry becomes a cornerstone of economic development by drawing foreign exchange profits and creating diverse job possibilities. The way tourism uplifts local communities and encourages individuals to participate in the nation's progress reflects Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's desire to improve the lives of his fellow citizens.

Cultural Heritage: Guardians of the Past

Bangladesh's historical and cultural heritage bears witness to the country's tenacity over the decades. Ancient monuments, architectural marvels, and ongoing customs echo the city's history.

Tourism acts as a keeper, bringing these historical relics to life and passing them down to future generations. Tourists engage with the soul of Mujib's Bangladesh by discovering the past, where each artifact relates to a chapter of the nation's journey.

Natural Splendor: Preserving and Sharing Beauty

Bangladesh's natural beauty captivates the heart, from the peaceful mangroves of the Sundarbans to the rolling hills of Bandarban. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's passion for nature is well aligned with the concept of sustainable tourism. Responsible tourism practices protect these priceless ecosystems while allowing visitors to connect with the natural world, building a harmonious relationship between humans and the environment.

Empowering Communities: A Path to Inclusivity

Tourism is a practical embodiment of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's inclusivity and social justice goal. Local communities thrive when they actively participate in the tourism industry. Visitors can interact directly with the heart and spirit of Mujib's Bangladesh through homestays, handicraft workshops, and community-led tours, developing cross-cultural understanding and ensuring that the benefits of tourism reach every corner of society.

Global Integration: Bridges across Continents

Mujib's desire for an internationally involved Bangladesh is mirrored in tourist opportunities. Visitors from all around the world serve as goodwill ambassadors, sharing their experiences and refuting myths. Cultural exchange crosses borders, enhancing friendships and international partnerships. Tourism is a bridge that connects hearts across continents in Mujib's Bangladesh.

Sustainable Tourism: Nurturing Tomorrow's Bangladesh

We carry the responsibility of cultivating a sustainable and prosperous Bangladesh as stewards of the future. Sustainable tourism practices reflect the values of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's responsible citizenship and environmental care. Tourism drives positive change by minimizing environmental effects, supporting local craftspeople, and encouraging cultural awareness, ensuring that the foundations of wealth stay vital for future generations.

Rural Development and Agro-Tourism: Sowing Seeds of Growth

Mujib's Bangladesh recognizes the importance of rural landscapes in defining the country's identity. Agro-tourism companies offer visitors to experience the rustic charm of village life in the country's heartland. These projects empower local farmers, support organic practices, and promote local produce consumption, fostering sustainable agricultural growth and reshaping rural communities.

Educational and Heritage Tourism: Enriching Minds and Souls

Education and heritage tourism constitute a substantial nexus that enhances visitors' brains and spirits. Mujib's Bangladesh offers comprehensive learning experiences that dive into the nation's intellectual and creative past, from old universities to traditional artisan workshops. Tourists who participate in these educational interactions become patrons of knowledge, helping to preserve and perpetuate Bangladesh's cultural history.

Medical and Wellness Tourism: Nurturing Health and Happiness

In keeping with Mujib's commitment to public well-being, Bangladesh's expanding medical and wellness tourism business is establishing itself as a haven for health and rejuvenation. Visitors seeking physical recovery and spiritual refreshments visit world-class medical centres and wellness resorts. As travellers journey towards holistic wellness, they contribute to expanding a

sector that exemplifies the country's commitment to its inhabitants' well-being.

Reviving Silk Road Connections: Trade and Cultural Exchange

Mujib's Bangladesh is at a historical crossroads where old trade routes once met. Tourism revitalizes these ties, promoting commercial and cultural exchange with neighbouring countries. As tourists travel around the country, they reignite the spirit of the Silk Road, reviving age-old customs and fortifying economic linkages, boosting Bangladesh's place in the global community.

Culinary Tourism: A Gourmet Expedition

A country's heart is often found in its cuisine. Culinary tourism offers visitors to experience the flavors of Bangladesh, from traditional rice-based meals to scrumptious street cuisine. We investigate how gourmet adventures tempt the palate and support local economies and cultural exchange.

Digital Tourism: Navigating the Virtual Realm

In an interconnected world, digital tourism allows people to experience Bangladesh's delights from afar. We look at virtual tours, online cultural experiences, and the importance of social media in drawing visitors, marketing the country, and creating worldwide interaction.

Online Cultural Experiences: Bridging Hearts and Cultures

In the internet age, cultural absorption has no borders. Individuals can engage in traditional events, learn indigenous crafts, and even attend culinary seminars that reveal the mysteries of Bangladeshi food through online cultural experiences. This virtual interaction promotes cross-cultural understanding by breaking boundaries and creating global connections.

A Glimpse of "Mujib's Bangladesh: The Role of Tourism in Building a Prosperous Bangladesh"

- Sheikh Mujibur Rahman's visionary leadership laid the foundation for a resilient and diverse Bangladesh
- Tourism drives economic growth and prosperity by attracting travellers and boosting local economies
- Cultural heritage, from ancient sites to vibrant festivals, is preserved and celebrated through tourism, enhancing Bangladesh's identity
- Sustainable tourism aligns with Mujib's commitment to environmental stewardship, ensuring the conservation of natural treasures
- Empowering local communities through tourism activities empowers livelihoods and echoes Mujib's vision of shared prosperity
- Tourism fosters global connections and diplomatic ties, aligning with Mujib's aspiration for a globally engaged Bangladesh
- Innovation in the tourism sector reflects Mujib's spirit of progress, offering unique experiences and shaping a vibrant landscape
- Niche tourism segments such as educational, medical and adventure tourism contribute to a knowledgeable, healthy, and explorative nation
- Digital tourism transcends boundaries, making Bangladesh's heritage accessible worldwide and fostering a global community
- The role of tourism in Bangladesh's future aligns with Mujib's legacy, marking progress and promising a brighter future

Conclusion: Charting a Radiant Future

As the sun sets on Mujib's Bangladesh, the nation born of a visionary's dream, it rises again, guided by the promise of a bright future. Tourism, like Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's unshakeable vision, stands as a beacon of hope, throwing its light on the path to prosperity and growth. Mujib's Bangladesh is poised for a bright future, with tourism as a beacon of hope, illuminating the route to prosperity and growth. Following Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's footsteps, this nation cherishes its heritage, welcomes the globe, in addition to cultivates an inclusive culture. Travellers become a vital part of the narrative as they go on their adventures of discovery - a description that echoes the spirit of Mujib. This history heralds a thriving Bangladesh for future generations. It should be noted that as we come to the end of this chapter, we are on the verge of something exciting. The story of Mujib's Bangladesh, braided with tourist strands, provides a vivid image of a nation free of constraints, fuelled by the legacy of a visionary leader, and propelled towards a future brimming with promise and prosperity.

Writer : Student; MA in English (International Standard University) BA in English (Daffodil International University)

Bangladesh
Tourism Board
National Tourism Organization

Bangladesh Tourism Board
(National Toursim Organization)
Parjatan Bhaban (Level-9 & 10), Plot-E/5 C/1, Agargaon
Sher-e-Bangla Nagar (Administrative Area), Dhaka-1207
web : www.tourismboard.gov.bd